দরসুল কুরআন

মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী

মুহাম্মদী কুতুবখানা
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

দর্‌সুল কুর্‌আন

মূলঃ
হযরত হাকীমুল উম্মত মূফ্‌তী
আহমদ ইয়ার খান নঈমী
(রহমতুল্লাহি আলাইহি)

অনুবাদঃ
অধ্যাপক মুহাম্মদ লুৎফুর রহমান

মুহাম্মদী কুতুবখানা
৪২, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্লেক্স
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। ফোনঃ ৬১৮৮৭৪।

প্রকাশনায়ঃ
নিশান প্রকাশনী
আন্দরকিল্লা,চট্টগ্রাম

প্রথম প্রকাশঃ
১লা অক্টোবর '৯৫ইং

(গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত)

হাদিয়াঃ
সাদা– ৫৫/–
নিউজ–৪৫/–

কম্পিউটার কম্পোজঃ
মাইক্রো কম্পিউটার
আন্দরকিল্লা,চট্টগ্রাম।

মুদ্রণেঃ
আনন, ফিরিঙ্গীবাজার
চট্টগ্রাম।

অনুবাদকের কথা

'দর্‌সুল কুর্‌আন' মুফ্‌তী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) এর এক অনন্য বৈশিষ্ট্যময় কিতাব। তিনি ফজরের নামাযের পর কুর্‌আন শরীফের যে দর্‌স দিতেন, এটা তারই অংশ বিশেষ। আজকাল তাফ্‌সীর মাহফিল ও দর্‌সে কুরআনের নামে যে সব গলাবাজি করা হয়, তাঁর দর্‌সে ও সব কিছু নেই। আয়াতের তরজুমা, শানে নাযুল, শাব্দিক বিশ্লেষণ, অপব্যাখ্যার জবাব ইত্যাদি তাঁর দর্‌সের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাঁর প্রতিটি কথা তাৎপর্যময় ও হৃদয়গ্রাহী। আজেবাজে কোন কথা তাঁর দর্‌সে স্থান পায়নি।

এ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় তাঁর বেশ কয়েকটি কিতাব অনুদিত হয়েছে। যেমন জা'আল হক, শানে হাবীবুর রহমান, সাল্‌তানতে মুস্তাফা, আউলীয়া কিরামের উসীলায় খোদার রহমত, অপব্যাখ্যার জবাব, বিশ্ব নবী নূরের রবি ইত্যাদি এবং প্রতিটি কিতাব সুধি পাঠকবৃন্দের যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছে। আশা করি দর্‌সুল কুরআনও সমাদৃত হবে। সুধি পাঠক বৃন্দের অনুপ্রেরণায় আমরা তাঁর প্রতিটি কিতাব অনুবাদ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কিছু দিনের মধ্যে তাঁর রচিত 'ইসলামী জিন্দেগী' 'হযরত আমীরে মুয়াবিয়া' নামে আরও দু'টি কিতাবের বঙ্গানুবাদ বের হচ্ছে।

পাঠকবৃন্দের সক্রিয় সহযোগিতা ও দু'আই কাম্য।

অনুবাদক

সূচী

পৃষ্ঠা

■ পারা–২ সূরা–২ আয়াত–১৫১ ১
- হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর তশরীফ আনয়ন উম্মতের জন্য সবচে' বড় নিয়ামত।
- হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে সবকিছু শিক্ষা দিয়েছেন।
- হুযূরের রেসালত সার্বজনিন।
- কেউ হুযুর আকরম থেকে বেনিয়াজ হতে পারেনা।

■ পারা–২ সুরা–২ আয়াত–১৫২ ২০
- যিকর আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়ার সহায়ক।
- যিক্‌রের দ্বারা খোদায়ী ক্ষমতা অর্জিত হয়।
- আল্লাহর প্রতিটি দানের শোকরীয়া জ্ঞাপন আবশ্যক।
- কখনো নাশোকরী করা উচিৎ নয়।

■ পারা–২ সুরা–২ আয়াত–১৫৩ ৩৮
- বেনামাযীর দুআ কবুল হয় না।
- কেবল তওহীদী শ্লোগানে মুক্তি নেই।
- ছবর খোদায়ী পরীক্ষা
- পরিপূর্ণ নামায কেবল মানুষকেই দান করা হয়েছে।

■ পারা–২ সুরা–২ আয়াত–১৫৪ ৫৩
- শহীদের মর্যাদা অনেক উর্ধে
- নবী, শহীদ, ওলী ও কতেক ওলামা মৃত্যুর পর জীবিত
- কয়েকটি জলন্ত উদাহরণ

■ পারা–২ সুরা–২ আয়াত–১৫৯ ৬৮
- নবীর শানমান কেউ গোপন করে রাখতে পারে না।
- দ্বীনি প্রয়োজনীয় বিষয় গোপন করা কুফরী।
- নবীর শানমান গোপনকারীর উপর খোদার লানত।

■ পারা–২ সুরা–২ আয়াত–১৬৪ ৭৮
- খোদার অসীম কুদরতের বর্ণনা
- আসমান জমীনে খোদার অগণিত নিদর্শন–
- সাহাবায়ে কিরাম সত্যের মাপকাটি

পৃষ্ঠা

■ পারা–২ সুরা–২ আয়াত–১৬৫ ৮৭
- সত্যকার মুসলমান কাউকে খোদার অংশীদার মনে করে না।
- মুমিনগণ সবসময় আল্লাহকেই ডাকে

■ পারা–২ সূরা–২ আয়াত–১৭২ ৯৮
- হালাল রুজি কল্যাণকর,
- হারাম জিনিস মানুষকে অমানুষ করে
- হারামখোরের দু'আ কবুল হয়না।

■ পারা–২ সূরা–২ আয়াত–১৭৩ ১০৬
- মৃত প্রাণী, রক্ত ও শুকুরের মাংস হারাম
- খোদাভিন্ন অন্য কারো নামে জবেহকৃত প্রাণী হারাম।
- প্রাণ রক্ষার জন্য হারাম বস্তু খাওয়া জায়েয।

■ পারা–২ সূরা–৩ আয়াত–৩১ ১১৮
- হুযূরের আনুগত্য ঈমানের পূর্বশর্ত।
- হুযূরের অনুসারীগণ আল্লাহর প্রিয় পাত্র।

■ পারা–২ সূরা–২ আয়াত–১৮৬ ১২৬
- হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্ব জ্ঞানী
- আল্লাহকে ডাকাও ইবাদত
- আল্লাহ মুমিনের ডাকে সাড়া দেন।

প্রতিটি সূচী নম্বরের ছয় পৃষ্ঠা পর দেখুন

প্রতিটি সূচী নম্বরের ছয় পৃষ্ঠা পর দেখুন

দরসুল কুরআন

বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রাহিম

كَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلاً مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ○

তরজুমাঃ "যেমন আমি তোমাদের মধ্যে হতে তোমাদের নিকট একজন শানদার রসূল প্রেরণ করেছি, যিনি তোমাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করেন এবং তোমাদেরকে পবিত্র করেন এবং তোমাদেরকে কিতাব ও হেকমতের বিষয়সমূহ শিক্ষা দেন এবং তোমাদেরকে শিখান, যা তোমরা জান্‌তেনা।"

এর আগের আয়াতসমূহে কিবলার পরিবর্তন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে যে, কাবা শরীফ কিবলা হওয়াটা তোমাদের জন্য আমার দান এবং এ আয়াতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তশরীফ আনয়নের বর্ণনা রয়েছে, যা ওটা থেকেও আল্লাহ তাআলার বড় দান। মোট কথা, ওই আয়াতসমূহে সেই কাবার বর্ণনা ছিল, যা নামাযের কিবলা এবং এখানে সেই মাহবুবের আলোচনা করা হয়েছে, যা ঈমানের কিবলা অর্থাৎ মাথার কিবলার পর অন্তরের কিবলার আলোচনা করা হয়েছে। এ পবিত্র আয়াতের প্রতিটি শব্দে হুযূর আনোয়ার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুস্পষ্ট প্রশংসা করা হয়েছে।

যেমন, আয়াতের প্রারম্ভে كَمَا সংযোজন করে এটাই বলেছেন যে, আমি যে তোমাদের জন্য কিবলা পরিবর্তন করেছি, এটা তোমাদের উপর আমার প্রথম ইহ্‌সান নয়, আমি তোমাদেরকে এর আগে সেই শান্‌দার নবী দান করেছি, যার গুণাবলী হচ্ছে এইঃ

اَرْسَلْنَا (প্রেরণ করেছি) সম্পর্কে দু'টি বিষয় লক্ষ্য করা প্রয়োজন। একেতঃ اَرْسَلْنَا অতীতকাল বিষয়ক ক্রিয়া, যদ্বারা আগে প্রেরণ হওয়াটা বুঝায়। এতে সেই দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হে মুসলমানগণ! তোমাদেরকে কলেমা, নামায, কাবা ও অন্যান্য ইসলামী আকীদা ও আমলসমূহতো আমি পরে দিয়েছি, সবের আগে যে নিয়ামত দান করেছি, সেটা হচ্ছে সেই মাহবুবের তশ্‌রীফ আনয়ন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হচ্ছেন ইসলাম বৃক্ষের মূল এবং সমস্ত আকাইদ ও আমলসমূহ হচ্ছে এর ডালি বিশেষ। সবের আগে গাছের

মূলই স্থাপিত হয়। শাখা–প্রশাখা ইত্যাদি পরেই আবির্ভূত হয় এবং শাখা সমূহের এমন অবস্থা হয়ে থাকে যে যতক্ষণ মূলের সাথে সংযুক্ত থাকে, ততক্ষণ তরতাজা ও ফলে–ফুলে ভরপুর থাকে। কিন্তু মূল থেকে সম্পর্কহীন হওয়ার সাথে সাথে একেবারে অকেজো ও আগুনের ইন্ধন হয়ে যায়। অনুরূপ রব্বুল আলামীন সর্ব প্রথম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবুয়াত দান করেছেন এবং এগার বছর পর্যন্ত কোন ইসলামী আকীদা বা আমল প্রেরণ করেননি। এগার বছর পর নবীজীকে মেরাজে ডেকে নিয়ে নামায প্রদান করলেন এবং হিজরতের পর অন্যান্য আহ্‌কাম প্রদান করলেন। এ এগার বছর সময়ে সে সব মুসলমান মারা গেছেন, তাঁরা নিঃসন্দেহে জান্নাতী ছিলেন।

বন্ধুগণ! এ রকম উদাহরণতো হাজার হাজার পাওয়া যাবে যে, অনেক লোক বিনা আমলে জান্নাতী হয়ে গেছে কিন্তু এ রকম উদাহরণ কোথাও পাওয়া যাবে না যে কোন ব্যক্তি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মুখ ফিরায়ে কেবল আমলসমূহের দ্বারা জান্নাতী হয়ে গেছে। যে ইবাদতসমূহ হুযূরের জাতে পাকের সাথে সম্পর্কিত, ওগুলোর মধ্যে কবুল হওয়ার ফুলও আছে এবং ছওয়াবের ফলও রয়েছে। কিন্তু যে ইবাদতসমূহ সেই জাতে পাক থেকে বিচ্ছিন্ন, সেটা জাহান্নামের ইন্ধনই মাত্র। এর জন্য শয়তানের উদাহরণ মওজুদ রয়েছে। তাই اَرْسَلْنَا কে অতীতকাল বোধক হিসেবে প্রয়োগ করা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ اَرْسَلْنَا (প্রেরণ করেছি) সম্পর্কে এ বিষয়টা বুঝে নিন যে, রব্বুল আলামীন দুনিয়াতে আমাদের আগমনের বেলায় خَلَقَ (সৃষ্টি করা) শব্দ ব্যবহার করেছেন কিন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের বেলায় اَرْسَلْنَا (প্রেরণ করেছি) বা بَعَثَ (প্রেরণ) বা جَاءَ (আগমন) ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন ইরশাদ করেছেন– اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلاً (তাহাদের মধ্যে রসূল প্রেরণ করেছেন) আর এক জায়গায় ইরশাদ করেছেন قَدْ جَاءَ كُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ– (তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর নবী এসেছেন)। এ পার্থক্যের কারণ হলো, আমরা এ দুনিয়ায় আসার আগে কিছুই ছিলাম না। যেমন, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا ۝

(কাল প্রবাহে মানুষের উপর এমন এক সময় এসেছিল, যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না) দুনিয়াতে এসেই আমরা সবকিছু হয়েছি, মুমিন, আলিম, মুত্তাকী ইত্যাদি হয়েছি। এ জন্য আমাদের বেলায় خَلَقَ (সৃষ্টি) বলা হয়েছে। خَلَقَ এর অর্থ হচ্ছে অবাস্তবকে বাস্তব করে দেয়া এবং যে কিছু নয়, ওকে সবকিছু করে

দেয়া। কিন্তু নবীগণ বিশেষ করে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়াতে আগমনের আগেই সবকিছু ছিলেন; তিনি নবীও ছিলেন এবং খোদার ইবাদতকারীও ছিলেন। এ জন্য তাঁর আগমনকে اِرْسَال (প্রেরণ) বলা হয়েছে। প্রেরণ ওটাই করা হয়, যা আগ থেকে নিজের কাছে মওজুদ থাকে এবং উচ্চ পদ ওকেই দেয়া হয়, যিনি উচ্চপদ গ্রহন করার আগে যাবতীয় যোগ্যতার অধিকারী হয়ে থাকে। বড় কোন একটা দায়িত্ব দেয়ায় আগে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপযুক্ত করে গড়ে তোলা হয়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমান, ওই সময়ও আমি নবী ছিলাম, যখন আদম আলাইহিস সালাম মাটি–পানিতে বিলীন ছিলেন।

অধিকন্ত পার্থক্যের কারণ এটাও যে আমরা দুনিয়াতে নিজের কাজ করতে এসেছি আর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাজ নিয়েই তশরীফ এনেছেন। সুতরাং আমাদের বেলায় خلق ও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বেলায় ارسال বলাটা যথার্থ।

এর পরের শব্দ فِيْكُمْ (তোমাদের নিকট) এর মধ্যে তিনটি ধারণা রয়েছে, হয়তো এতে আরববাসীর প্রতি সম্বোধন করা হয়েছে বা সমস্ত মুসলমানদের প্রতি অথবা সমস্ত মানুষের প্রতি। প্রথম ধারণা মতে ভাবার্থ এটা হবে যে, হে আরব মরুভূমির অধিবাসীগণ, তোমাদের তক্‌দীর খুলে গেছে যে, তোমরা ক্ষুদ্র কণিকা গুলোকে চমকানোর জন্য সেই চিরবাম্বয় সুর্য তশরীফ এনেছেন, যিনি তোমাদেরকে, তোমাদের গৌত্রদেরকে, তোমাদের দেশকে, তোমাদের ভাষাকে উদ্ভাসিত করে দিয়েছেন। এখন সারা দুনিয়ার মানুষ তোমাদের কাছে আসবে কিন্তু তোমাদেরকে কোন ইবাদতের জন্য কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন হবে না। যেমন দেখুন, হজ্ব, ওমরা, তওয়াফ ও যিয়ারত ইত্যাদির জন্য সারা দুনিয়া থেকে সেখানেই যায়। কিন্তু সেই মরু অঞ্চলে যদি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন না হতো, তাহলে দুনিয়াবাসী সেই এলাকার নামও জানতো না।

দ্বিতীয় ধারণা মতে যদি সমগ্র মুসলমানদের প্রতি সম্বোধন মনে করা হয়, তাহলে ভাবার্থ হবে যে, হে মুসলমানগণ! তোমরা সেই সুভাগ্যবান মানুষ, যাদের ভাগ্যে সেই রসূল মিলেছে, যাকে অনুসরণের জন্য নবীগণ ব্যাকুল ছিলেন। তাঁরই বরকতে তোমাদের দোষত্রুটি চাপা পড়েছে, ময়লা আবর্জনা দূরীভূত হয়েছে, মুশকিল সমূহের সমাধান হয়ে গেছে এবং নছীব খুলে গেছে।

লক্ষ্যনীয় যে, আল্লাহ তাআলা হুযূর আলাইহিস সালামের তশরীফ আনয়নের বিষয় ব্যতীত অন্য কোন নিয়ামতের ব্যাপারে مَنَّ বলে নিজের গুণগান করেননি। যেমন ফরমায়েছেন– لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ الخ

(আল্লাহ্ তাআলা মুমিনদের প্রতি তাদের মধ্যে হতে রসূল প্রেরণ করে বড় ইহসান করেছেন)। এটা বলার পিছনে তিনটি কারণ রয়েছে–একেতঃ মৃত্যুর সাথে সাথে সমস্ত নিয়ামত সমূহ আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করে। কিন্তু হুযূর আনোয়ার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়া, কবর, হাশর কোথাও আমাদেরকে ত্যাগ করেন না। সমস্ত নিয়ামত ধ্বংসশীল কিন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তাসালার চিরস্থায়ী নিয়ামত। দ্বিতীয়তঃ দুনিয়ার সমস্ত নিয়ামতসমূহ যদি হুযূর আলাইহিস সালামের আনুগত্যের অধীনে খরচ করা হয়, তাহলে নিয়ামত হিসেবে বিবেচ্য, অন্যথায় অভিশাপ। হুযূর আলাইহিস সালাম স্বয়ং নিয়ামত এবং অন্যান্য নিয়ামত সমূহের নিয়ামতকারীও বটে।

তৃতীয়তঃ সমস্ত নিয়ামত সমূহ এমনকি আমাদের হাত–পা আল্লাহর দরবারে আমাদের স্বরূপ উন্মোচনকারী হবে, আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। কিন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের দোষ গোপন করবেন। এ জন্যই فِيْكُمْ

বলা হয়েছে।

তৃতীয় ধারণা মতে যদি فِيْكُمْ (তোমাদের মধ্যে) দ্বারা সমগ্র মানুষের প্রতি সম্বোধন বুঝায়, তাহলে এর ভাবার্থ হবে যে, হে মানব জাতি, আমি তোমাদের প্রতি বড় মেহেরবাণী করেছি যে তোমাদের মধ্যে আমার হাবীবকে প্রেরণ করেছি, ফিরিশতা বা জ্বীন সমূহের মধ্যে প্রেরণ করেনি। যার কারণে তোমাদের ইজ্জত অনেক বেড়ে গেছে, মানুষকে আশরাফুল মখলুকাত সাব্যস্ত করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ফরমান – وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىْٓ اٰدَمَ

(অবশ্য আমি আদম জাতিকে সম্মানিত করেছি) এ জন্য নয় যে মানুষ অন্যান্য সৃষ্টিকুল থেকে অধিক শক্তিশালী বরং মানুষ অনেক দুর্বল। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান خُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا ০ (মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে দুর্বল) এ জন্যও নয় যে মানুষের আমলসমূহ অন্যান্য মখলুক থেকে উত্তম। ফিরিশতাগণ চির মাছুম আর মানুষ যখন বিপদগামী হয়, তখন এমন গুণাহ করে বসে যে শয়তানকেও হার মানায়। তা সত্বেও মানুষ আশরাফুল মখলুকাত বলে গণ্য। খোদায়ী খিলাফতের মুকুট ওদের মাথায়। কেন? এ জন্য এবং কেবল এ

জন্য যে নবীগণ, বিশেষ করে সায়্যেদুল আম্বীয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ জাতিতেই তশরীফ এনেছেন। যেমন দেখুন, যে সব লোকেরা নবী আলাইহিস সালামের সাথে গোলামীর সম্পর্ক স্থাপন করেনি, ওরা কুকুর–শুকুর থেকে অধম সাব্যস্ত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা কাফিরদের সম্পর্কে বলেন اُولٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ (অর্থাৎ ওরা সমস্ত মখলুক থেকে নিকৃষ্ট)। মখলুকের মধ্যে সমস্ত পশুও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

নূহ আলাইহিস সালামের জাহাজে বানর, গাধা, কুকুরের জায়গা ছিল কিন্তু কেনানের জায়গা ছিল না। কারণ সে কাফির ছিল। সূরা হুদে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে এবং যে সব লোকেরা শাহীনশাহে কাউনাইন (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে দৃঢ়ভাবে গোলামীর সম্পর্ক স্থাপন করেছে, ওদের মর্যাদা আরশ কুরসী লৌহ কলম, ফিরিশতা–জ্বীন মোটকথা সবচে উচ্চ হয়ে গেছে, ওরাই উত্তম মখলুক হিসেবে গণ্য হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা নেক্‌কারদের সম্পর্কে বলেছেন اُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ০ (ওরাই সর্বোৎকৃষ্ট মখলুক)। এ জন্যই বলা হয়েছে– فِيْكُمْ رَسُوْلًا ০

ওলামায়ে কিরামতো فِيْكُمْ এর অর্থ করেছেন যে তোমাদের জাতির মধ্যে তশরীফ এনেছেন কিন্তু ছুফিয়ানে কিরাম বলেন, فِيْكُمْ এর ভাবার্থ হচ্ছে, তোমাদের মধ্যে নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ রকম তশরীফ এনেছেন, যেমন শরীরে প্রাণ বা চোখে দৃষ্টি।

آنکھوں میں ہیں لیکن مثل نظریوں دل میں ہیں جیسے مثل جان
ہیں مجھ میں لیکن مجھ سے یہاں اس شان کی جلوہ نمائی ہے

অর্থাৎ চোখের মধ্যে দৃষ্টির মত, দিলের মধ্যে হৃদপিণ্ডের মত এবং আমার মধ্যে তাঁর শানের ঝলক প্রকাশ পায়।

فِيْكُمْ শব্দটি এক কিন্তু ছুফিয়ানে কিরাম ও ওলামায়ে কিরামের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন ভিন্ন।

رَسُوْلًا مِّنْكُمْ এ বাক্যাংশে হুযূর আলাইহিস সালামের প্রশংসা করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অগণিত গুণাবলী দান করেছেন। কিন্তু এ সব গুণাবলীর প্রকাশস্থল ভিন্ন ভিন্ন। হুযূর আল্লাহর বান্দাও আবার তাঁর রসূলও। নবীও এবং আল্লাহ্‌র নূরও বটে। কিন্তু যখন ওনার এখানে আগমনের বর্ণনা হয়, তখন তাঁকে রসূল, নবী, নূরে হক, বুরহান ইত্যাদি শব্দ দ্বারা স্মরণ করা হয় এবং যখন মেরাজে যাওয়ার কথা আলোচিত হয়েছে, তখন

عَبْدَهٗ বান্দা শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। কেননা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে রেসালতের পদবী নিয়ে এসেছেন এবং ওখানে বান্দার মর্যাদা নিয়ে গিয়েছেন।

আর একটি বিষয় লক্ষ্যনীয় যে হুযূরকে রসুলুল্লাহ (আল্লাহর রসূল) বলা হয়, উকিলুল্লাহ (আল্লাহ্‌র উকিল) বলা হয় না। কেননা উকিল হচ্ছে সে, যে অন্যের কাজ নিজের জিম্মাদারীতে করে এবং সেই কাজকে নিজের কাজ বলে। যেমন ক্রেতার উকিল বলে যে আমি ক্রয় করছি এবং বেচাকেনার সমস্ত দায়–দায়িত্ব ওর হয়ে থাকে এবং সমস্ত দায়–দায়িত্ব সেই পালন করে। কিন্তু রসূল বা প্রতিনিধি হচ্ছে সে, যে অন্যের কাজ সেই অন্যজনের জিম্মাদারীতে আদায় করে। মূখ রসূল বা প্রতিনিধির হয়ে থাকে কিন্তু শব্দসমূহ প্রেরণকারীর। হুযূর আল্লাহ্‌র রসূল। কিন্তু হুযূরের প্রতিটি বাক্য ও কর্মের জিম্মাদার আল্লাহ্‌। জনৈক পারস্য কবি সুন্দর বলেছেন–

سنگ ریزہ می زند دست جناب ÷ مَارَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ آید خطاب

অর্থাৎ পাথর কনা নিক্ষেপ করেন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্র হস্তে, অথচ আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন مَارَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ

(আপনি নিক্ষেপ করেননি, যখন নিক্ষেপ করেছিলেন)

অনন্ত কাল পর্যন্ত যদি আমি এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে থাকি, অবাক–বিস্ময় হওয়া ছাড়া আর কিছু নেই।

বায়াত হুযূর আলাইহিস সালামের হাতের উপর হয় কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন আমার কাছে বায়াত হয়েছে। ওনার হাতের উপর আমার কুদ্‌রতীর হাত রয়েছে। এ জন্যই উপরোক্ত বাক্যাংশে رَسُوْلًا বলেছেন। তা এ জন্যই বলা হয়েছে যে খোদার খোদায়ী সর্বব্যাপী। প্রত্যেক সৃষ্টিকূলের জন্য তিনি সিজদার পাত্র এবং প্রতিটি অনু–পরমাণু তাঁর কাছে নতশির। অনুরূপ হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর রেসালতও সর্বব্যাপী, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতিটি মখলুকের রসূল। হযরত খিজির আলাইহিস সালাম, হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে এটা বলতে পারতেন যে আপনি বনি ইস্‌রাইলের রসূল, আপনার তৌরীতের আহকাম আমার উপর প্রযোজ্য নয়। আমার কতেক কাজ আপনার শরীয়তের বিপরীত হতে পারে। তাই আপনি আমার সঙ্গ ত্যাগ করুন। হযরত মুসা আলাইহিস সালামও এ উত্তর দিতে পারতেন যে, আমি আপনার

রসূল হয়ে আসিনি বরং শাগরীদ হয়ে কিছু শিখতে এসেছি। অথচ সেই খিজির আলাইহিস সালাম শরীয়তে মুহাম্মদীয়ার সামনে মাথানত করেন এবং এ শরীয়তের সমস্ত আহকাম, যা উনার উপযোগী ও ওনার বেলায় প্রযোজ্য, মেনে চলেন। বায়াতে রিদওয়ানে সাহাবায়ে কিরামের সাথে হযরত খিজির আলাইহিস সালামও হুযূর আলাইহিস সালামের বায়াত গ্রহণ করেছেন। আয়নী, ফত্‌হুলবারী, তফসীরে রুহুল বয়ান ইত্যাদিতে তা বর্ণিত আছে। এ বিষয়ে আমি আমার রচিত কিতাব শানে হাবীবুর রহমানে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

হবেই না কেন, হুযূর আলাইহিস সালাম হচ্ছেন সার্বজনীন রসূল। হুযূর আলাইহিস সালাম হচ্ছেন খোদার ও খোদায়ীর রসূল।

رَسُوْلًا শব্দে দু'জবর তাজিমের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ শানদার রসূল। সমস্ত রসূলগণ নিজ নিজ উম্মতের উপর রাজত্ব করেছেন কিন্তু আমাদের রসূল রসূলগণেরও রসূল। এ সমস্ত শানমান থাকা সত্বেও বলা হয়েছে,

مِنْكُمْ (তোমাদের মধ্যে একজন)। তিনি গরীবদের সাথে পানাহার করেন, এয়াতীম মিসকীনদের সাথে উঠা–বসা করেন। জনৈক উর্দু কবি সুন্দর বলেছেনঃ

وہ شرف کہ قطع ہیں نسبتیں وہ کرم کہ سب سے قریب ہیں
کوئی کہ دے یاس و امید سے وہ کہیں نہیں وہ کہاں نہیں

অর্থাৎ ওটা তাঁরই শান যে আপন পরের কোন ভেদাভেদ নেই, ওটা তাঁরই করুনা যে তিনি সবার আপনজন। তিনি সর্বত্র হাজির নাজির।

কিয়ামতের শুরুতে সমস্ত মখলুক তাঁকে তালাশ করবে। কিন্তু হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের সহায়তা ব্যতীত কেউ তাঁকে খুঁজে পাবেনা। এতে তাঁর শরাফতের প্রকাশ পায় এবং কিতামতের শেষ দিকে হুযূর আলাইহিস সালাম তাঁর প্রত্যেক গুনাহগার উম্মতকে এমনভাবে তালাশ করবেন, যেরূপ মমতাময়ী মা স্বীয় প্রসূত প্রিয় সন্তানকে তালাশ করে। এ ভাবে তাঁর করুনা প্রকাশ পাবে।

وہ لیں گے چھانٹ اپنے نام لیواوں کو محشر میں
غضب کی بھیڑ میں ان کی اس پہچان کے صدقے

অর্থাৎ তাঁর নাম স্মরণকারীদেরকে তিনি হাশরের উত্তপ্ত ময়দানে অগণিত লোকের মধ্যে থেকে সেই পরিচিতির বদৌলতে এক এক করে খুঁজে বের করবেন।

মোট কথা رَسُوْلًا مِنْكُمْ বলার মধ্যে অনেক রহস্য নিহিত রয়েছে।

يَتْلُوْ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا - পর্যন্ত আয়াতের এ অংশে আল্লাহ্ তাআলা সেই পাঁচটি নিয়ামতের কথা উল্লেখ করেছেন, যা আল্লাহ্র হাবীব মখলুককে দান করেছেন। এগুলো হচ্ছে–আয়াত সমূহ পড়ে শুনানো, মখলুককে পবিত্র করা, কুরআন শিক্ষা দেয়া, হাদীছ শরীফের তালীম দেয়া এবং অজানা বিষয় সমূহ জ্ঞাত করা।

উল্লেখিত নিয়ামতগুলোর মধ্যে সর্ব প্রথম তিলাওয়াতের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, সেই মাহবুব তোমাদের সামনে আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন। কেননা আয়াতের তেলাওয়াত তথা আল্লাহ্র বাণী সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া প্রত্যেক কাফির ও মুমিনের উপর অপরিহার্য করা হয়েছে। পরের চারটি নিয়ামত কেবল মুসলমানদেরকে দেয়া হয়েছে। এ বাক্যাংশে তিনটি অভিপ্রায় রয়েছে।

এক, সেই রসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সারা জীবন তোমাদের মধ্যে আছেন, কখনও বাইরে থাকেননি। যেন এ রকম সন্দেহ হতে না পারে যে তিনি অন্য কোথা থেকে আরবী ভাষাতত্ব ও অলংকার শাস্ত্র বা অন্যান্য বিষয় শিখে এসেছেন, অতঃপর হঠাৎ তোমদেরকে এ রকম আয়াত সমূহ শুনাতে লাগলেন, যার চ্যালেঞ্জ গ্রহণে দুনিয়াবাসী অক্ষম। বুঝা গেল যে, তিনি সত্যকার রসূল এবং ওহীর মাধ্যমে এ সব পড়তেছেন। এ তিলাওয়াত তাঁর নবুয়াতের সুস্পষ্ট দলীল। দুই, এ আয়াতে কুরআনীয়া হচ্ছে আসমানী আর তোমরা সবাই হলে দুনিয়াবী। তোমরা এ আয়াতগুলো ওখান থেকে নিতে পারতে না এবং ওই আয়াত গুলোও তোমাদের কাছে আসতে পারতো না। এ জন্য এমন এক মাধ্যমের প্রয়োজন ছিল, যিনি শরীরের দিক দিয়ে পরশী বা দুনিয়াবী এবং রূহের দিক দিয়ে আরশী বা আসমানী, যিনি আসমান থেকে নিয়ে দুনিয়াবাসীকে দিতে পারেন। যার চক্ষু আরশের প্রতি নিবিষ্ট থাকে এবং হাত ও মুখ দুনিয়াবাসীদেরকে দেয়ার জন্য নিয়োজিত থাকে। যদি এ মাধ্যম মাঝখানে না হতো, তাহলে তোমরা কখনো তা পেতেনা।

তিন, কুরআনের আয়াত সমূহের শুদ্ধভাবে তিলাওয়াত ও হেফজ করা তাজবীদের জ্ঞান অর্জন করার পর হতে পারে। অথচ আল্লাহ্র কী শান, এ মাহবুব না কোথায় হেফ্জ করতে গেছেন, না কারো থেকে তাজবীদ শিখেছেন বরং সারা বিশ্ব এ সব কিছু তাঁর থেকে শিখেছে। আমার এ ব্যাখ্যা দ্বারা এ আপত্তিটা আপসারিত হয়ে গেল যে কুরআন তিলাওয়াততো প্রত্যেক ব্যক্তি করে থাকে, কিন্তু একে হুযূরের প্রশংসায় ও বৈশিষ্ট্যাবলীর মধ্যে কেন উল্লেখিত হলো? উপরোক্ত আয়াতে উল্লেখিত وَيُزَكِّيْكُمْ শব্দটি تَزْكِيَةٌ থেকে তৈরী করা

হয়েছে, যার অর্থ পবিত্র করা, পবিত্রতা বর্ণনা করা এবং বৃদ্ধি করা। তফসীরে কবীরে এর অর্থ করা হয়েছে যে তোমাদেরকে পবিত্র করেন বা করবেন বা তোমাদেরকে উন্নত করবেন। প্রথম অর্থ অনুসারে এর ভাবার্থ হবে যে তোমাদেরকে তিলাওয়াতে কুরআন বা বাহ্যিক আমলসমূহ পাক–পবিত্র করতে পারে না, কেবল তাঁরই করুনাময় দৃষ্টিই পবিত্র করেন। তোমাদের কেবলা কাবা শরীফও তাঁরই পবিত্র হস্তের স্পর্শ ব্যতীত মূর্তিগুলো থেকে পবিত্র হতে পারেনি।

স্মরণ রাখা দরকার যে এখানে বলা হয়েছে যে, তোমাদেরকে পবিত্র করেন। আমাদের কাছে পাঁচটি জিনিষ আছে–শরীর, অন্তর, মস্তিষ্ক রূহ ও নফসে আম্মারা। এর মধ্যে প্রথম চারটি সাময়িক ভাবে নাপাক হয়ে থাকে। কিন্তু নফসে আম্মারা মূলতঃ নাপাক। সাময়িক নাপাক জিনিষগুলো পানি, মাটি বা বায়ু ইত্যাদি দ্বারা পাক হয়ে যায়। যার বিস্তারিত আলোচনা ফিকাহের মাস্–আলাসমূহে মওজুদ আছে কিন্তু মূল নাপাক জিনিষটা ওগুলোর কোনটা দিয়ে পাক হয় না। কুকুর শুকুর ও গোবরকে যতই ধৌত করবে ততই নাপাকী বৃদ্ধি পাবে। ওগুলোর পবিত্র করার একটি মাত্র উপায় আছে। সেটা হচ্ছে এর মূল পরিবর্তন করে ফেলা। যেমন লবনের খনিতে কুকুর বা গাধা পতিত হয়ে লবনে পরিণত হয়ে গেল, তখন পাক হয়ে গেল।

আগুনে গোবর ছাই হয়ে শুধু পাক পবিত্র হয়না বরং পবিত্রতাকারী হয়ে যায়। এ ছাই দ্বারা বরতন ইত্যাদি পরিষ্কার করা হয়। সুতরাং উপরোক্ত শব্দের ভাবার্থ হলো, হে জনগণ! সেই মাহবুব তোমাদের শরীর সমূহকে শরীয়তের পানি দ্বারা, তোমাদের অন্তর সমূহ তরীকতের পানি দ্বারা, তোমাদের দেমাগ ও ধারণা সমূহ হাকীকতের পানি দ্বারা এবং তোমাদের রূহসমূহ মারফতের পানি দ্বারা পাক পবিত্র করেন। কিন্তু এ নফ্সে আম্মারা যেটা মূলতঃ নাপাক, এ সব বিষয় দ্বারা সেটা পাক হয় না। ওকে খোদাভীতির আগুনে জ্বালিয়ে এবং ইশ্কে মুস্তাফার খনিতে ডুবায়ে এর মূল পরিবর্তন করে দেন। অতঃপর সেই নফ্স আম্মারা থেকে মুত্মায়িন্না হয়ে যায়। কুরআন করীম ইরশাদ করেন–

اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّىْ (মানুষের নফ্স অবশ্যই মন্দকর্ম প্রবণ, কিন্তু যার প্রতি আমার প্রভু দয়া করেন) যখন এ নফ্স বিলীন হয়ে যায়, তখন অবস্থা এমন হয়ে যায় যে দ্বন্দ্ব মিটে যায়, আমি–আমরার ঝগড়া শেষ হয়ে যায়, শুধু তুমি আর তুমিই রয়ে যায়। মাওলানা জামী বলেন–

بندۂ عشق شدی ترک نسب کن جامی

که دریں راہ فلاں ابن فلاں چیزے نیست

অর্থাৎ প্রেমে পড়েছ যখন, বংশ মর্যাদার ধারণা ত্যাগ কর। কেননা এ রাস্তায় অমুকের ছেলে অমুকের কোন দাম নেই। অন্য এক শায়ের বলেন–

پوچھا کہ تیرا نام کیا میں نے کہا شیدا تیرا، پوچھا کہ تیرا کام کیا میں نے کہا سودا تیرا
پوچھا کہاں رہتا ہے تو میں بولا کوئے یار میں، پوچھا کہ تیرا کیا پتہ میں نے کہا رستہ تیرا

অর্থাৎ আমাকে আমার প্রেমিক নাম জিজ্ঞাসা করায় বললাম, তোমার পাগল, কাজের কথা জিজ্ঞাসা করায় বললাম, তোমার ভালবাসা, কোথায় থাকি জিজ্ঞাসা করায় বললাম, তোমার নেত্র কোণায়, ঠিকানা জিজ্ঞাসা করায় বললাম, তোমার যাতায়াতের পথ।

আগুন লাগার আগে ফুলকড়ি, জারুল, মাদার ইত্যাদি নানা রকমের লাকড়ী ছিল কিন্তু জ্বলার পর সবের নাম 'ছাই' হয়ে গেল। যখন নফ্সে আম্মারা মুত্মায়িন্না হয়ে যায়, তখন অবস্থা এমন হয়ে যায় যে মন্দ কাজ তো দূরের কথা মন্দ খেয়ালও আসে না।

হযরত উসমান গণী (রাদি আল্লাহু আনহু) কে বলা হয়েছিল, হে উসমান, যা ইচ্ছে, কর, তুমি জান্নাতী হয়ে গেছ। এতে হযরত উসমানকে গুনাহের অনুমতি দেয়া হয়নি বরং তাঁর নফ্সকে মুত্মায়িন্না করে দেয়া হয়েছে। এখন আর তিনি মন্দ কাজ করতেই পারেন না। যেমন জান্নাতবাসীদেরকে বলা হবে, তোমরা যা ইচ্ছে করতে পার। এর অর্থ এ নয় যে অন্যদের স্ত্রীদের প্রতি কুদৃষ্টিতে তাকাও বরং ভাবার্থ ওটাই হবে যে তোমাদের নফ্সে আম্মারা নেই, তাই তোমরা মন্দ কাজ করবেই না।

আর যদি تزکیه দ্বারা পবিত্রতা বর্ণনা করা বুঝায়, তাহলে এর ভাবার্থ এটাই হবে যে সেই মাহবুব দুনিয়াতে শুধু তোমাদের নয় বরং বিগত নবী ও ওলীগণেরও পবিত্রতা বর্ণনা করেন। দেখুন, ইহুদীরা কুমারী কন্যা হযরত মরিয়ম (আলাইহিস সালাম) এর প্রতি অপবাদ দিয়েছে, হযরত মহীহ আলাইহিস সালামকে দোষারোপ করেছে এবং হযরত সোলাইমান আলাইহিস সালামকে যাদুকর বলেছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওসব বুজুর্গগণের পবিত্রতা বর্ণনা করলেন, ফলে দুনিয়াতে তাঁদের শানমানের ডংকা বাজলো আর কুৎসা রটনাকারীদের মুখ বন্ধ হয়ে গেল।

একই ভাবে হুযূর আনোয়ার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবায়ে কিরাম ও আহলে বায়তের মর্তবা এবং ফযীলত বর্ণনা করায় রাফেজী ও খারেজীদের মুখে চুনকালি পড়লো। তারা লজ্জায় ঘরে আত্মগোপন করলো। কিন্তু হযরত ছিদ্দিকে আকবর ও ফারুকে আযম (রাদি আল্লাহু আনহুমা)কে নিজের পার্শ্বে শায়িত করে সমগ্র পৃথিবী দ্বারা ওনাদেরকে সালাম করালেন এবং স্বীয় পবিত্র বংশধরকে দরূদে ইব্রাহীমীতে নিজের সাথে মিলায়ে প্রত্যেক নামাযী দ্বারা ওনাদের প্রতি দরূদ পাঠ করালেন। নিজের উম্মতের ফযায়েল বর্ণনা করে তাদের নামে খোৎবা পাঠ করালেন।

বা وَيُزَكِّيكُمْ শব্দের অর্থ হচ্ছে তোমাদের আত্মাসমূহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করেন। মনে রাখবেন, মানুষের অন্তর আয়নার মত। যেমন পরিষ্কার আয়নায় ঘরের সব জিনিষ বরং স্বয়ং ঘর ওয়ালার ও নড়াছড়া দেখা যায়। অনুরূপ যদি মুসলমানদের অন্তর পরিষ্কার হয়, তাহলে আরশ–ফরশ, লুহ কলম, নদী–সমুদ্র, পাহাড়–পর্বত, খোদার সমস্ত খোদায়ী এমনকি স্বয়ং খোদা তাআলার তজল্লী দৃষ্টিগোচর হয়। আল্লাহ্ তাআলা ফরমান وَفِىْ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ○

আমি তোমাদের অন্তর সমূহে আছি। তোমরা কেন দেখতেছনা। মাওলানা রুমী বলেনঃ

گفت پیغمبر کہ حق فرمودہ است ÷ من نہ گنجم ہیچ در بالا وپست
در دل مؤمن بگنجم اے عجیب ÷ گر مرا جوئی دریں دلہا طلب

অর্থাৎ রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন যে আল্লাহ তাআলা ফরমান, আমি উপরে নীচে কোথাও অবস্থান করিনা; মুমিনের অন্তরেই আমি অবস্থান করি। তথায় আমাকে খোঁজ কর।

কিন্তু আয়না যদি অপরিষ্কার হয়, তাহলে কোন কাজে আসে না। আয়নাকে যেমন ধূলি–বালি অস্পষ্ট করে দেয়, তদ্রুপ অন্তরকে বদ আকীদা সমূহ, মন্দ আমল সমূহ, লিপ্সা, হিংসা ইত্যাদি ঝাপ্সা করে দেয়। এবং ঝাপ্সা আয়না রুমাল–গামছা ইত্যাদি দ্বারা মুছে দিলে যেমন পরিষ্কার হয়ে যায়, তেমন সুন্নাতের অনুসরণ, খোদা ভীতি, প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মহব্বতও অন্তরকে পরিষ্কার করে দেয়।

কাহিনীঃ হযরত শেখ ফরীদ উদ্দীন গঞ্জশকর (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এক ধুণকরের পাশ দিয়ে যাবার সময় ধুণকরকে রুই ধুনতে দেখে তাঁর জজবা এসে যায় এবং এ শেরটি পাঠ করে চলে গেলেনঃ

تودُھن رے دُھنئے اپنی دُھن ÷ پرائ دُھنی کی پاپ نہ پُن !
تیری کپاس میں چار بنولے ÷ سب سے پہلے ان کو چُن !
تو دُھن رے دُھنئے اپنی دُھن
حرص وحسد ھے غُصّہ کینہ !÷ ایک ایک کرکے ان کو چن
تودُھن رے دُھنئے اپنی دھن

অর্থাৎ ওহে ধুনকর, নিজেকে ধুন, অন্যকে ধুনে পাপ কর না। তোমার শিমুল তুলায় চারটি দানা আছে। সবের আগে ওগুলো খুঁজে বের কর। লিপ্সা, হিংসা, রাগ ও বিদ্বেষ–এ চার দানাকে খুঁজে বের কর। অতঃপর ভাল করে ধুন।

অন্তর হচ্ছে সেই বৈঠকখানার মত, যার একটি দরজা ঘরের দিকে এবং অন্যটা রাস্তার দিকে। যদি রাস্তার দিকের দরজা খুলে যায়, তাহলে সেটা অনাত্মীয়দের আড্ডাখানা হবে আর যদি ঘরের দিকের দরজা খুলে যায়, তাহলে নিজের ছেলেপিলে ও পরিবার পরিজনের সমাগম হবে। মোট কথা কোন সময় সমাবেশ আর কোন সময় ঘরোয়া পরিবেশ। অনুরূপ অন্তরের একটি জানালা দুনিয়ার দিকে, অপরটি দীনের দিকে থাকে। যদি দীনদারীর জানালা খুলে যায়, তাহলে এটা সুভাগ্যের বিষয়। এতে তক্ওয়া, ইশ্ক, ভীতি ইত্যাদি সবকিছু থাকবে। আর যদি খোদা না করুক, দুনিয়াদারীর জানালা খুলে যায়, তাহলে ময়লা আবর্জনায় ভরপুর হবে। এখানে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ ফরমায়েছেন যে এ মাহবুব স্বীয় করুনার দৃষ্টিতে তোমাদের অন্তরের ঘরকে ময়লা আবর্জনা থেকে পরিষ্কার করেন, যেন এটা খোদার ঘরে পরিণত হয়। বা অন্তরের আয়নায় তিনি স্প্রে করেন, যার ফলে যেন সমস্ত খোদায়ী ও খোদার জলওয়া দৃষ্টিগোচর হয়।

বা يُزَكِّيكُمْ এর অর্থ হচ্ছে কাল কিয়ামতে সেই মাহবুব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ্র দরবারে তোমাদের প্রসংশা করবেন। গুরুত্বপূর্ণ মামলা সমূহে আর্জির উপর সাক্ষ্য দেয়া হয়। অতঃপর গোপনভাবে সাক্ষীদের সততা যাচাই করা হয়। যখন নবীগণ কর্তৃক স্বীয় কউমদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র দরবারে মোকদ্দমা দায়ের করা হবে, তখন উম্মতে মুস্তাফাকে সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত করা হবে এবং হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের সাক্ষ্য সমূহের সাক্ষীও হবেন এবং স্বীয় উম্মতের পবিত্রতার সাক্ষীও হবেন। তিনি বলবেন, হে আল্লাহ্! আমার উম্মত ফাসিক–ফাজির ও সাক্ষ্যে অনুপযোগী নয়, তারা ন্যায় পরায়ন ও পরহিজগার এবং তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ যোগ্য। কিন্তু সাক্ষীর সততার নিশ্চয়তা তিনি দিতে পারেন, যিনি সাক্ষীর ভিতর বাহির সব কিছু সম্পর্কে

অবহিত। অনবহিত ব্যক্তির সত্যায়ন গ্রহণযোগ্য নয়। বুঝা গেল যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর প্রত্যেক উম্মতের আমল সম্পর্কে জ্ঞাত। দেখুন, হুযূর আলাইহিস সালাম কোন এক জায়গা সম্পর্কে বললেন, এখানে দু'ব্যক্তিকে দাফন করা হয়েছে, ওদের উপর আযাব হচ্ছে। এদের একজন ছিল চুগুলখোর, অপরজন ছিল প্রশ্রাবের চিট্কাসমূহ থেকে অসতর্ক।

وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ – (তিনি তোমাদেরকে কিতাব ও হেকমত শিখান) এ আয়াতাংশে হুযূরের তৃতীয় গুণ বর্ণনা করা হলো। আরবী ভাষায় تعليم ও اعلام দু'টি ভিন্ন অর্থবোধক শব্দ। تعليم অর্থ হচ্ছে শিখানো আর اعلام অর্থ হচ্ছে বলে দেয়া। আল্লাহ্ তাআলা এখানে يُعَلِّمُكُمْ বলেছেন। অর্থাৎ এ মাহবুব তোমাদেরকে বলেন না বরং শিখায়। শিখানোটা মুখের দ্বারা হতে পারে, কলমের দ্বারাও হতে পারে, স্পর্শ করেও, মাধ্যম দ্বারাও এবং মাধ্যমহীন ভাবেও হতে পারে। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবায়ে কিরামকে কুরআন ও হেকমত বিনা মাধ্যমে শিখায়েছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত উম্মতকে মাধ্যম দ্বারা শিখাবেন। কেননা সমস্ত ওলামা ও মাশায়েখ হুযূরের মাদ্রাসায় পড়ে কুরআন ও হাদীছের শিক্ষা দেন এবং দিতে থাকবেন।

এটাতো সুস্পষ্ট যে, কুরআন শরীফে নক্সাও আছে, যার স্থান কাগজ, শব্দ ভাণ্ডারও আছে, যার স্থান মুখ, অর্থ ও আহকামও আছে, যার স্থান মস্তিষ্ক, ভেদসমূহও আছে, যার স্থান অন্তর। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ সব বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন। জনাব আমীরে মুয়াবিয়া প্রমুখ ওহী লেখকগণকে কলম ধরা, কুরআনী বর্ণ সমূহের আকৃতি তৈরী করা ও লেখাটাও শিখায়েছেন। সকল সাহাবাকে তাজবীদের নিয়ম, বর্ণ সমূহের মুখরাজ (উচ্চারণ) তিলাওয়াতের নিয়ম ও আদবও শিখায়েছেন, এবং কুরআনের মাসায়েল ও ভেদসমূহও শিখায়েছেন, মোট কথা কোন দিক বাদ রাখেননি। আবার যেমন কুরআনী নক্সা সমূহকে অপবিত্র হাতে স্পর্শ করা যায় না, কুরআনী শব্দসমূহ অপবিত্র মুখে পড়া যায় না, তেমন কুরআনী আহকাম অপবিত্র মস্তিষ্ক বুঝতে পারে না এবং কুরআনী ভেদসমূহ অপবিত্র অন্তর ধারণ করতে পারেনা। এ জন্য আল্লাহ তাআলা কিতার শিক্ষার কথা, পবিত্রতা অর্জনের পরে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ হুযূর আলাইহিস সালাম তোমাদের ভিতর বাহির পবিত্র করেন। অতঃপর কুরআনের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ বিষয় স্ব স্ব ঠিকানায় পৌছান।

حِكْمَتْ শব্দটি حِكَمٌ শব্দ থেকে তৈরী করা হয়েছে। حِكَمٌ এর অর্থ শক্ত বা উপকারী জিনিষ। এর বিপরীত হচ্ছে নিরর্থক, উপকারহীন বা বাজে।

এখানে আলোচ্য বিষয় হচ্ছে–এ হেকমত বলতে কি বুঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, এর দ্বারা কুরআনী আহ্কাম বুঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, এর দ্বারা কুরআনী ভেদসমূহ বুঝানো হয়েছে। কিন্তু অভিমতদ্বয় ভুল। কেননা এ বিষয় দু'টি كِتَاب শব্দের মধ্যে এসে গেছে। হেকমত দ্বারা অন্য কোন বিষয় বুঝানো হয়েছে। নিঃসন্দেহে এর দ্বারা হাদীছে রসূল ও সুন্নাতে মুস্তাফা বুঝানো হয়েছে। কেননা আল্লাহ তাআলা হুযূর (সাল্লাল্লাহু আনাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাত সমূহ ও হাদীছ সমূহকে এমন অটল করেছেন, যে গুলোকে না যুগে বিলীন করতে পেরেছে, না অন্য কোন শক্তি ধ্বংস করতে পেরেছে। আজ চৌদ্দশ' বছর পরও হুযূরের এক একটি শব্দ এবং এক একটি আমল দুনিয়াতে সে রকম জিন্দা এবং মওজুদ আছে, যে রকম তাঁর জিন্দেগীতে ছিল। অথচ এরই মধ্যে অনেক বড় বড় রাজা–বাদশা রাজত্ব করে গেছে, যাদেরকে দুনিয়া ভুলে গেছে। এ জন্য হাদীছকে হেকমত বলা হয়েছে। অর্থাৎ মজবুত ও অলুপ্ত বিষয়। অথবা, যেহেতু হুযূরের প্রতিটি বাণী ও কর্ম অগণিত উপকারে ভরপুর, কোনটা অনর্থক নয়, সেহেতু একে হেকমত বলা হয়। এ বাক্য থেকে কয়েকটি মাস্আলা জানা গেল।

এক, ইল্মে দীন আল্লাহর বড় নিয়ামত। কেননা হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে লাখ লাখ নিয়ামতসমূহ দিয়েছেন, সিংহাসন দিয়েছেন, রাজত্ব দিয়েছেন, জায়গীরদারী দিয়েছেন, ইয়াতীমদেরকে লালন করেছেন, বিধবাদেরকে সম্মানিত করেছেন। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা বিশেষ ভাবে জ্ঞান দানের কথা উল্লেখ করেছেন। জনৈক শায়ের এ বক্তব্যটা নিম্নের শেরের মধ্যে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

بوریا ممنون خواب راحتش ز تاج کسریٰ زیر پائے اُمتش

অর্থাৎ ছেড়া জীর্ন বিছানা যার আরাম গাহ, সেই খোদায়ী জ্ঞান গরিমার অধিকারী নবীর উম্মতের পদতলে পারস্য রাজ কিসরার স্থান।

দুই, আল্লাহ তাআলা ফিরিশতাগণের উপর আদম আলাইহিস সালামের শ্রেষ্ঠত্ব এবং খিলাফতের অধিকারী ধন–সম্পদ বা অধিক ইবাদতের জন্য নয় বরং অধিক জ্ঞানের জন্যই ঘোষণা করেছেন। সায়্যেদেনা আলী মর্তূজা (রাদি আল্লাহু আনহু) ফরমানঃ

رَضِيْنَا قِسْمَتَ الْجَبَّارِ فِيْنَا لَنَا عِلْمٌ وَلِلْجُهَّالِ مَالٌ فَاِنَّ

الْمَالَ يَفْنِىْ عَنْ قَرِيْبٍ وَاِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَايَزَالُ

অর্থাৎ আমাদেরকে দ্বীনি ইলম দান এবং মূর্খদেরকে সম্পদ দান–আল্লাহ্র এ বন্টনের উপর আমরা সন্তুষ্ট। কেননা সম্পদ খুবই তাড়াতাড়ি ধ্বংস হয় কিন্তু কিরামতের আগ পর্যন্ত ইলমের ধ্বংস নেই।

হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) এর এ বাণী একেবারে সঠিক। মানুষ সম্পদের হিফাজত করে কিন্তু ইলম বা জ্ঞান মানুষের হিফাজত করে। সম্পদ খরচ করলে কমে যায় কিন্তু ইলম খরচ করলে বৃদ্ধি পায়। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে যে আল্লাহ তাআলা যার কল্যাণ চায়, ওকে দীনি ফিকাহশাস্ত্রবিদ বানিয়ে দেন। হযরত ইমাম মুহাম্মদ যিনি হানাফী মযহাবের বিশিষ্ট ফিকাহশাস্ত্রবিশারদ ছিলেন, তাকে তাঁর ইন্তেকালের পর কোন একজন স্বপ্নে দেখলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন অতিবাহিত হলো? তিনি হেসে বললেন, আল্লাহ্ তাআলা বড় মেহেরবানী করেছেন। আমাকে নূরের উপর বসায়ে আমার উপর নূর বর্ষন করেছেন এবং বলেছেন, হে ইমাম মুহাম্মদ, যদি তোমাকে আজাব দেয়ার ইচ্ছে থাকতো, তাহলে আমি তোমাকে দীনে মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এত বড় আলেম করতাম না। এ জন্য আল্লাহ তাআলা ফরমায়েছেন যে আলিম ও জাহিল বরাবর নয়।

তিন, ইলমেদীন তাকওয়া ও পবিত্রতা দ্বারা অধিক অর্জিত হয়। নোংরা ঘরে বাদশাহ আগমন করে না। তাহলে নোংরা অন্তরে কিভাবে কুরআন হাদীস আসতে পারে? এ জন্য আল্লাহ তাআলা উপরোক্ত আয়াতের প্রথমে يُزَكِّيكُمْ (তোমাদেরকে পবিত্র করেন) অতঃপর يُعَلِّمُكُمْ (তোমাদেরকে শিক্ষা দেন) ফরমায়েছেন। প্রথমে পবিত্রতা, এরপর শিক্ষার কথা বলা হয়েছে।

চার, অন্য কোন ব্যক্তি সাহাবায়ে কিরামের মত কুরআন হাদীছের জ্ঞান অর্জন করতে পারে না। কেননা, আমরা আমাদের উস্তাদগণ থেকে জ্ঞান লাভ করেছি। কিন্তু ওনারা সোজাসুজি আল্লাহ তাআলা থেকে। আল্লাহ তাআলা ফরমান, الرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ। রহমান স্বীয় হাবীবকে কুরআন শিখায়েছেন, এবং এখানে ফরমায়েছেন وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (এবং তোমাদেরকে কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেন) হুযূর আলাইহিস সালাম থেকে সাহাবায়ে কিরামই হচ্ছেন প্রত্যক্ষভাবে ফয়েজ গ্রহণকারী। ইঞ্জিন প্রথমে আগের বগিকেই টানে। অবশিষ্ট বগিগুলো ওটার মাধ্যমে টানা হয়।

পাঁচ, যারা বলে যে হুযূর কিছুই দিতে পারে না, তারা ভ্রান্ত। দেখুন, উপরোক্ত আয়াতে ছয়টি নিয়ামতের কথা বর্ণিত হয়েছে, যার মধ্যে মাত্র একটি নিয়ামত

আর্থৎ হুযূরকে প্রেরণ করাকে আল্লাহ তাআলা নিজের বলেছেন, বাকী পাঁচটার বেলায় স্বীয় হাবীবের কথা উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, আমি তোমাদের মধ্যে রসূল প্রেরণ করেছি, এবং সেই রসূল তোমাদেরকে কুরআন শিক্ষা দেন, পবিত্রতা দান করেন, কুরআন ও হাদিছের জ্ঞান প্রদান করেন। সার কথা হলো, প্রত্যেক কিছুর জন্য সোজাসুজি আমার কাছে দৌড়ে এসো না। বরং ওসব জিনিষের জন্য আমার হাবীবের আস্তানায় যাও। আমিই দিব, তবে ওনার মাধ্যমে। তৃষ্ণাতুর ব্যক্তি কূপের কাছে, ক্ষুধার্ত ব্যক্তি খাবার দোকানে, রোগী হাসপাতালে যাবে। সুতরাং নোংরা, মূর্খ, ও গুনাগার ব্যক্তি যেন মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্র আস্তানায় হাজির হয়।

ছয়, যে কোন ব্যক্তি যে কোন মর্যাদা বা স্তরে পৌঁছে হুযুর আলাইহিস সাল্লাম থেকে বেপরওয়া হতে পারে না। এ আয়াতে সম্বোধনটা সাহাবায়ে কিরাম থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত মুসলমানের বেলায় প্রযোজ্য। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তোমাদেরকে পবিত্র করবেন এবং তোমরা পবিত্র হবে। তিনি তোমাদেরকে ইলম শিখাবেন এবং ইলম দান করবেন, তখন তোমরা আলিম হবে। এতে তোমাদের জন্য ইজ্জত রয়েছে যে এর ফলে ওনার সাথে তোমাদের সম্পর্ক অর্জিত হবে। ওনার সামান্য ছিট্‌কা থেকে তোমরা সব কিছু হতে পার। ওনার সমুদ্রে কোন কমতি নেই।

কাহিনীঃ 'গুলিস্তা' কিতাবে বর্ণিত আছে যে, এক বাদশা স্বীয় উযীর ও আমীরগণ সাথে নিয়ে শিকারে গেলেন। পথে সন্ধ্যা হয়ে গেল। সেখান থেকে রাজ প্রসাদ অনেক দূরে ছিল। কোথায় যাবেন চিন্তা করতে লাগলেন। কোন এক গ্রামবাসীর কুঁড়ে ঘর চোখে পড়লো। বাদশা বললেন, চল, ওখানে গিয়ে রাত অতিবাহিত করি। উযীর বললেন, হুযুর একজন গ্রামবাসীর ঘরে রাত কাটানো আপনার শানে শোভা পায় না। আমরা এখানেই তাবু স্থাপন করছি, সব জিনিষ পত্র মওজুদ আছে, সব কিছুর ব্যবস্থা করে নিচ্ছি। ওদিকে সেই গ্রামবাসী খবর পেল যে বাদশা ওর গবীর খানায় আসতে চেয়েছিলেন কিন্তু উযীর বাধা দিয়েছে। সে [illegible] বাদশার খেদমতে হাজির হলো এবং সালাম করার পর বললো, সূর্য আমার কূঁড়ে ঘরের উপর চম্‌কাতে চেয়েছিল কিন্তু মেঘরাশি আমার কূঁড়ে ঘরকে বঞ্চিত রাখার জন্য চেষ্টা করেছে। কিন্তু সূর্য যদি মেহেরবাণী করে, তাহলে মূহর্তের মধ্যে মেঘকে অপসারিত করতে পারে এবং আমার অন্ধকার কূঁড়ে ঘরকে আলোক উজ্জল করতে পারে। এ ভাবে কাকুতি মিনতি করার ফলে বাদশার মন

গলে গেল এবং নির্দেশ দিলেন, সমস্ত তাবু উঠায়ে নাও, সবাই এ গ্রামবাসীর কুঁড়ে ঘরে চল। স্বয়ং আমিও ওখানে আরাম করবো। বাধ্য হয়ে সবাইকে ওখানে যেতে হলো। গ্রাম্য পরিবেশ অনুসারে ওর কাছে বিছানা পত্র যা কিছু ছিল, তা বাদশার খেদমতে পেশ করলো। বাদশা তা অনেক আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করলেন এবং শুয়ে পড়লেন। সকালে বাদশা সেই গ্রামবাসীকে টাকা-পয়সা মনিমুক্তা ইত্যাদিতে ভরপুর করে দিলেন। যখন রওয়ানা হতে লাগলেন, তখন সেই গ্রামবাসী ঘোড়ার লাগাম ধরে ফেললো এবং নিম্নের শেরটা পাঠ করলোঃ

زشان وشوکت سلطان نه گشت چیزے کم
زالتفات به مهمان سرائے دهقانے
کلاه گوشۂ دهقان به آفتاب رسید
که سایه به سرش افگندچوں توسلطانے

অর্থাৎ একজন গ্রামবাসীর কুঁড়ে ঘরে অবস্থান করার দ্বারা বাদশার শানের কোন ঘাটতি হয়নি কিন্তু গ্রামবাসীর পাগড়ী আনন্দে চতুর্থ আসমানে পৌছে গেছে। আপনার মত একজন বাদশার ছায়া গরীবের মাথার উপর পতিত হওয়ায় এর থেকে বড় সুভাগ্যের বিষয় আর কি হতে পারে।

جوکرم سےاپنےشاہ اُمم ÷ رکھیں اِس غریب کےگھرقدم
میرےشاہ کی نہ ھوشان کم ÷ کہ گداسےان کو پیارھے
ولےاس غریب کا غم کدہ ÷ بنےرشک خلدبریں شاھا
کرے ناز اپنے نصیب پر ÷ بنے شاہ وہ جو گنوار ھے

প্রিয় নবীর করুনাময় দৃষ্টিতে আমাদের মত নোংরা ব্যক্তিরা পবিত্র হয়ে যাই, জাহিল আলেম হয়ে যায়, নগন্য ব্যক্তি গণ্যমান্য হয়ে যায়। আমরা, যাদেরকে কেউ পাত্তা দিতে চায় না, তাঁরই সংশ্রবে আমরা মুল্যবান হয়ে যাই।

بهائے خویش میدانم – به نیم جونمی ارزد
وگراوفضل فرماید – بها ئم بےبهاگردد

অর্থাৎ আমি আমার মর্যাদাকে যবের অর্ধ সমতূল্যও মনে করি না। কিন্তু যদি তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শুভ দৃষ্টি দান করেন, তাহলে আমার মর্যাদা অসীম হয়ে যাবে।

আয়াতের শেষ অংশ হচ্ছে ০ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ

(সেই মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদেরকে সেই বিষয় সমূহ শিখান, যা তোমরা জান না) এর তফসীর হচ্ছে সেই মাহবুব তোমাদেরকে শুধু মাসায়েলই শিখান না, বরং আদিকাল থেকে এখন পর্যন্ত যতসব ঘটনাবলী পৃথিবীর উপর দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে এবং এখন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিতব্য সমস্ত কিছু তোমাদেরকে শিখান এবং বলেন। এর তফসীর সেই হাদীছ, যেটা ইমাম বোখারী, মুসলিম প্রমুখ রেওয়ায়েত করেছেনঃ

এক দিন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের পর মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে ওয়াজ করলেন। শেষ পর্যন্ত যোহরের সময় হয়ে গেল। যোহরের নামায পড়ে পুনরায় ওয়াজ আরম্ভ করলেন, শেষ পর্যন্ত আসরের সময় হয়ে গেল। আসর পড়ে আবার ওয়াজ শুরু করলেন, শেষ পর্যন্ত মাগরীবের সময় হয়ে গেল। এ ওয়াজে সৃষ্টির আদি থেকে কিয়ামত বরং জান্নাতীদের জান্নাতে এবং দোযখীদের দোযখে পৌঁছা পর্যন্ত সমস্ত অবস্থাদি এমনভাবে বর্ণনা করেছেন যে, যে পাখি পলক নাড়বে, সেটা বলেদিয়েছেন, যে অনু নড়াছড়া করবে, সেটাও বলেদিয়েছেন এবং যে ফোটা পড়বে, সেটার খবরও দিয়েদিলেন। যে স্মরণ রাখতে পেরেছে, তাঁর স্মরণ আছে এবং যে স্মরণ রাখতে পারেনি সে ভূলে গেছেন। এটাও হুযূরের মুজেযা যে এ সংক্ষিপ্ত সময়ে এত ব্যাপক বর্ণনা দিলেন।

দাউদ আলাইহিস সালাম ঘোড়ায় যীন লাগানোর আগেই সমস্ত যবুর পড়ে ফেলতে পারতেন। আর আমাদের হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এত অল্প সময়ের মধ্যে সবকিছু বর্ণনা করতে পারেন।

ছুফিয়ানে কিরাম বলেন, এখানে مَا لَا تَعْلَمُوْنَ দ্বারা আমাদের নফ্‌সের দোষসমূহের কথা বুঝানো হয়েছে। যে রকম ডাক্তার রোগীর অসুখ ও এর সব রকম শারীরিক অবস্থার কথা বলেন, অথচ স্বয়ং রোগীর কাছে নিজের অবস্থার খবর থাকে না, সে রকম আমাদের নিজের কাছে স্বীয় নফ্‌সের দোষত্রুটির কথা জানা নেই, সেই শাহীন শাহে কাউনাইন (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে অবহিত করার ফলে জানা গেছে। ছুফিগণ বলেন যে নফ্‌সের ধোকা ও প্রতারণা থেকে সেই বাঁচতে পারে, যাকে আল্লাহ বাঁচান।

যে রকম জমীনের বালুকারাশি, আসমানের তারাসমূহ আমাদের গণনার বাইরে, সে রকম নফসের প্রতারণাও আমাদের ধারণার বাইরে। সমস্ত দুশমন আমাদের থেকে দূরে থাকে আর আমরাও ওদের থেকে সরে থাকি। কিন্তু এ কপট

বন্ধু সব সময় সাথে থাকে। এটা মনে করনা যে এ কপট বন্ধু সবাইকে ইবাদতসমূহ থেকে বাঁধা দেয়, তা নয়, বরং অনেকের দ্বারা ইবাদতও করায়। কিন্তু সেই ইবাদত করানোটা আসলে ওদেরকে অন্যান্য ইবাদত থেকে বাঁধা দেয়ার জন্যই করে থাকে।

কাউকে বলে, তুমি বেশী করে নফল নামায পড়। সে নফলে নিয়োজিত হয়ে ফরয সমূহ ত্যাগ করে বসে। কাউকে সারা রাত আল্লাহ আল্লাহ করায়ে এতটুকু ঠকিয়ে দেয় যে সে পরবর্তী ইবাদতে অক্ষম হয়ে পড়ে।

উৎসর্গ হয়ে যাও সেই মাহবুবের জন্য, যিনি আমাদেরকে এ সব আপদ সম্পর্কে অবহিত করেছেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমান উত্তম নেকী হচ্ছে সেটা, যা সবসময় করা হয় যদিওবা সামান্য হয়। একবার আবি বিন কাব বা অন্য কোন সাহাবী ফযরের জামাতে শামিল হলেন না। হযরত ওমর ফারুক (রাদি আল্লাহ আনহু) খোজ নেয়ার উদ্দেশ্যে ওনার ঘরে গেলেন। তিনি মনে করেছেন যে হয়তো এমন অসুস্থ হয়ে গেছেন যে কারো সাহায্যেও মসজিদে যেতে পারেননি। ওনার স্ত্রী সাহেবা বললেন, তিনি সারা রাত নফল সমূহে নিয়োজিত ছিলেন। ভোর হবার সময় ঘুম এসেছে এবং দেরীতে জাগ্রত হয়েছেন। তাই জামাতে যেতে পারেননি। আমীরুল মুমেনীন হযরত ওমর (রাদি সাল্লাহু আনহু) বললেন, ওনার উচিৎ ছিল ইশার নামায পড়েই শুয়ে যাওয়া এবং ফযর জামাতে পড়া।

নফল সমূহের কারণে ওয়াজিব ত্যাগ করনা। এটা ছিল সেই শিক্ষা, যার বরকতে মানুষ নফসের ধোকা সমূহ থেকে বাঁচতে পারে। এ জন্যই বলা হয়েছে وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ(এবং তিনি তোমাদেরকে শিখায়, যা তোমরা জাননা)।

আমার এ বয়ান থেকে নিশ্চয় জানা গেছে যে, এ আয়াত শরীফে বারংবার কোন কথা বলা হয়নি। কিতাব ও হেকমত দ্বারা এক দিকে ইশারা করা হয়েছে এবং এ শেষ বাক্যাংশে অন্য আর এক দিকে ইংগিত করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ও তার থেকে গ্রহণ করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ -

বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রাহীম

فَاذْكُرُوْنِىْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِىْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ ০

তরজুমাঃ হে আমার বান্দাগণ! তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে স্মরণ করবো। আমার শোকর গুজারী কর এবং নাশোকরী কর না।

আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে আমাদেরকে তাঁর যিক্‌র ফিক্‌রের নির্দেশ দিয়েছেন। এ আয়াতের প্রতিটি শব্দ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। فَاذْكُرُوْنِىْٓ শব্দের ف (ফা) আরবী ব্যাকরণ মতে হয়তো জযাইয়া বা সেলার ফা। অর্থাৎ তোমরা আমার নিয়ামত সমূহের কথা শুনেছ, তাই এর কৃতজ্ঞতায় আমার যিক্‌র ও শোকর কর বা যেহেতু আমি তোমাদেরকে আমার প্রিয় মাহবুবের গোলামী দান করেছি, সেহেতু আমাকে স্মরণ কর ও আমার শোকর গোজার কর।

উপরোক্ত আয়াতের প্রথমাংশে দু'জায়গায় ذِكْر শব্দ উল্লেখিত হয়েছে– একটা فَاذْكُرُوْنِىْٓ এর মধ্যে এবং অপরটি اَذْكُرْكُمْ এর মধ্যে। কুরআন করীমে যিক্‌র পাঁচ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে–স্মরণ করা, স্মরণ রাখা, তাজীম করা, ইজ্জত দেয়া ও প্রসিদ্ধ করা।

আল্লাহ্ তাআলা ফরমান وَالْقُرْاٰنِ ذِى الذِّكْرِ– (ইজ্জতময় কুরআনের শপথ) আর এক জায়গায় ফরমান فِيْهِ ذِكْرُكُمْ (এতে তোমাদের কথা বর্ণিত আছে) এখানে ذِكْر সম্মান বৃদ্ধি ও প্রসিদ্ধি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। فَاذْكُرُوْنِىْٓ শব্দে এর তিন রকম অর্থ এবং اَذْكُرْكُمْ এর পাঁচ রকম অর্থ হতে পারে। যেমন–হে আমার বান্দাগণ! তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে স্মরণ করবো বা তোমরা আমাকে স্মরণ রাখ, আমি তোমাদেরকে স্মরণ রাখবো বা তোমরা আমার তাজীম কর, আমি তোমাদের তাজীম করবো বা তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে ইজ্জত দান করবো বা তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে খ্যাতি দান করবো। যদি উল্লেখিত আয়াতে প্রথম অর্থ বুঝানো হয়, অর্থাৎ তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে স্মরণ করবো, তাহলে এর তফসীর হচ্ছে সেই হাদীছে কুদসী, যেটায় আল্লাহ্ তাআলা ফরমান, যে বান্দা আমাকে মনে মনে স্মরণ করে, আমিও ওকে মনে মনে স্মরণ করি এবং যে বান্দা আমাকে সমাবেশে স্মরণ করে, আমি ওকে উত্তম সমাবেশে অর্থাৎ ফিরিশতাগণের সামনে স্মরণ করি। সুবহানাল্লাহ! কী যে সুভাগ্য! আমাদের সামান্য মুখ নাড়ার বরকতে আল্লাহর দরবারে আমাদের স্মরণ করা হয়।

ذِكْرُ اللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র স্মরণ সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় একান্তভাবে জানা দরকার। এক, যিক্‌রুল্লাহ কত প্রকারের, দুই যিক্‌রুল্লাহ কত রকমভাবে হয়, তিন, যিক্‌রুল্লাহর কি উপকার আছে, চার, কোন্ যিক্‌রটা উত্তম।

(১) যিক্‌রুল্লাহ তিন প্রকার–এক সোজাসুজি খোদার জাত ও গুণাবলীর যিক্‌র, দুই, আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাগণ ও তাঁর প্রিয় জিনিষ সমূহে মাহাত্ম্য বর্ণনা পূর্বক যিক্‌র, তিন, আল্লাহ্‌র দুশমনদের তিরস্কার, নিন্দাপূর্বক যিক্‌র।

দেখুন, সম্পূর্ণ কুরআনটাই আল্লাহ্‌র যিক্‌র। কোন জায়গায় আল্লাহ্‌র জাত ও গুণাবলীর যিক্‌র, যেমন قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ الخ (হে মাহবুব, বলুন আল্লাহ্ এক.....) কোন জায়গায় আল্লাহ্‌র নবী–ওলীগণ, কাবা মুয়াজ্জামা ইত্যাদির যিক্‌র, যেমন সূরা কাউসার সূরা শোবা ইত্যাদি এবং কোন জায়গায় আল্লাহ্‌র দুশমনদের যিক্‌র, যেমন সুরা লাহাব ইত্যাদি। এমনকি আল্লাহ্‌র আহকামের বর্ণনাও আল্লাহ্‌র যিক্‌র।

(২) শরীরের অংগসমূহের যিক্‌র আলাদা আলাদা। চোখের যিক্‌র হচ্ছে আল্লাহ্‌র নিয়ামতসমূহ মহব্বতের দৃষ্টিতে দেখা বা ওগুলোকে স্মরণ করে কান্না করা, কানের যিক্‌র হচ্ছে, আল্লাহ্‌র গুণকীর্তন মনোযোগ সহকারে শুনা, মুখের যিক্‌র হচ্ছে আল্লাহ্‌র স্মরণে মুখ ভিজা রাখা, হাতের যিক্‌র হচ্ছে কুরআন শরীফ ও অন্যান্য ভাল বস্তুসমূহ স্পর্শ করা ও নেক্‌কারদের সাথে মুসাফাহা করা, পায়ের যিক্‌র হচ্ছে মসজিদ সমূহ ও খানকা সমূহের মাহফিল ইত্যাদিতে হেঁটে যাওয়া, বিশেষ করে হেরমাইন শরীফাইনে হাজেরী দেয়া। অন্তর ও মস্তিষ্কের যিক্‌র হচ্ছে নিজের গুণাহসমূহ, আল্লাহ্‌র দানসমূহ, নিজের অপকর্মসমূহ এবং আল্লাহ্‌র সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করা। এ সব যিক্‌র فَاذْكُرُوْنِىْٓ শব্দের অন্তর্ভুক্ত।

(৩) যিক্‌রের অগণিত ফায়দা রয়েছে। একটি হচ্ছে সেটা, যা উপরে উল্লেখিত হয়েছে, অর্থাৎ এর বরকতে আল্লাহ্‌র বারগাহে আমরা গুণাহগারদের যিক্‌র (আলোচনা) হয়। যে এটা জানতে ইচ্ছা করে যে, আল্লাহ্‌র সেখানে আমার যিক্‌র কতটুকু হয়, তাহলে সে নিজের অবস্থা দেখে নিবে যে সে আল্লাহ্‌র কি পরিমাণ যিক্‌র করে। যিকর করুন এবং যিক্‌র করায়ে নিন। দ্বিতীয় ফায়দা হলো সেটা, যা কুরআন শরীফের এ আয়াতে উল্লেখিত আছে–اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র যিক্‌রে অস্থির মন শান্ত হয়। হবেইনা বা কেন? আমাদের অস্থিরতা আমাদের গুণাহ সমূহের কারণে হয়ে থাকে। আল্লাহ্‌র যিক্‌র হচ্ছে এ

সব গুণাহসমূহের মাগফেরাতের উসীলা। গুনাহ মাফ হলে অন্তরে স্বস্থির ভাব এসে যায়। মাওলানা রুমী (রহমতুল্লাহে আলাইহ) বলেন–

چوں بیاید نام پاکش دردهاں ÷ نے پلیدی ماندو نے آں دهاں

ذکرحق پاکیست چوں پاکی رسید ÷ رخت می بندد بیروں آید پلید

অর্থাৎ যখন আল্লাহ্‌র পবিত্র নাম মুখে আসে, তখন সে মুখে কোন নাপাকী থাকতে পারেনা। আল্লাহ্‌র যিক্‌র হচ্ছে পবিত্র জিনিষ। তাই পবিত্রতা আসলে, অপবিত্রতা নিশ্চয় অপসারিত হয়ে যায়।

আল্লাহ্‌র যিক্‌র রূহ ও অন্তরের জন্য আপন দেশের চিঠির মত। দেশের চিঠি ও আলোচনা দ্বারা প্রবাসীদের যে রকম শান্তনা লাভ হয়, যে রকম আল্লাহ্‌র যিক্‌র দ্বারা রূহ ও অন্তরের শান্তনা অর্জিত হয়। আজকাল লোকেরা মনে করে যে মনের শান্তনা ও অস্থিরতা দূর করার জন্য সিনেমা, গান–বাজনা, ইত্যাদি উপভোগ করা দরকার। আসলে এর দ্বারা মনের তৃপ্তি হয়না। বরং নফ্‌সে আম্মারাই পরিতৃপ্ত হয়। যেমন মুর্খ মা পেটের অসুখে ক্রন্দনরত শিশুকে নিশ্চুপ করার জন্য স্বীয় স্তন ওর মুখে দিয়ে দেয়। যার ফলে শিশু কিছুক্ষণের জন্য নিশ্চুপ থাকে কিন্তু রোগ আরও বৃদ্ধি পায়। যদি মনের সত্যকার শান্তি চান, তাহলে গুনাহসমূহের নাপাকী আল্লাহ্‌র যিক্‌র দ্বারা বিদূরীত করুন।

তৃতীয় ফায়দা হলো, আল্লাহ্‌র যিক্‌র দ্বারা বান্দার ইজ্জত–সম্মান বৃদ্ধি পায়। আপনাদের মুখ দিয়ে আল্লাহ্‌র যিক্‌র যত বেশী হবে, সে পরিমাণ লোকদের মনে আপনাদের সম্মান বৃদ্ধি পাবে। মাওলানা রুমী ফরমানঃ

گرچه خواهی زیستن باآبروئے ذکرآوکن ذکر او

অর্থাৎ তুমি যদি মান–সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকতে চাও, তাহলে আল্লাহ্‌র যিক্‌র কর, যিক্‌র কর। চতুর্থ ফায়দা হলো, আল্লাহ্‌র যিক্‌র হচ্ছে ঈমানের ভূষণ। এর বরকতে লোকদের মধ্যে যিক্‌রকারীর আলাদা বৈশিষ্ট্য অর্জিত হয়। মাওলানা রুমী ফরমানঃ

هرگدارا ذکر او سلطاں کند ÷ ذکر اومر زیورے ایماں بود

هر که دیوانه بود در ذکر حق ÷ زیر پائش عرش وکرسی نو فلك

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র যিক্‌র ফকীরকে বাদশাহ বানিয়ে দেয়। আল্লাহ্‌র যিক্‌র হচ্ছে ঈমানের অলংকার।

যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র যিক্‌রে দেওয়ানা হয়ে যায়, আরশ কুরসী নব ভূমণ্ডল ওর করতলগত হয়ে যায়।

স্মরণ রাখা দরকার যে কতেক যিক্‌র মকবুল, কতেক যিক্‌র মাহবুব এবং কতেক যিক্‌র মরদূদ। আল্লাহ্‌র আজাব থেকে রক্ষা বা রহমত লাভের জন্য আল্লাহ্‌র যিক্‌র করা তথা আল্লাহকে স্মরণ করা ইন্‌শাআল্লাহ্‌ মকবুল যিক্‌র। আল্লাহ্‌ তাআলা এর বরকতে বান্দার আরজু পূর্ণ করবেন, দোযখ থেকে রক্ষা করবেন, এবং জান্নাত দান করবেন।

জান্নাত–দোযখের খেয়ালে নয়, কেবল আল্লাহ্‌র মহব্বতে ওকে স্মরণ করা মাহবুব যিক্‌র। এ ধরনের যিক্‌রের বরকতে বান্দা আল্লাহ্‌র মাহবুব হয়ে যায়। কেননা এ যিক্‌রে বান্দার নিজস্ব কোন স্বার্থের বিষয় অন্তর্ভূক্ত নেই। তাই এ যিক্‌রের বরকত সেটাই, যা একটি হাদীছে কুদ্‌সীতে বর্ণিত আছে যে আমি সেই বান্দার চোখ হয়ে যাই, যদ্দারা সে দেখে, ওর কান হয়ে যাই যদ্দারা সে শুনে, ওর হাত হয়ে যাই, যদ্দারা সে স্পর্শ করে, ওর পা হয়ে যাই, যদ্দারা সে চলে অর্থাৎ ওর অংগসমূহে খোদায়ী ক্ষমতা এসে যায় এবং বান্দা খোদায়ী কাজ করতে থাকে। এ জন্য নয় যে বান্দা খোদা হয়ে যায়, (নাউযুবিল্লাহ) এবং এ জন্যও নয় যে বান্দার মধ্যে খোদা অবতীর্ণ হয় (এ রকম মনে করা নিঃসন্দেহে শির্‌ক) এ জন্য যে বান্দা খোদার জাতে পাকের প্রকাশস্থল হয়ে যায়।

স্বচ্ছ আয়না সূর্যের সামনে রাখলে আয়নায় সূর্যের আলোকরশ্মি, তাপ সবকিছু প্রকাশ পায় কিন্তু না আয়না সূর্য হয়ে গেল এবং না সূর্য আয়নায় নেমে আসলো বরং সূর্যের মেহেরবাণীতে এর আলোকছটা আয়নায় পতিত হয়েছে।

পানি আগুনের মধ্যে ফুটালেন। তখন এ পানি আগুনের মত কাজ করতে লাগলো, শরীরের উপর পড়লে চামড়া ঝলসিয়ে যায় অথচ না পানি আগুন হয়ে গেল এবং না আগুন পানির মধ্যে ঢুকে গেল। কুরআন করীমে নবীগণের এমন এমন মোজেযা সমূহ এবং ওলীগণের এমন এমন কিরামতসমূহ বর্ণিত আছে, যে গুলো শুনলে অবাক লাগে। মানবীয় শক্তি দ্বারা সেই কাজ করতে পারে না, কেবল খোদায়ী শক্তি দ্বারা সম্ভব।

একটি ঘটনা বর্ণনা করছি, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মের সময় হযরত মরিয়ম আলাইহিস সালাম লজ্জায় জংগলে চলে গিয়েছিলেন। তীব্র প্রসব বেদনায় ঘাবড়িয়ে বললেন–يٰلَيْتَنِىْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا

আহ! এর আগেই আমি মরে যেতাম এবং বিস্মৃতির অতল গহ্বরে হারিয়ে যেতাম। কেননা প্রসবের কঠিন কষ্ট এবং কাছে কোন ধাত্রীও নেই, পানিও নেই। সংগে সংগে গায়বী আওয়াজ আসলো

فَنَادٰهَا مِنْ تَحْتِهَا اَلَّا تَحْزَنِىْ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ○
وَهُزِّىْٓ اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ○

হে মরিয়ম! ভয় কর না। তোমার পায়ের নীচে পানি আছে এবং সেই শুকনা খেজুর বৃক্ষে হাত লাগাও, যেটার মধ্যে নেই কোন সজীবতা, নেই কোন পাতা বা ফল। এখনই তরতাজা হয়ে যাবে, এখনই সেটাতে তাজা পাতা বের হবে ফল ধরবে এবং এখনই পেকে যাবে। সেটা খেয়ে নাও এবং পানি পান করে নাও।

দেখুন, ওলীর হাতে কী শক্তি। শুকনা বৃক্ষে হাত লাগালে শুধু তরতাজা নয়, এক মুহূর্তেই ফলদার বৃক্ষ হয়ে যায়। বলুন এটা কার ক্ষমতা? এটা যিক্‌রে মাহবুবের প্রভাব। ওলীগণের হাতের স্পর্শে যেভাবে শুকনা বৃক্ষ তরতাজা হয়ে যায়, সেভাবে ওনাদের দৃষ্টিতে পাষান হৃদয়ও গলে যায়, মুশকিল আসান হয়ে যায়, মছিবত সমূহ লাঘব হয়ে যায়।

মরদুদ যিক্‌র হচ্ছে, কোন অসৎ ব্যক্তি অসৎ উদ্দেশ্যে ধোকাবাজি বা হীন স্বার্থের জন্য আল্লাহ্‌র নাম নেয়া। পেশাদার ভিক্ষুক দিনরাত আল্লাহ্ আল্লাহ্ করে ঘুরে বেড়ায়। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সম্ভবতঃ দু'হাজার বার আল্লাহ্‌র নাম নেয় কিন্তু তা শুধু কয়েক গ্রাস খাদ্যের জন্য। মিথ্যা শপথকারীরা কুরআনেও হাত দেয়। কিন্তু তা কেবল ধোকার জন্য এবং মিথ্যাকে সত্যে পরিণত করার জন্য। ফকীহগণ বলেন, ভিক্ষা চাওয়ার উদ্দেশ্যে কুরআন তিলাওয়াত হারাম এবং মদপান বা যিনা করার সময় বিস্‌মিল্লাহ পড়া কুফরী। এতে আল্লাহ্‌র নামের অবমাননা হয়।

মাহবুব যিক্‌রকারীদের এমন এক সময় আসে, যখন ওনারা আমিত্বকে বিলীন করে দেয়। প্রথমে তো ওনাদের অংগ প্রত্যংগে কুদরতী ক্ষমতা প্রকাশ পায়। পরে কোন কোন অবস্থায় মাঝে মধ্যে ওনাদের মুখ থেকে اِنِّىْٓ اَنَا اللّٰه (আমি আল্লাহ্) বা يَا اَنَا الْحَقُّ (আমি হক) বা يَا سُبْحَانِىْ مَا اَعْظَمَ شَانِىْ

(আশ্চর্য! আমার শান কত উর্ধে) ইত্যাদি শব্দ বের হতে থাকে। আসলে ওই সময় ওনারা খোদায়ী দাবী করেন না। বরং ওনাদের মুখ দিয়ে স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা বলেন, আমি আল্লাহ্, আমি হক ইত্যাদি।

যেমন রেডিওতে যখন প্রধান মন্ত্রী ভাষণ দেন, তখন বলেন, 'আমি প্রধান মন্ত্রী বলছি, আপনাদেরকে এ নির্দেশ দিচ্ছি' তখন প্রত্যেক জায়গার রেডিওর সেট

থেকে একই আওয়াজ বের হয় কিন্তু না সেই সেটগুলো প্রধান মন্ত্রী হয়ে যায়, না প্রধান মন্ত্রী ওসব সেটে আগমন করে। বরং এ সেটগুলো আওয়াজটা আপনারা পর্যন্ত পৌছিয়ে দিল।

দেখুন, যখন হযরত মূসা আলাইহিস সালাম প্রথমবার তুর পাহাড়ের নিকটস্থ ওয়াদিয়ে আয়মনে আগুনের জন্য গেলেন, তখন একটি উজ্জল বাবুল বা কুল বা উন্নাব বৃক্ষ দেখলেন, যার মধ্যে শুধু আলো ছিল, কোন ধোঁয়া বা তাপ ছিল না এবং সেই বৃক্ষ থেকে আওয়াজ বের হচ্ছিল, "হে মূসা আমি তোমার রব।" যেমন কুরআন মজীদে বর্ণিত আছে مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يّٰمُوْسٰٓى اِنِّىْٓ اَنَا اللّٰه

(বৃক্ষ থেকে আওয়াজ বের হলো, হে মূসা, আমি আল্লাহ্) কিন্তু এ বৃক্ষ খোদা ছিল না, এবং খোদাও ওখানে আসেননি বরং আল্লাহ্ স্বীয় কালাম এ বৃক্ষের মাধ্যমে মূসা আলাইহিস সালামকে শুনালেন। এ রকমই ওনাদের অবস্থা হয়ে থাকে। মাওলানা রুমী বলেন–

چوروا باشد اَنَا اللّٰه از درخت ÷ کسے روا نبود که گوید نیك بخت

অর্থাৎ যদি বৃক্ষ 'আমি আল্লাহ্' বল্‌লে জায়েয হয়, তাহলে নেক বান্দারা বললে কেন জায়েয হবে না। পানির ফোঁটা সমুদ্রে পৌছার পর বলে যে, আমি সমুদ্র হয়ে গেছি কিন্তু সে সমুদ্র হয়নি বরং সমুদ্রে বিলীন হয়ে গেছে। কোন এক ব্যক্তি বলেছেন–

بنده از بندگی خدا گوید ÷ نه تواند که مصطفٰے گوید

قطره در آب رفت آب شود ÷ نه تواند که دُرّ ناب شود

অর্থাৎ বান্দা বন্দেগী দ্বারা অনেক উচ্চস্তরে পৌছতে পারে কিন্তু মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর স্তরে পৌছতে পারে না। যেমন পানির ফোটা সাগরের পানিতে মিশে যেতে পারে কিন্তু মুক্তায় পরিণত হতে পারে না।

যেহেতু এখানে আল্লাহ্‌র যিক্‌র সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে, সেহেতু এখানে এটা বলাটা সমীচীন মনে করি যে নক্সবন্দীয়াগণের কাছে নিম্নস্বরে যিক্‌র উত্তম এবং অপর তিন সিলসিলায় উচ্চস্বরে যিক্‌র উত্তম (এ আলোচনাটা ওসব যিক্‌র সম্পর্কিত, যেগুলোর বেলায় শরীয়ত উচ্চ বা নিম্নস্বরের কোন শর্তারোপ করেনি। কিন্তু আযান, ইকামত, হজ্জের তলবিয়া, তিন ফরয নামাযের কিরাতে উচ্চস্বর এবং যোহর ও আসরের কিরাতে নিম্নস্বর ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত)।

নক্সবন্দীয়াগণের দলীল হচ্ছে اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً (তোমাদের রবকে বিনীত ও গোপনভাবে ডাক) তাঁরা আরও বলেন যে, যাকে শুনানোর উদ্দেশ্য, তিনি নিম্নস্বরে বললেও শুনেন। উচ্চস্বরে যিক্‌রের মধ্যে কপটতার সন্দেহ থাকে, নিম্নস্বরে যিক্‌রের মধ্যে এসব সন্দেহের অবকাশ নেই। অপর তিন সিলসিলার অনুসারীগণ এ আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করেনঃ

فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا -

(তোমাদের পিতৃ পুরুষকে স্মরণ করার মত আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর অথবা এর থেকে জোরালো ভাবে) অধিকন্তু তাঁরা সেই হাদীছে কুদসীটা উল্লেখ করেন, যেটাতে বলা হয়েছে, যে বান্দা আমাকে মনে মনে স্মরণ করে, ওকেও আমি মনে মনে স্মরণ করি এবং যে আমাকে সমাবেশে স্মরণ করে, আমিও ওকে এর থেকে উত্তম সমাবেশে স্মরণ করি। তাঁরা আরও বলেন, উচ্চস্বরে যিক্‌রের দ্বারা অন্তরে বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি হয় এবং অন্যদের মধ্যে যিক্‌রের আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং যতদুর পর্যন্ত আওয়াজ পৌঁছে ততদূর পর্যন্ত প্রতিটি বালুকণা ও পাতা ওর ঈমানের সাক্ষী হয়ে যায়।

কিন্তু হক কথা হচ্ছে সবাই আল্লাহর প্রিয় বান্দা। নক্সবন্দীয়াগণের নিম্নস্বরের যিক্‌রও হক এবং অপর তিন সিলসিলার উচ্চস্বরে যিক্‌রও হক। একবার নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শেষ রাতে হযরত ছিদ্দিকে আকবর রাদি আল্লাহু আনহুকে খুবই নিম্নস্বরে তেলাওয়াত করতে দেখলেন এবং হযরত ওমর রাদি আল্লাহু আনহুকে উচ্চস্বরে তেলাওয়াত করতে শুনলেন। সকালে উভয়কে এর কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন হযরত ছিদ্দিকে আকরব আরয করলেন, ইয়া হাবীবুল্লাহ! যাকে শুনানো ছিল, ওনাকে আমি শুনায়েছি এবং হযরত ওমর আরয করলেন, আমি ঘুমন্ত ব্যক্তিদেরকে জাগাচ্ছিলাম, শয়তানকে তাড়াচ্ছিলাম এবং আল্লাহকে শুনাচ্ছিলাম।

এসব আলোচনা হলো যিক্‌রুল্লাহ দ্বারা যখন আল্লাহকে স্মরণ করা বা স্মরণ রাখা অর্থ করা হয় কিন্তু যখন আয়াতের এ অর্থ করা হয় যে তোমরা আমার সম্মান কর, আমি তোমাদেরকে সম্মান দেব, তখন আলোচনা অন্য রকম হবে।

কেননা সোজাসুজি আল্লাহ্‌র তাজীম আমাদের দ্বারা হতে পারে না। কাউকে তাজীম করার নিয়ম হচ্ছে ওর আগমনে দাঁড়িয়ে যাও, ওর হাত পায় চুমু দাও, ওকে নত হয়ে সালাম কর, ইত্যাদি ইত্যাদি। এ তাজীম আল্লাহ্‌র সাথে কিভাবে হতে পারে। সুতরাং আল্লাহ্‌র তাজীমের একমাত্র এ উপায়টা আছে যে তাঁর

নবীগণ, ওলীগণ, তাঁর মসজিদসমূহ, তাঁর কুরআন শরীফ, তাঁর মাহে রমযান মোট কথা ও সব জিনিষের তাজীম করা, যেটার সাথে আল্লাহ্‌র সম্পর্ক আছে। এ ধরনের ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তাআলা দীন দুনিয়া উভয় জাহানে ইজ্জত দান করেন।

ওলামায়ে কিরাম বলেন, এ সবের তাজীম ঈমানের অংগ এবং অবমাননা করা প্রথম শ্রেণীর কুফরী, যার ফলে অন্তরে এমন মোহর লেগে যায় যে ওখানে ঈমান পৌঁছতে পারে না। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি কাহিনী শুনুনঃ

কাহিনীঃ হযরত শিবলী রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি প্রথমে ভীষণ পাপ পংকিলতায় নিমজ্জিত ছিলেন। এমনকি সব সময় মদের মধ্যে ডুবে থাকতেন এবং নেশায় বিভোর থাকতেন। একবার কোথায় যাবার সময় কাদামাটিতে পড়ে থাকা একটি কাগজের টুকরা তাঁর চোখে পড়লো, তখন তিনি উঠায়ে দেখলেন যে সেটার মধ্যে আল্লাহ্‌র নাম লিখা আছে। তা দেখে তিনি কেঁপে উঠলেন, ওটাকে পরিষ্কার করলেন এবং খুবই কান্নাকাটি করলেন। অতঃপর সেই টুকরাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে কাগজের টুকরা! এটা তোমার শান মুতাবিক জায়গা নয়, বরং এটা আমার উপযুক্ত। এর পর খুবই সম্মানের সাথে সেই কাগজের টুকরাকে একান্ত নিরাপদ জায়গায় রাখলেন। আল্লাহ্‌র দরবারে এ সম্মান মকবুল হয়ে গেল, তওবার তওফিক হলো, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আস্তানা পর্যন্ত পৌঁছার সৌভাগ্য হলো এবং কামেল ওলীগণের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেলেন।

ازیں مے قطرۂ پاکاں چشیدند ÷ جنید وشبلی وعطار شدمست
ازیں مے قطرۂ نوشید منصور ÷ اناحق می زدوبر دار شدمست
نہ تنہا من دریں میخانہ مستم ÷ ازیں مے ہمچومن بسیار شدمست

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র প্রেমের শবার হযরত জুনাইদ, শিবলী ও আত্তারের মত অনেক বুজুর্গানে কিরাম পান করেছেন, এমন কি হযরত মনছুর হাল্লাজ রহমতুল্লাহি আলাইহি এ প্রেমের সূধা থেকে এক ফোঁটা পান করে খোদা প্রেমে বিভোর হয়ে আনাল হক (আমি খোদা) দাবী করে শূলে চড়েছেন। এ পথে আমি একা মাতাল নই বরং আমার মত অনেক আছে।

কাহিনীঃ হযরত জুনাইদ বাগদাদী রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি হলেন শীর্ষ স্থানীয় ওলী ও পূণ্যাত্মা মনীষী। এমন কি হুযূর গাউছে পাকের সিলসিলার মুর্শেদগণের বিশিষ্ট একজন। তিনি প্রথমে বাগদাদের খলীফার নামকরা পলোয়ান ছিলেন। একবার বাদশা ঘোষণা দিয়ে ছিলেন যে, যে আমাদের জুনাইদকে পরাভূত করতে পারবে, আমরা ওকে ওর চাহিদা মত ও পছন্দ মত পুরস্কার

দেব। কিন্তু কোন পলোয়ান ওনার মুকাবিলায় আসতে সাহস করেনি। এক সৈয়দ সাহেব, যিনি খুবই পেরেশানী অবস্থায় ও অভাব অনটনে ছিলেন, ওনার স্ত্রীকে বললেন যে আমি জুনাইদের সাথে কুস্তি লড়বো। যদি জিতে যাই, তাহলে ধনী হয়ে যাবো আর যদি হেরে যাই, আমার কিবা ক্ষতি হবে। বিবি সাহেবা হেসে বললেন, আপনি এটা কি কথা বলছেন, না আপনার শরীরে জোর আছে, না হাতে শক্তি, না আপনি কুস্তির নিয়ম কানুন জানেন, না আপনি কুস্তির কলাকৌশল সম্পর্কে অবহিত। সৈয়দ সাহেব বললেন, তা আমি জানি। তবে এমন এক প্যাঁচ আমার জানা আছে, সেটা দিয়ে যদি কাজ হয়, তাহলে জুনাইদকে সহজে পরাজিত করতে পারবো। শেষ পর্যন্ত সৈয়দ সাহেব বাদশার দরবারে পৌঁছে গেলেন এবং তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করালেন। বাদশা তাঁর রোগা চেহারা, দুর্বল শরীর ও কমজোর হাত পা দেখে আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে গেলেন, এবং বললেন আপনার যদি কুস্তি লড়তে আগ্রহ হয়, তাহলে আমাদের অন্য কোন কুস্তিগীরের সাথে লড়ুন। আপনি জুনাইদের শক্তি সম্পর্কে জানেন না।

সৈয়দ সাহেব বললেন, বাদশা মহোদয়, আপনি আমার হালকা পাতলা শরীরকে দেখবেন না, ইনশাআল্লাহ্ আমি নিপূণ কৌশলে লড়বো। তা শুনে বাদশা রাজি হয়ে গেলেন এবং সমগ্র এলাকায় এ কুস্তির কথা ঘোষণা করে দিলেন। দূর দরাজ থেকে অনেক লোক এ কুস্তি দেখার জন্য সমবেত হলো। এক বড় প্রশস্থ ময়দানে এ কুস্তির আয়োজন করা হলো। আমীর–উজীরগণ এমনকি স্বয়ং বাদশাহ এ ভয়াবহ কুস্তি দেখার জন্য মাঠে তশরীফ নিলেন। নির্দিষ্ট সময়ে জুনাইদ পাগলা হাতীর মত হেলিয়ে দুলিয়ে কোমর বেঁধে কুস্তি ক্ষেত্রে গেলেন। এ দিকে সৈয়দ সাহেবও যিনি কয়েক দিনের ভূখা ছিলেন, ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে কোন মতে জুনাইদের সামনে গেলেন। সৈয়দ সাহেব এটাও জানতেন না যে কুস্তি কিভাবে শুরু করতে হয়। জুনাইদ নিয়ম মাফিক হাত মিলালেন, অন্য হাতে গরদান ধরলেন এবং মাথার সাথে মাথা লাগালেন। তখন সৈয়দ সাহেব চুপে চুপে ওর কানে বললেন আমি পলোয়ান নই, আমি সৈয়দ এবং ভূখা। এটা শুনা মাত্র জুনাইদের হাত–পা শিথিল হয়ে গেল, সমস্ত শরীর ঝিম ঝিম করে উঠলো, নামে মাত্র সামান্য জোর দেখিয়ে চিৎ হয়ে পড়ে গেল এবং সৈয়দ সাহেবকে বুকের উপর নিয়ে নিলেন। চারিদিক থেকে চিৎকার উঠলো–ফেলে দিল, ফেলে দিল! বাদশা বললেন, আমাদের জুনাইদ হয়তো কোন ধোকায় পতিত হয়েছে। কুস্তি পুনরায় হলো, পুনরায় উভয়ে সামনা সামনি দাঁড়ালেন এবং একের মাথা অপরের মাথার সাথে লাগা মাত্রই সৈয়দ সাহেব পুনরায় সেই কথা বললেন, 'জুনাইদ, একজন সৈয়দের

অভাবের কথা স্মরণ রাখিও'। জুনাইদ পুনরায় আগের বারের মত মিছামিছি জোর দেখায়ে চিৎ হয়ে পড়ে গেলেন। বাদশা সৈয়দ সাহেবকে পুরষ্কার ও সম্মান দ্বারা তুষ্ট করলেন। ওদিকে জুনাইদের সাথী ও শাগরীদগণ খুবই মর্মাহত হলো। সবাই জুনাইদকে ঘিরে ধরলো এবং জিজ্ঞাসা করলো, আজ তোমার এমন অবস্থা হল কেন? তুমি প্রতিদ্বন্দ্বীকে শিথিল ভাবে কেন ধরলে, তুমি অমুক প্যাঁচ কেন দিলে না?

জুনাইদ কেঁদে দিল এবং বললো আমি সীমার নই, ইয়াজীদ নই বা ওমর বিন সাদ নই যে সৈয়দের বুকের উপর বসতে পারি বা ওনাকে প্যাঁচ দিতে পারি। আমি ওনার ঘরের রুটি নিমক খেয়েছি।

রাত্রে শুইলেন, চোখ বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে নছীব খুলে গেল। দেখলেন, দরবারে মুহাম্মদী সরগরম। লাখ লাখ লোকের সমাবেশ। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছিলেন, আমাদের পলোয়ান জুনাইদ কই? জুনাইদ দৌড়ে গিয়ে কদম মুবারক জড়িয়ে ধরলেন, হাতের তালু দ্বারা চোখ কচলাতে লাগলেন। নবীজী ইরশাদ ফরমালেন, জুনাইদ, তুমি আমার বংশের ইজ্জত রাখলে, আল্লাহ তাআলা তোমাকে উভয় জাহানে ইজ্জত দিবেন। তোমাকে আজ ওলীগণের সরদার মনোনিত করা হলো। এটাই হচ্ছে– فَاذْكُرُوْنِىْ اَذْكُرْكُمْ - এর বাস্তব রূপ অর্থাৎ তোমারা আমার তাজীম কর, আমি তোমাদেরকে ইজ্জত দেব।

কাহিনীঃ এক ইহুদীকে ওর মৃত্যুর পর কোন একজন স্বপ্নে দেখলেন যে বেহেশতের বাগানে সে ঘুরাফেরা করছে। জিজ্ঞাসা করলেন, জান্নাততো কাফিরদের জন্য হারাম, তুমি এখানে কিভাবে পৌঁছলে? সে বললো, একবার আমার ছেলে রমজান মাসে দিনের বেলায় বাজারে কিছু একটা খাচ্ছিল। আমি ওকে থাপ্পর দিয়েছিলাম এবং বকাবকি করেছিলাম যে, হে বেহায়া, তোমার লজ্জা লাগে না যে মুসলমানদের রমযান শরীফ, সব লোক রোযা রেখেছে আর তুমি ওদের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাচ্ছ। রমযানের প্রতি আমার এ সম্মানবোধ আল্লাহ্ তাআলা কবুল করে নিলেন। ফলে আমার মৃত্যুর সময় কলেমা নছীব হলো, মুসলমান হয়ে মৃত্যুবরণ করলাম এবং আমার সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে গেল

এ পর্যন্ত তো আপনারা ওসব সুভাগ্যবানদের বিবরণ শুনলেন, যারা সম্মান প্রদর্শনের কারণে মনজিলে মকছুদে পৌঁছে গেলেন। এবার ওসব বদনছীরদের অবস্থা জেনে নিন, যাদের একটি মাত্র বেআদবীর কারণে ইবাদত সমূহ ও রিয়াজত সমূহের ভরা জাহাজ মাঝ সমুদ্রে ডুবে গেল। আপনারা জানেন যে, শয়তান কত যুগের আবেদ ও যাহেদ ছিল এবং কোথায় থাকতো। মাত্র একটি সিজদার জন্য এ

সিজদার জন্য এ অধঃপতন হয়ে গেল। তবে শয়তান মরদুদ হওয়ার কারণ শুধু সিজদা না করাটা ছিলনা। তাহলে তো আজ বেনামাযী মুসলমান হাজার হাজার সিজদা বাদ দিচ্ছে কিন্তু মুসলমানই রয়ে যায় এবং সেই হুকুমের অস্বীকার করার কারণেও মরদুদ হয়নি। তাহলে তো আজকাল লাখ লাখ কাফির হাজারো শরীয়তের আহকামের অস্বীকারকারী। কিন্তু কই শয়তানে তো পরিণত হয়না বরং অনেকের ঈমান নছীব হয়। শয়তানের উপর যে কুফর ও বেদীনের মোহর লেগেছে, সেটা হচ্ছে তার সেই উক্তির জন্য خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ (আমাকে তৈরী করেছেন আগুন দ্বারা আর ওকে তৈরী করেছেন মাটি দ্বারা) এ বেআদবীর জন্য ওর কিস্‌তী ডুবায়ে দিলেন। এ জন্যই আল্লাহ্ তাআলা বলেন– فَاذْكُرُوْنِىْٓ اَذْكُرْكُمْ -

বন্ধুগণ, এ আয়াতটা হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলার রহমত সমূহের তরঙ্গায়িত সমুদ্র। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে স্মরণ করবো। তোমরা গুণাহ মাফের প্রার্থনা করে আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে স্মরণ করবো, তোমরা আমাকে দুনিয়াতে স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে আরশে স্মরণ করবো, তোমরা আমাকে জমীনে স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে জমীনের অভ্যন্তরে যাওয়ার পর অর্থাৎ মৃত্যুর পর স্মরণ করবো। তোমরা আমাকে তোমাদের জিন্দেগীতে স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে মৃত্যুর পর স্মরণ করবো এবং সমস্ত সৃষ্টিকুল দ্বারা তোমাদেরকে স্মরণ করাবো। এ আয়াতটি আশেকগণের জান এবং আরিফগণের ঈমান। আমরা যদি জিন্দেগীর এ সংক্ষিপ্ত সময়ে তাঁকে স্মরণ করে লই, তাহলে তিনি আমাদেরকে অনন্তকাল পর্যন্ত স্মরণ করতে থাকবেন।

وَاشْكُرُوْا لِىْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ (আমার শোকর কর, এবং না শোকর কর না) আল্লাহ্ তাআলা যিক্‌বের পর শোকরের নির্দেশ দিলেন। কেননা শোকরও যিক্‌রের মত আল্লাহর স্মরণ বুঝায়। কিন্তু যিক্‌র যেহেতু সব সময় এবং শোকর নিয়ামত প্রাপ্তির ক্ষেত্রে হয়, সেহেতু যিক্‌রের ক্ষেত্র ব্যাপক এবং শোকবের ক্ষেত্র সীমিত। এ জন্য যিক্‌রের হুকুম প্রথমে এবং শোকরের হুকুম পরে দেয়া হয়েছে। শোকরের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে প্রকাশ করা, স্বীকার করা বা যথার্থ কদর করা। যদি আল্লাহ্‌র গুনাবলীর ক্ষেত্রে হয়, তাহলে এর অর্থ যথার্থ কদর করা হবে আর যদি বান্দার গুনাবলীর শোকর হয়, তাহলে এর অর্থ হবে প্রকাশ করা বা শুনানো।

পারিভাষিক অর্থে শোকর মানে কারো নিয়ামত পেয়ে ওর খেদমত, বা তাজীম বা প্রশংসা করা। তা মুখ দ্বারা হোক বা অন্তর দ্বারা বা হাত পা দ্বারা।

আল্লাহ্ তাআলার নিয়ামত আমাদের গণনার বাইরে। স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা ফরমান وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا (আল্লাহ্‌র নিয়ামত সমূহ যদি গণনা করতে চাও, তা গণনা করে শেষ করতে পারবেনা।

گربرتن من زبان شود هر مو + احسان تراشمارنه توانم کرد

অর্থাৎ যদি আমার শরীরের প্রতিটি লোম মুখ হয়, তবুও আপনার ইহ্‌সান গণনা করে শেষ করতে পারবো না। তাই এমন কারো শক্তি নেই, যিনি যথাযতভাবে আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করতে পারে। তবুও আল্লাহ্ নির্দেশ দিচ্ছেন যে আমার শোকর কর। এ জটিল কথাটা বুঝতে মানবিক জ্ঞান–বুদ্ধি অক্ষম ছিল। কারণ যে নিয়ামত সমূহ গণনা করা যায় না, সেসবের শোকরীয়া কিভাবে আদায় করবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঠিক সমাধান দিয়েছেন। তিনি তিনটি হাদীছের মাধ্যমে শোকবের তিনটি স্তর বর্ণনা করেছেন–সার্বিক শোকর, বিশেষ শোকর ও একান্ত বিশেষ শোকর।

সার্বিক শোকর প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরামকে লক্ষ্য করে ইরশাদ ফরমালেন, মানুষের শরীরে ৩৬০টি গিরা আছে। পারলে প্রতি দিন ৩৬০টি সদ্‌কা কর, যেন ওগুলোর শোকরীয়া আদায় হয়ে যায়। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, হে আল্লাহর হাবীব, দৈনিক এত সদ্‌কা কে করতে পারে। ফরমালেন, সদ্‌কা বলতে কেবল আর্থিক দান খয়রাত নয়, আপন মুসলমান ভাই এর সাথে উৎফুল্ল মন নিয়ে সাক্ষাৎ করাটাও সদ্‌কা, মুহাব্বতের সাথে ওর সঙ্গে মুসাফাহা করাটাও সদ্‌কা, এমনকি মুসলমানদের চলাচলের রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলাটাও সদ্‌কা। আরয করলেন, হুযূর, এরপরও দৈনিক ৩৬০টি নেকী কি করে হতে পারে। ফরমালেন, সূর্য উদিত হবার পর ইশরাকের দু'রাকাত নফল নামায পড়ে নিও, ৩৬০ গিরার সদ্‌কা হয়ে যাবে। এ শোকরটা ছিল সার্বিক, যা আল্লাহ্ তাআলা সাধারণ নেকী সমূহকে তাঁর অগণিত নিয়ামত সমূহের শোকরীয়ার মাধ্যম বানিয়ে দিলেন।

বিশেষ শোকরের জন্য সেই হাদীছটা পড়ুন যে হুযূর আনোয়ার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শীতের দীর্ঘ রাত্রি সমূহ নফল নামাযে অতিবাহিত করলেন, শেষ পর্যন্ত পা মুবারকে ফুলা এসেছিল। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র হাবীব! আল্লাহ্ তাআলাতো আপনাকে মাগফিরাত ও জান্নাতের ওয়াদা দিয়েছেন। ইরশাদ ফরমালেন - اَفَلَا اَكُوْنَ عَبْدًا شَكُوْرًا

আমি কি আল্লাহ্‌র শোকরকারী বান্দা হবো না। বুঝা গেল যে দু'একটি নিয়ামতের শুকরীয়ায় সারা রাতব্যাপী ইবাদত করা যায়।

শোকরের তৃতীয় স্তর, যার সম্পর্কে এ হাদীছে ইশারা করা হয়েছে। ফরমায়েছেন, হে আল্লাহ্, আমি আপনার ইবাদত যথাযত করিনি, আমি আপনাকে যথাযত ভাবে চিনতে পারিনি। সুবহানাল্লাহ, সমস্ত সৃষ্টিকূল থেকে অধিক আবেদ ও আরেফ হওয়া সত্বেও তাঁর বিনয়ী ভাব এভাবে প্রকাশ করেন।

বিঃদ্রঃ–সাবধান! কেউ যেন এ হাদীছের ভিত্তিতে এটা না বলে বসে যে (নাউযুবিল্লাহ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যথাযত ভাবে ইবাদত করেননি বা আল্লাহ্কে যথাযত ভাবে চিনতে পারেননি বা যথাযতভাবে আল্লাহ্র শোকর আদায় করেননি। যে এ রকম বলবে, সে কাফির হয়ে যাবে। আমাদেরকে শিখানোর জন্যই হুযূর ফরমান যে, তোমাদের মধ্যে যে যত বড় আবেদ হোক না কেন, স্বীয় ইবাদত ও রিয়াজত সমূহের ব্যাপারে যেন গর্ববোধ না করে। সবসময় যেন নিজেকে অপরাধী মনে করে। তাঁর আবেদন নিবেদন একমাত্র বিনয় ও আনুগত্য প্রকাশের জন্য। যেমন আদম আলাইহিস সালাম আরয করেছেনঃ

رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا – (হে আল্লাহ্, আমি নিজের উপর জুলুম করেছি) বা যেমন ইউনুচ আলাইহিস সালাম আরয করেছেন,

اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ (আমি অপরাধীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেছি) এখন যারা ওনাদেরকে অপরাধী বলবে, ওরা নিজেরা অপরাধী হয়ে যাবে। এটা কিভাবে হতে পারে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্র পূর্ণ আবেদ আরেফ ও শোকরকারী নয়।

আল্লাহ্ তাআলাতো নূহ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেন– اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا (নিশ্চয়ই তিনি শোকরগুজার বান্দা) তাহলে কি আমাদের হুযূর আলাইহিস সালামের মর্যাদা ওনার থেকে কম? যখন নূহ আলাইহিস সালাম বড় শোকরকারী, তাহলে আমাদের হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম বড়দের থেকেও বড় শোকরকারী। মজার ব্যাপার হলো–বান্দা বলে আমি গুনাহগার, আল্লাহ্ বলেন তুমি ফর্মাবরদার (আনুগত্যকারী)। হযরত ছিদ্দিক আকবর রাদি আল্লাহ্ আনহু বলতেনঃ

كَيْفَ حَالِىْ يَا اِلٰهِى لَيْسَ لِىْ خَيْرُ عَمَلٍ

سُوْءُ اَعْمَالِىْ كَثِيْرٌ اَوْطَاعَتِىْ قَلِيْلٌ

অর্থাৎ হে খোদা, আমার কি অবস্থা হবে, আমার কাছে তো কোন নেকী নেই। মন্দ আমল খুব বেশী কিন্তু ইবাদত খুব কম।

আল্লাহ্ তাআলা এ সম্পর্কে বলেনঃ وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى الَّذِىْ يُؤْتِىْ مَالَهٗ

(উহা হতে পরম মুত্তাকীকে অনেক দূরে রাখা হবে, যে স্বীয় সম্পদ দান করে আত্মশুদ্ধির জন্য)।

এতে কি লাভ যে বান্দা বলে আমি ফর্মাবরদার আর আল্লাহ্ বলেন তুমি বদকার। মোট কথা হলো উল্লেখিত তিনটি হাদীছে শোকরের তিনটি স্তর বর্ণিত হয়েছে। এর ভিত্তিতে ওলামায়ে কিরাম বলেন সে সার্বিক শোকর হচ্ছে বান্দা আল্লাহ্র নিয়ামত সমূহকে যেন গুনাহের কাজে ব্যয় না করে। বিশেষ শোকর হচ্ছে বান্দা আল্লাহ্র নিয়ামত সমূহকে যেন অনর্থক ও বেহুদা কথা সমূহ দ্বারা বিনষ্ট না করে এবং একান্ত বিশেষ শোকর হচ্ছে বান্দা আল্লাহ্র নিয়ামত সমূহকে যেন তারই ইবাদত সমূহে ব্যয় করে, কোন মুহূর্তও যেন তাঁর শোকর গুজার থেকে খালি না থাকে। ছুফিয়ানে কিরাম বলেন যে, শোকরের সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে আল্লাহ্র প্রতিটি নিয়ামত থেকে আল্লাহ্র অংশ বের করে নেয়া এবং এর সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছেঃ دل تیرا جان تیری عاشق شیداتیرا

سب توتیراھی ھے پھر کس لے میرا تیرا

অর্থাৎ ভাগাভাগির প্রয়োজন নেই, আল্লাহ্র প্রতিটি নিয়ামত সব সময় তারই জন্য যেন খরচ করা হয়। এবার পড়ুন – وَاشْكُرُوْا لِىْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ

স্মরণ রাখবেন, শোকরের ভিত্তি দু'টি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল–একটি হচ্ছে পার্থিব বিষয়সমূহে সব সময় নিজের থেকে নিম্নস্তরকে দেখবেন এবং দীনের কাজ সমূহের বেলায় সবসময় নিজের থেকে উপরের স্তরের দিকে নযর রাখবেন। ইন্শাআল্লাহ্ কখনো নাশোকরকারী হবেন না এবং কোন সময় স্বীয় কাজের উপর গর্ববোধকারী হবেন না।

কাহিনীঃ শেখ সাদী বলেন, একবার দ্বিপ্রহরের সময় খুবই গরম পড়ছিল। আমার পায়ে জুতা ছিল না, ফলে পা জ্বলে যাচ্ছিল। আমি জুতা ওয়ালা ও সওয়ারীদেরকে দেখে কাঁদছিলাম যে এসব লোক বাহনের উপর সওয়ার হয়ে যাচ্ছে আর আমার কাছে জুতাও নেই। রাস্তায় এমন এক ব্যক্তিকে দেখলাম যার পাও নেই। সেই ভীষণ গরমে মাটির উপর দিয়ে পাছায় হেঁচরাতে হেঁচরাতে আসতেছে। আমি সিজদায় পতিত হলাম এবং বল্লাম, হে খোদা আপনার আমারতো পা আছে। মানুষের এটা সব সময় স্মরণ রাখা উচিৎ যে আমি কি ছিলাম এবং আল্লাহ্ আমাকে কি বানিয়ে দিলেন।

কাহিনীঃ হযরত আয়ায সুলতান মাহমুদের খুবই প্রিয় গোলাম ছিলেন, যার জন্য সুলতানের জান কুরবান ছিল। এ ধরনের লোকের হিংসাকারী অনেক হয়ে

থাকে, যারা সব সময় এ সব লোকের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগে থাকে। আয়াযের নিয়ম ছিল যে প্রতিদিন কিছুক্ষনের জন্য সরকারী মুতী মহলে ঢুকে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে বসে থাকতেন।

হিংসাকারীরা সুলতানকে গিয়ে খবর দিল যে হুযূর, আয়ায সম্ভবতঃ চোর, সে কোষাগার থেকে খুবই মূল্যবান কিছু একটা চুরি করেছে, সেটা সামলানোর জন্য সে প্রতিদিন মুতী খানার দরজা বন্ধ করে কিছু একটি করে। সুলতান বললেন ঠিক আছে, আয়ায যখনই সেখানে ঢুকে, আমাকে খবর দিও। সে মতে পর দিনই খবরদাতারা সুলতানকে খবর দিল, হুযূর, ঘটনাস্থলে আপনি স্বয়ং চলুন, আয়ায ভিতরে আছে।

সুলতান স্বয়ং মুতী খানার দরজার সামনে গেলেন এবং ডাক দিলেন–আয়ায! জবাব আসলো–হুযূর। সুলতান হুকুম দিলেন, দরজা খোল। আয়ায বললো–ঠিক আছে, খোলছি কিন্তু দরজা খোললো না। লোকেরা বলাবলি করতে লাগলো, এত তাড়াতাড়ি কিভাবে খোলবে, চোরা মাল সামলিয়েইতো খোলবে। সুলতান পুনরায় ডাক দিলেন, দরজা খোল। জবাব দিল, এক্ষুণি খোলছি। তৃতীয় বার সুলতান ধমক দিলে বল্‌লেন, এক্ষুণি খোল, অন্যথায় শাস্তি পাবে। কপাট খুললো। সুলতান অন্যান্য লোকগণসহ ভিতরে প্রবেশ করলেন। বড় তালা লাগানো একটি মজবুত সিন্দুক ব্যতীত আপত্তিকর অন্য কোন কিছু দৃষ্টিগোচর হলো না। সকলের আঙ্গুল সেই সিন্দুকের দিকে ইশারা করলো যে, যা কিছু আছে, তা সেই সিন্দুকে আছে।

সুলতান জিজ্ঞাসা করলেন, আয়ায এতে কি আছে? আয়ায হাত জোড় করে বললো, হুযূর এতে আমার কলঙ্ক, অনুগ্রহ করে তা গোপন করতে দিন।

پردہ رہنے دو کہ اس پردے میں رُسوائی ہے

আয়াযের একথা দ্বারা লোকদের সন্দেহ আরও বৃদ্ধি ফেল।

সুলতান হুকুম দিলেন, অবশ্যই খোলতে হবে। শেষ পর্যন্ত একান্ত অপারগ হয়ে খোলা হলো। দর্শকগণ দেখলো, সেটাতে মাত্র তিনটি ময়লা কাপড় আছে–একটি ছেঁড়া টুপি, যার কেশ উঠে গিয়েছিল, একটি জামা, যার কলার ছেঁড়া, একটি লুঙ্গি যার মধ্যে ত্রিশ–চল্লিশটা তালি ছিল এবং ছেঁড়াও। সুলতান জিজ্ঞাসা করলেন, আয়ায, এ গুলো কি?

আয়ায কেঁদে দিলেন এবং বললেন, যে দিন আমি হুযুবের কেনা গোলাম হিসেবে এসেছিলাম, সেই দিন আমার শরীরে এ কাপড়গুলো ছিল। হুযূরের মেহেরবানীতে উন্নত পোষাক সমূহ পরিধান করতেছি। ভয় ছিল যে আমার মধ্যে যদি অহংকার এসে যায়। এ জন্য আমি প্রতিদিন আধ ঘন্টায় জন্য এ কাপড়

পরিধান করি এবং নিজের নফসকে বলি, হে নফস, বাদশার পোষাক পরে এবং শাহী নিয়ামত সমূহের মধ্যে রয়ে স্বীয় আসলকে ভুলে যেও না, যেন তুমি শোকরকারী বান্দা হিসেবে গণ্য হও। এটা শুনে সুলতানের মধ্যে ভাবাবেগের সৃষ্টি হলো এবং বলে উঠলেন, হে আয়ায, তুমি স্বীয় আসলকে ভুলনি কিন্তু আমি ভুলে গেছি। মায়ের পেট থেকে উলঙ্গ এসেছিলাম, দুর্বল শক্তিহীন জন্ম হয়েছিলাম। আল্লাহ্ তাআলা উত্তম পোষাক দান করেছেন, শক্তি ও ক্ষমতা দিয়েছেন। দেশের পরিচালক বানিছেন। কিন্তু আমি এর স্মরণ থেকে গাফেল হয়ে গেছি।

تم شوق سے کالج میں پھلو پارک میں پھولو
جائز ہے جہازوں میں اڑو چرخ پہ جھولو
پر ایک سخن بندۂ مسکیں کا رکھو یاد
اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو!

অর্থাৎ বৈধ উপায়ে যা খুশী তা করুন। কিন্তু আল্লাহ্ ও স্বীয় আসলকে ভুল না।

وَاشْكُرُوْا لِيْ এর অর্থ এটাও হতে পারে যে আমার শোকর কর বা আমার জন্য শোকর কর। প্রথম অর্থের অভিপ্রায় এটা হবে যে তোমাদের উপর কেউ ইহ্‌সান করলে বা কেউ মেহেরবাণী করলে, আমার শোকর আদায় কর। কারণ আসল মেহেরবাণীকারী হলাম আমি। যখন আমি মেহেরবাণীটা ওর অন্তরে রেখেছি, তখন সে তোমার প্রতি মেহেরবাণী করেছে। রূপকভাবে সৃষ্টির শোকরও আদায় কর এবং মূলতঃ শোকর আমার কর।

দ্বিতীয় অর্থের অভিপ্রায় এটা হবে যে, কেবল নিয়ামত সমূহের আধিক্যের জন্য শোকর কর না বরং আমার জন্য এবং আমাকে রাজি করার জন্য শোকর কর। আল্লাহ্ তাআলা ফরমায়েছেন, যদি তোমরা শোকর কর, তাহলে আমি তোমাদেরকে অধিক নিয়ামত দান করব।

সন্দেহ ছিল যে কেউ এ আয়াত দ্বারা ধোকা খেয়ে কেবল ব্যবসা ও কারবারের উপর ভরসা করে এ জন্য শোকর করে যেন সম্পদ বৃদ্ধি পায়। খরবদার! কখনো এ রকম কর না। কেবল আমাকে রাজি কর। যদি আমি রাজি হয়ে যাই, তাহলে সবকিছু তোমারই।

ওলামায়ে কিরাম বলেন, যদিওবা কতেক নামায, দুআ ও অজীফা দ্বারা মুশ্‌কিল সমূহ আসান হয়ে যায়, বিপদসমূহ দূরীভূত হয়, নিয়ামত সমূহ অর্জিত হয়, কিন্তু ও সমস্ত আমল সমূহ যেন সেই উদ্দেশ্যে না করে। কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য করে এবং আশা রাখে যে সম্ভবতঃ তিনি রাজি হয়ে ও সন্তুষ্ট হয়ে বিপদসমূহ দূরীভূত করবেন। দুনিয়াতে তোমরা মা–বাপ উস্তাদ–পীর এবং এ

রকম অন্যান্য সাহায্যকারী লোকদের শোকরীয়া আদায় কর। কিন্তু এ জন্য যে এটা আমার নির্দেশ। তখন তোমাদের এ সমস্ত শোকরীয়া ইবাদতে পরিণত হবে, যার ছওয়াব তোমরা দুনিয়া ও আখেরাতে পাবে। শরয়ী মাসআলা হলো, দুনিয়াবী সুনামের জন্য মা–বাপের খেদমত এবং কেবল আন্তরিক টানে স্বীয় সন্তান ও পরিবার পরিজনের প্রতি মহববত ছওয়াবের সহায়ক নয়। এ রকম তো কাফিরগণ বরং পশুরাও করে থাকে। এ খেদমত ও মহববতের ছওয়াব তখনই পাবে, যদি এ মনোভাব নিয়ে করে যে এটা রসুলের সুন্নাত ও আল্লাহ্‌র নির্দেশ।

কাহিনীঃ এক যুদ্ধে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলাহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং শরীক ছিলেন। যুদ্ধে মুসলমানদের জয় হয় এবং কাফিরদের অনেক পুরুষ ও মহিলা গ্রেপ্তার হয়। কয়েদীদের মধ্যে এক মহিলা কোন এক গাজীকে জিজ্ঞাসা করলো, আপনাদের বাহিনীর পরিচালনা কে করছেন? তিনি বললেন, স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। সে বললো, আমাকে ওনার কাছে নিয়ে চলুন। গাজী বললেন, কি বলার আমাকে বলুন, আপনার পয়গাম আমি পৌঁছিয়ে দিব। সে বললো, তা হয় না, আমার আরজু হলো, সোজা তাঁর কাছে গিয়ে নিজের দুঃখের কাহিনী শুনাবো।

یہ بندہ ہو وہ آقا ہوں یہ منگتا ہو وہ داتا ہوں

ہون میرے ہاتھ پھیلے جوش میں ہو رحمت باری

অর্থাৎ আমি গোলাম, তিনি মুনিব, আমি প্রার্থনাকারী তিনি প্রদানকারী, আমার হাত যখন প্রসারিত করবো, তখন তিনি জোশে এসে রহমতের বারিধারা বর্ষন করবেন।

বারবার অনুরোধ করার ফলে সেই গাজী সেই মহিলাকে অন্যান্য কয়েদী মহিলাদেরকেসহ নিয়ে হুযূরের বারগাহে উপস্থিত হলেন। সেই মহিলাটি একটু সামনে এগিয়ে গিয়ে আরয করলো, ইয়া রাসুলল্লাহ! আপনি আমাকে চিনতে পারছেন? ফরমালেন, তুমিই পরিচয় দাও। সে বললো, আমি হালিমা দাই এর দুগ্ধ কন্যা। যে স্তন, আপনি চোষেছেন, সেটা আমিও চোষেছি। এটা শুনা মাত্র হুযূর আনোয়ার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে দারুন ভাবাবেগের সৃষ্টি হলো, এবং উপস্থিত সবাই হতবাক হয়ে গেল। ফরমালেন, ওরা সবাইকে মুক্তি দাও এবং ওদের প্রত্যেককে এই এই পরিমাণ যবও দিয়ে দাও। ওরা সবাই বললেন, এখানেতো মুক্তি দিলেন, দোযখের আগুন থেকেও মুক্ত করে দিন। আমরা সবাই লা ইল্লাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রসুলুল্লাহ পড়ে ঈমান আন্‌লাম।

এ কাহিনীটা অনুসরণ করে আপন ভাইবোনের মধ্যে সুসম্পর্ক কায়েম করুন।

কাহিনীঃ এক বার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন এক সমাবেশে তশরীফ রাখলেন, মনে হচ্ছিল যেন তারকারাজির মাঝখানে চৌদ্দ তারিখের চাঁদ। হঠাৎ এক চাদর আবৃতা মহিলা আসলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওনার সম্মানে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং স্বীয় চাদর মুবারক ওনাকে বসার জন্য বিছায়ে দিলেন। সাহাবায়ে কিরাম আশ্চর্য হয়ে গেলেন যে এ কোন সৌভাগ্যবান মহিলা যে যুগের রাজা বাদশারা যার আস্তানা শরীফের মাটি লেহন করে ধন্য হয়, হযরত জিব্রাইল আলাইহিস সালাম কদমবুচি করাকে নিজের জন্য গর্বের বিষয় মনে করেন কিন্তু ওনাদের জন্য কখনো চাদর বিছায়ে দেননি! যতক্ষণ পর্যন্ত ভদ্রমহিলা অবস্থান করেছিলেন, হুযূর অন্য কারো সাথে কথা বলেননি। উনি যখন চলে যাচ্ছিলেন, হুযূর আলাইহিস সালাম অনেক দূর পর্যন্ত ওনাকে পৌঁছিয়ে দিতে গেলেন। ফিরে আসার পর কোন একজন জানতে চাইলেন, হুযূর, উনি কে? ফরমালেন, তোমরা চিনতে পারনি? উনি হলেন আমার মা হালিমা, যার কোলে আমি লালিত পালিত হয়েছি এবং যার দুধ আমি পান করেছি। সুবহানাল্লাহ! এটাতো সেই মার শোকরীয়া আদায় করলেন, যার কেবল দুধ পান করেছিলেন। ভেবে দেখুন, যদি আজ হযরত আমেনা খাতুন বেঁচে থাকতেন, যিনি নয় মাস স্বীয় গর্ভে ধারণ করেছিলেন, তাহলে ওনার তাজীম ও খেদমত কী পরিমাণ করা হতো।

وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ (আমার শোকর কর এবং নাশোকরী কর না) লক্ষ্য করার বিষয় যে যখন কুফর ঈমানের বিপরীত ব্যবহার হয়, তখন এর অর্থ হয় বেদীনি কিন্তু যখন কুফর শোকরের বিপরীত আসে, তখন এর অর্থ হয় নাশোকরী। এখানে কুফর শব্দটা শোকরের বিপরীত ব্যবহৃত হওয়ায় এর দ্বারা নাশোকরী বুঝানো হয়েছে। তাই আয়াতাংশের অর্থ হচ্ছে, আমার শোকর কর, নাশোকরী কখনো কর না। যে রকম বিভিন্ন শোকরের প্রকারভেদ বর্ণনা করা হয়েছে, ও রকম নাশোকরীরও বিভিন্ন প্রকারভেদ রয়েছে। এ গুলো থেকে বিরত থাকুন। আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁর হাবীবের উসীলায় আমরা সবাইকে এ আয়াতের সঠিক অর্থ অনুসারে আমল করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَسَلَّمْ -

বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রহীম

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ○

তরজুমাঃ হে ঈমানদারগণ! সবর ও নামায দ্বারা সাহায্য লাভ কর।

যোগসূত্রঃ আগের আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা মুসলমানদেরকে যিক্‌র ও শোকবের নির্দেশ দিয়েছেন। এর দ্বারা ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ ছিল যে, দুনিয়াতে সব সময় আল্লাহ্‌র নিয়ামতই আসবে এবং জিন্দেগীটা ওগুলোর শোকর গুজারীতে অতিবাহিত হবে। কেননা শোকর নিয়ামতের উপর হয়ে থাকে। এ ভুল বুঝাবুঝির অবসানের জন্য এ আয়াতে সবরের নির্দেশ দেয়া হলো। যাতে বুঝা যায় যে দুনিয়াতে মাঝে মধ্যে বিভিন্ন পরীক্ষা ও কষ্টের সম্মুখীন হতে হবে, তখন তোমাদেরকে সবর করতে হবে। আমার বারগাহে শোকরকারী ও সবরকারী হয়ে এসো। দুনিয়ার রাস্তা যদি সামান্য হয়, তাহলে পায়ে হেঁটে অতিক্রম করা হয়, যদি কিছু দীর্ঘ হয়, তাহলে রিক্সা বা ঘোড়ার গাড়ী করে, যদি বেশ কিছু দীর্ঘ হয়, তাহলে প্যাসেঞ্জার ট্রেন যোগে, যদি এর থেকে আরও বেশী দীর্ঘ হয়, তাহলে মেইল ট্রেন যোগে এবং অনেক দূর হলে, বিমান যোগে অতিক্রম করা হয়। এ রকম দীনের কতেক রাস্তা কেবল ঈমান দ্বারা, কতেক নামায–রোযা দ্বারা এবং কতেক হজ্ব ও যাকাত দ্বারা অতিক্রম হয়ে যায়। নৈকট্য লাভের পথ সবর ও শোকবের দু'ডানা দ্বারাই অতিক্রম করা হয়। আগের আয়াতে এক ডানা অর্থাৎ শোকরের বর্ণনা ছিল। এ আয়াতে অপর ডানা সবরের বর্ণনা রয়েছে। অধিকন্তু আগের আয়াতে যিক্‌র ও শোকরের নির্দেশ ছিল এবং এ আয়াতে নামাযের নির্দেশ রয়েছে। কেননা বেনামাযীর না কোন যিক্‌র কবুল হয়, না শোকর, না কোন আমল, না অজীফা।

ওলামায়ে কিরাম বলেন, ফরয তরককারীর নফল সমূহ কবুল হয় না। যুক্তিও তাই বলে। সেই শ্রমিক বা কর্মচারী ওভার টাইমের হক্‌দার, যে মূল ডিউটি আদায় করে। যে মূল ডিউটি করে না, সে ওভার টাইমের হকদার নয়। ফরয ইবাদতসমূহ হচ্ছে আমাদের মূল ডিউটি এবং নফল হচ্ছে ওভারটাইম। এ জন্য ইরশাদ করা হয়েছে যে সমস্ত যিক্‌র ও শোকর সমূহের বেলায় যেন ফরয নামায দ্বারা সাহায্য গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ ফরয নামাযের মাধ্যমে এ গুলোকে যেন গ্রহণযোগ্য করা হয়।

তাফসীরঃ আল্লাহ্ তাআলা সবর ও নামাযের হুকুমের প্রারম্ভে মুসলমানদেরকে يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا (হে ঈমানদারগণ) বলে সম্বোধন করেছেন। এর পিছনে দু'টি কারণ রয়েছে–একটি হলো, হুকুম দু'টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং নফ্‌সের জন্য ভারী ছিল। তা ছাড়া সবর ও নামাযের পাবন্দী কোন মামুলী ব্যাপার নয়। এ জন্য প্রিয় সম্বোধন দ্বারা প্রথমে ওনাদের সাহস যুগিয়েছেন। অতঃপর হুকুম দেয়া হয়েছে, অর্থাৎ হে ওই সকল লোকগণ, যারা ঈমান এনে আপন জানমাল সবকিছু আমার জান্নাতের বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছ, ভয় করো না, সবর ও নামাযের আঁচল মজবুত হাত থেকে ছেড়ে দিওনা। অপরটি হলো, ঈমান ব্যতীত কোন শারীরিক বা আর্থিক ইবাদত কবুল হয় না, কেননা ঈমান হচ্ছে মুল এবং অন্যান্য ইবাদতগুলো হচ্ছে এর শাখা প্রশাখা সদৃশ। ঈমান হচ্ছে অযু এবং অন্যান্য ইবাদতগুলো হচ্ছে নামায সদৃশ। এ জন্য কাফিরকে প্রথমে মুসলমান করা হয়, অতঃপর নামাযের হুকুম দেয়া হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাবুয়াতের ঘোষণা দেয়ার সাথে সাথে ইবাদতসমূহের হুকুম দেননি, এগার বছর পর্যন্ত কেবল ঈমানের দাওয়াত দিয়েছেন। এগার বছর পর মেরাজে নামায ফরয হয়। এ জন্য আল্লাহ্ তাআলা اٰمَنُوْا শব্দটা অতীত–কাল জ্ঞাপক বলেছেন এবং সবর ও নামায নির্দেশাত্মক শব্দদ্বারা ইরশাদ করেছেন। অর্থাৎ হে লোকগণ! যারা ঈমান এনেছ, নামায ও সবরকে দৃঢ়ভাবে ধর।

এখানে اٰمَنُوْا বলার মধ্যে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে–একটা হচ্ছে, আল্লাহ্‌র সমস্ত নিয়ামতের মধ্যে বড় নিয়ামত হচ্ছে ঈমান। রাজত্ব, মন্ত্রীত্ব, ধন–সম্পদ ঈমানের তুলনায় খুবই নগন্য। দেখুন এখানে আল্লাহ্ তাআলা বলেননি–হে বাদশা, হে চৌধুরীগণ! বা হে আমীর ওমরাগণ! বরং সবাইকে একটা প্রিয় সম্বোধন দ্বারা আহবান করেছেন–হে ঈমানদারগণ!

দ্বিতীয়টা হচ্ছে, আল্লাহ্ তাআলা ঈমানের কথা উল্লেখ করেছেন, তাওহীদের কথা উল্লেখ করেননি। এ রকম বলে সম্বোধন করেননি–হে তাওহীদী জনতা বা হে আমাকে মান্যকারীগণ। কেননা যে জিনিষ দ্বারা সমস্ত নিয়ামতের দরজা খোলা যায় এবং যেটার উপর নাজাত নির্ভরশীল, সেটা হচ্ছে ঈমান, কেবল তাওহীদ নয়। মানুষ মুমিন হওয়া মাত্রই নামায রোযার উপযুক্ত হয়ে গেল, তিলাওয়াতে কুরআনের হকদার হয়ে গেল এবং ঈমান সহকারে মারা যাওয়ার সাথে সাথে জান্নাতের অধিকারী হয়ে গেল। এ জন্য আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক জায়গায় মোমেনকে সম্বোধন করেছেন। যদি কেবল আকীদায়ে তাওহীদ যথার্থ হতো,

তাহলে সবচে বড় নাজাত লাভকারী হতো শয়তান। কেননা সে বড় তাওহীদবাদী ছিল।

আল্লাহ্‌র সত্ত্বা ও গুনাবলীকে স্বীকার করার নাম তাওহীদ এবং এর সাথে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লামের সত্ত্বা ও গুণাবলীকে স্বীকার করাই ঈমান। অর্থাৎ নবীকে আল্লাহ্‌র সাথে সংযোগ করা ঈমান এবং পৃথক করা কুফর। আল্লাহ্ তাআলা ফরমানঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ –الخ – اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا –

(যারা আল্লাহ্ ও রসূলগণকে মাণ্য করে না এবং আল্লাহ্ থেকে তাঁর রসূলগণকে আলাদা করতে চায়..... এরাই প্রকৃত কাফির।)

এ জন্যই কেবল لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ পড়া হয়না বরং এর সাথ সংযুক্ত করা হয়– مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ নাজাতের উপায় শুধু তাওহীদ নয় বরং ঈমান। আসমানী দীন অনেক এসেছে এবং কিছুদিন বলবৎ থাকার পর রহিত হয়ে গেছে। ওসব দীনের বিভিন্নতা এবং রহিত হওয়াটা তাওহীদের ভিত্তিতে ছিল না বরং নাবুয়াতের ভিত্তিতে ছিল। তাওহীদ কোন সময় রহিত হয়নি। বরং নাবুয়াতই রহিত হয়েছে। তাই বুঝা গেল, দীন তাওহীদ দ্বারা পরিবর্তন হয় না বরং নাবুয়াত দ্বারাই পরিবর্তন হয়। কবরেও নাবুয়াতের প্রশ্নের জবাবের উপর কামিয়াবী নির্ভর, তাওহীদের জবাবের উপর নয়। এ সব কারণে আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْ 'হে ঈমানদারগণ'! বলে সম্বোধন করেছেন।

ঈমান তিন ধরনের হয়ে থাকে। যে সব বিষয় সমূহের উপর ঈমান আনা প্রয়োজন, ওগুলো শুনে ঈমান আনা, দেখে ঈমান আনা এবং ওগুলোর অন্তর্ভূক্ত হয়ে ঈমান আনা। আমরা আল্লাহ্–রসুল কুরআন–কিয়ামত দোযখ ফিরিশতা ইত্যাদির কথা শুনেই ঈমান এনেছি। অনেক আম্বীয়া কিরাম ওগুলোর মধ্যে কতেক বিষয় দেখে ঈমান এসেছেন। যেমন হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম আরয করেছিলেন, হে আল্লাহ্! আমাকে মুর্দার জীবিত করে দেখান। ফরমালেন,হে ইব্রাহীম! এর উপর কি তোমার ঈমান নেই? আরয করলেন, ঈমানতো আছেই তবে চিত্তের সন্তুষ্টি চাচ্ছি।

এখানে সন্তুষ্টি বলতে সেই সন্তুষ্টি নয়, যা ঈমানের জন্য প্রয়োজন। কারণ সেটা তো তাঁর আগ থেকে অর্জিত ছিল। বরং এখানে চাক্ষুষ ঈমানের কথা বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ হে খোদা, আমি শুনে বিশ্বাস করেছি, দেখে সন্তুষ্ট হতে চাচ্ছি।

আমাদের হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ঈমান প্রত্যক্ষ দর্শনেরও অনেক আগের। হুযূর স্বীয় নাবুয়াতের কথা হুযুরী জ্ঞান দ্বারা জেনেছেন। ফিরিশতা, জান্নাত, দোযখ ইত্যাদিকে সৃষ্টি হওয়ার আগে এবং সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথে দেখেছেন। স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলার সত্ত্বাকে মিরাজ রজনীতে কপালের চোখে অবলোকন করেছেন–

اور کوئی غیب تو کیا تُم سے نہاں ہو بھلا
جب نہ خدا ہی چھپا تم پر کروڑوں درود

অর্থাৎ যেখানে স্বয়ং খোদা আপনার কাছে অদৃশ্য থাকেনি, সেখানে এমন কি জিনিষ আছে, যা আপনার কাছে অদৃশ্য থাকতে পারে। আপনার প্রতি কোটি কোটি দরূদ।

আসল ব্যাপার হচ্ছে, আল্লাহ্ তাআলা হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে মিরাজ এ জন্য করায়ে ছিল, যেন সমগ্র জগতের ঈমান থেকে হুযূরের ঈমান অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হয়। কেননা আল্লাহ্ তাআলাকে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ব্যতীত কোন ফিরিশতা বা নবী দেখেননি। সেই একককে একজনই দেখেছেন। মোট কথা 'ঈমান' শব্দ এক কিন্তু ঈমানের হাকীকতের মধ্যে অনেক পার্থক্য। এমন কি যে বিষয় সমূহ হুযূরের জন্য ঈমান, আমাদের জন্য সরাসরি কুফর। যেমন হুযূরের কলেমা ছিল لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ (আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, আমি আল্লাহ্‌র রসুল) তাঁর আযান ছিল اَشْهَدُ اَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আমি আল্লাহ্‌র রসূল) তাঁর দরূদ ছিল صَلَّى اللّٰهُ عَلَىَّ وَعَلٰى اٰلِىْ وَاَصْحَابِىْ অর্থাৎ হে আল্লাহ্ আমার প্রতি, আমার বংশ ও সাহাবীগণের প্রতি রহমত সমূহ প্রেরণ করুন) আমরা যদি এ রকম বলি, কাফির হয়ে যাব।

কুরআন শরীফের যে সব জায়গায় اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْ ইরশাদ হয়েছে, এতে আমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার, তাদেরকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর প্রিয় হাবীবকে اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْ বলে কখনো সম্বোধন করেননি। বরং তিনি তাঁর হাবীবকে সম্বোধন করার জন্য يَاَيُّهَا النَّبِىُّ – يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ – يَاَيُّهَا (হে নবী, হে রসুল) ইত্যাদি প্রিয় শব্দ সমূহ প্রয়োগ করেছেন। নিম্নে এমন কয়েকটা আয়াত লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, যার মধ্যে اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا (যারা ঈমান এনেছে) আছে এবং এ সম্বোধন শব্দ সমূহে হুযুর মোটেই অন্তর্ভূক্ত নয়। দেখুন, আল্লাহ্ তাআলা ফরমানঃ

(١) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

(হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্ এবং রসুলের অগ্রগামী হয়ো না, আল্লাহ্‌কে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ) (২৬পারা)

(٢) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّآ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ -الخ

(হে ঈমানদারগণ! যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সেখানে দাওয়াত হয়, তাহলে বিনা আমন্ত্রণে যেওনা এবং পানাহার করে ওখানে গল্পগুজব করো না।) (সূরা আহযাব)

(٣) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْٓا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ -

(হে ঈমানদারগণ! স্বীয় কণ্ঠস্বর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কণ্ঠস্বর থেকে উঁচু কর না) (সূরা হুজরাত)

(٤) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوا انْظُرْنَا

(হে ঈমানদারগণ! আমার মাহবুবের বারাগাহে رَاعِنَا (রাইনা) বলিওনা বরং اُنْظُرْنَا (উনজুননা) বলিও (সুরা বাকারা)

(٥) لَا تَجْعَلُوْا دُعَاۗءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاۗءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا

(হে ঈমানদারগণ! রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে এমনভাবে আহবান কর না, যেমন তোমরা একে অপরকে আহবান কর এবং তাঁর সামনে উচ্চস্বরে কথা বল না) (সুরা নূর)

(٦) وَلَآ اَنْ تَنْكِحُوْٓا اَزْوَاجَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖٓ اَبَدًا

(এবং তাঁর পরে তাঁর বিবিগণকে বিবাহ কর না) (সুরা আহযাব)

উপরোক্ত আয়াত সমূহে اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا (হে ঈমানদারগণ) শব্দ আছে কিন্তু ওগুলোর মধ্যে হুযূর আনোয়ার (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) অন্তর্ভূক্ত নয়। যেসব আয়াতে নামায, সবর, কেসাস ইত্যাদির আহ্‌কাম রয়েছে, ওগুলোর মধ্যেও হুযূর অন্তর্ভূক্ত নয়। কেননা এসব আয়াততো নাবুয়াত প্রকাশ পাওয়ার ১৪/১৫ বছর পরে অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আগ থেকেই ইবাদতকারী, সিজদাকারী সবকিছু ছিলেন। সুতরাং অধমের তাহকীক হচ্ছে এ

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا এর মধ্যে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অন্তর্ভূক্ত নয়।

আগে বর্ণিত হয়েছে যে اِسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ (সবর ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করা) اِسْتَعِيْنُوْا শব্দটা اِسْتِعَانَتْ থেকে গঠন করা হয়েছে। যার মূল হচ্ছে عَوْن অর্থাৎ সাহায্য اِسْتِعَانَتْ এর অর্থ হচ্ছে সাহায্য প্রার্থনা করা। نَصْر এর অর্থও সাহায্য এবং عَوْن এর অর্থও সাহায্য। কিন্তু কোন কোন সময় এ একই অর্থবোধক দু'শব্দের মধ্যে পার্থক্য এভাবে করা হয় যে, বাহ্যিক বা প্রকাশ্য সাহায্যকে - نَصْر বলা হয় এবং আভ্যন্তরীন ও গোপন সাহায্যকে عَوْن বলা হয়। যদি এখানে গোপন সাহায্যের অর্থ গ্রহণ করা হয়, তাহলে ভাবার্থ হবে, হে মুসলমানগণ! সবর ও নামাযের মাধ্যমে আমার গোপন সাহার্য্য অর্জন কর। জিহাদ রোগ, কর্জ, বিপদ আপদসমূহ ইত্যাদিতে কেবল বাহ্যিক ধান্ধায় ব্যস্ত থেকো না বরং সবর ও নামাযের মাধ্যমে গোপন সাহায্যও অর্জন কর। বাহ্যিক হাতিয়ার কাফিরদের কাছে তোমাদের থেকে অধিক আছে কিন্তু এটা সে হাতিয়ার, যেটা থেকে কাফিরেরা একেবারে বঞ্চিত।

جھولیاں سب کی بھر تی جاتی ھین + دینے والا نظر نھیں آتا!
جو نظر آتے ھیں نھیں اپنے + جوھے اپنا نظر نھیں آتا!

অর্থাৎ প্রত্যেকের থলে ভরপুর করে দেয়া হয় কিন্তু দাতা দৃষ্টিগোচর হয় না। যা দৃষ্টিগোচর হয় সেটা নিজের নয় এবং যা নিজের সেটা দৃষ্টিগোচর হয় না। তাঁর ছায়া তলে থাকি, কিন্তু ছায়া দৃষ্টিগোচর হয় না।

সবরের অর্থ হচ্ছে অবরোধ করা এবং অবকাশ দেয়া। অন্য অর্থে এটা আল্লাহ্ তাআলার ছিফাত বা গুণ। আল্লাহ্‌র নাম সববার ও সুবুরও অর্থাৎ অবকাশ দানকারী। গুনাহগার বান্দাদেরকে আল্লাহ্ তাআলার অবকাশ দেয়াটা কোন সময় রহমত এবং কোন সময় যহমত (গজব)। যদি এ জন্য অবকাশ দেয়া হয় যে, সেই গুণাহগারের নাম নেক্‌কারদের লিষ্টের মধ্যে আছে বা শেষ পর্যন্ত তওবা করবে, তাহলে সেই অবকাশ যথার্থ রহমত আর যদি এ জন্য অবকাশ দেয়া হয় যে ওর পেয়ালা এখনও পূর্ণ হয়নি, ভাল মতে গুনাহ করতে দাও যেন অধিক শাস্তির উপযোগী হয়, তাহলে এ অবকাশটা হচ্ছে আযাবের। দেখুন, আল্লাহ্ তাআলা

ফিরাউনকে অবকাশ দিয়েছিলেন এবং হযরত মূসা আলাইহিস সালাম যাদুকরদেরকে। যেন তারা এ সময়ে কুফর ও পাপাচার করতে থাকে। কিন্তু ফিরাউনের অবকাশের পরিণাম এটাই হলো যে ওদের মধ্যে থেকে প্রত্যেক মুমিন, সাহাবী, সবরকারী এবং শহীদ হলো।

দ্বিতীয় অর্থে সবর বান্দার ছিফাত বা গুন, যার অর্থ হচ্ছে নফ্‌সকে দমন করা। সবরের তিনটি স্তর রয়েছে–বিপদের সময় নফ্‌সকে ঘাবড়িয়ে যাওয়া থেকে বাঁধা দেয়া, আনন্দ–আহ্‌লাদের সময় গুণাহসমূহ থেকে বাঁধা দেয়া এবং সব সময় স্বীয় নফ্‌সকে আল্লাহ্‌র আনুগত্যে বাধ্য করা অর্থাৎ সেটার উপর অটল থাকা।

উপরোক্ত আয়াতে এ তিন সবরের কথাই বলা হয়েছে। এ তিন সবরের তাফসীরে বিগত নবীগণের ঘটনাবলী, সাহাবা কিরামের অবস্থাদি এবং নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্র জীবন বৃত্তান্ত রয়েছে। এ জন্যই আল্লাহ্‌ তাআলা কুরআন করীমে নবীগণের ঘটনাবলী, সাহাবা কিরামের অবস্থাদি এবং হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্র জিন্দেগীর কথা বর্ণনা করেছেন। একই উদ্দেশ্যে কুরআন করীমে নবীগণ ও ওলীগণের সবর সমূহের কাহিনী বর্ণনা করেছেন এবং সৈয়্যদুশ শোহাদা শহীদে কারবালা হযরত ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) বালির পাতায় স্বীয় রক্তের কালিতে সেই জীবন্ত তাফসীর লিখেছেন, যা যুগের হাত বিলীন করতে পারেনা।

সবরের প্রথম স্তর অর্থাৎ বিপদের সময় সবর করার উদ্দেশ্য হচ্ছে বান্দা আল্লাহ্‌ তাআলার হেকমতের উপর যেন বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মনে করে যে তিনি দয়ালুও এবং হাকীমও। তাঁর প্রেরিত বিপদের মধ্যেও কোন ভেদ নিহিত থাকে। রোগী ডাক্তারের চিকিৎসা ও সহানুভূতির উপর আস্থা রাখে। তাই ওর হাতে অস্ত্র পাচারও করায়ে নেয়, তিক্ত অষুধ সেবন করে। মনে করে যে এর পরিণাম ওর জন্য কল্যাণকর। অনুরূপ বান্দা যখন আল্লাহ্‌ তাআলার হেকমতের উপর পূর্ণ আস্থা রাখে, তখন ওর এটা দৃঢ় বিশ্বাস হবে যে, বিপদ সমূহের পরিমাণ ইন্‌শাআল্লাহ্‌ আমার জন্য মঙ্গলময় হবে।

কাহিনীঃ মছনবী শরীফে বর্ণিত আছে যে, এক মহিলার বিশ পুত্র ছিল। খোদার হুকুমে প্রতি বছর আটার বছর বয়সে এক এক পুত্র মারা যেতে লাগ্‌লো। উনিশতম পর্যন্ত সে ধৈর্যশীলা ছিল। যখন বিশতম পুত্র সেই একই রোগে আক্রান্ত হলো, তখন সে ঘাবড়িয়ে গেল এবং অনেক চিকিৎসাদি করালো। কিন্তু ছেলেকে আরোগ্য করতে পারলো না। শেষ পর্যন্ত মারা গেল। এতে মা পাগল হয়ে গেল। এক রাত্রে এ পাগল অবস্থায় স্বপ্নে একটি খুবই সুন্দর বাগান দেখলো, যার শ্যামল

সমারোহ, নদী প্রবাহ ও সাজসজ্জা বর্ণনাতীত। এতে অগণিত বাংলো রয়েছে এবং প্রত্যেকটিতে মালিকের নাম খুঁদানো ছিল। একটি একান্ত মনোরম বাংলোতে ওর নাম খুঁদানো দেখলো। সে খুবই আনন্দিত হয়ে ভিতরে প্রবেশ করলো। ভিতরের সৌন্দর্য ও কারুকার্য দেখে সে বিভোর হয়ে গেল। সে বাংলোর কামরা সমূহ ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলো। একটি কামরায় দেখলো যে তার বিশ ছেলে খুবই আরাম আয়েশে বসে আছে। ওকে দেখে ছেলেরা বললো, আম্মাজান, আমরা স্বীয় রবের সান্নিধ্যে খুবই আরামে আছি। অদৃশ্য থেকে আহবানকারী আহবান করে বললেন, হে মুমেনা, এটা তোমার বাংলো। কিন্তু তোমার আমলসমূহ তোমাকে এখান পর্যন্ত পৌছাতে পারতো না। এ জন্য তোমাকে বিশটি মানষিক যাতনা দেয়া হয়েছে। এবং এ বিশটি মানষিক যাতনা এ বাংলোর সিঁড়ি ছিল, যে গুলো তুমি আল্লাহ্‌র মেহেরবাণীতে অতিক্রম করেছ। এখন তোমার জন্য শুধু আনন্দ আর আনন্দ।

যখন সে এ স্বপ্ন দেখার পর জাগ্রত হলো, তখন চিৎকার দিয়ে উঠলো, হে আল্লাহ্‌! আমাকে একশ ছেলে দাও এবং সবাইকে যৌবনকালে মৃত্যুদান কর। আমারতো জানা ছিল না যে তোমার কহরের মধ্যে মোহর লুকায়িত আছে।

ناخوش او خوش بود در جان در جان من
جان فدائے یار دل رنجان من

অর্থাৎ তাঁহার অসন্তুষ্টি আমার সন্তুষ্টির কারণ। কিন্তু বন্ধুর সন্তুষ্টির জন্য নিজে দুঃখ ভোগ করতে চাই।

কারিগর সোনা বা লোহাকে ভাটীতে গরম করে কার্যোপযোগী করার জন্য হাঁতুড়ি পেটা করে। এ জন্যই ইরশাদ হয়েছেঃ اِسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ

বিপদের সময় মানুষের স্মরণ রাখা উচিৎ যে কুফরী আচরণ বা বেসবরী করার দ্বারা বিপদ দূরীভূত হবে না বরং সবরের ছওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে। বিপদের সময়ে সবরের রহস্য হচ্ছে যে, নফ্‌স পাগলা ঘোড়ার মত পাগলামীর যোশে স্বীয় মালিককে ফেলে দিতে চায়। তাই এর মুখে লাগাম দাও এবং চেষ্টা কর যেন কোন কামিল পীর মোর্শেদ ওকে স্বীয় মজবুত ধরার মধ্যে নিয়ে নেয়। যখন নফ্‌স গুনাহের দিকে আকৃষ্ট হয়, তখন মনে মনে এটা খেয়াল কর যে আমার মধ্যে কি দোযখের আগুন সহ্য করার ক্ষমতা আছে বা আমি কি আল্লাহ্‌ তাআলার মুকাবিলা করতে পারবো? যদি এ দুটো কাজ সম্ভব নয়, তাহলে গুনাহ কেন করতে যাবে।

কাহিনীঃ এক ভদ্রলোক কোন এক প্রমোদবালার উপর আসক্ত হয়ে গেলেন। ওর সাথে দরাদরি চুড়ান্ত করে ওকে প্রতিদিন ওনার কাছে হাজির থাকার নির্দেশ

দিলেন। কথামত মহিলাটি ওনার সামনে বসে থাকতো এবং তিনি ওর দিকে তাকাতেন এবং নিজ কাজ করতে থাকতেন। এভাবে বেশ কিছু দিন অতিবাহিত হলো। একদিন প্রমোদবালা বললো, আপনি অনর্থক আপনার পয়সা ও আমার সময় কেন নষ্ট করতেছেন? যখন আমার সাথে কোন কিছু করার না থাকে, তাহলে আমাকে চলে যাবার অনুমতি দিন। ওর এ কথায় ওনার নফ্স খুবই উত্তেজিত হয়ে উঠলো। তিনি উঠলেন এবং চেরাগ জ্বালালেন। অতঃপর এর শিখার উপর স্বীয় আঙ্গুল রাখলেন, ফলে চামড়া মাংস সব জ্বলে গেল। এরপর বললেন, তুমি চলে যাও আর এসো না। সে বললো, আমিতো যাচ্ছি, তবে আমাকে এটা বলুন যে আপনি আমাকে কেন ডাকলেন আর এখন কেন চলে যেতে বলছেন? তিনি বললেন, আমাকে দীর্ঘদিন ধরে এ নফ্স তোমার মায়াজালে আবদ্ধ করে রেখেছিল। আমি খুবই জোর জবরদস্তি করে ওকে প্রতিরোধ করে রেখেছিলাম। আজ তোমার সেই কথা থেকে ভীষণ উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল এবং যৌন লালসা খুবই বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাই আমি স্বীয় নফ্সকে বললাম প্রথমে এখানকার আগুনের তেজ যাচাই কর। যদি একে সহ্য করতে পার, তাহলে দোযখে যাবার সাহস করতে পার। অন্যথায় এ কুকর্ম থেকে বিরত থাক। যখন আঙ্গুলের চর্বি জ্বলে গেল, তখন নফ্স আওয়াজ দিল, আমার সহ্য করার ক্ষমতা নেই। খোদার আজাবের ভয়ে সে সব উত্তেজনা একেবারে প্রসমিত হয়ে গেল। এখন তুমি চলে যাও, আর কখনও এসো না। যেহেতু এ কথাটা অন্তর থেকে বের হয়েছিল, সেহেতু সেটা প্রমোদবালার মনে দারুন রেখাপাত করলো। সে কাঁদতে লাগলো এবং বললো, আমার কি অবস্থা হবে, আল্লাহ্কে কিভাবে মূখ দেখাবো। অতঃপর তওবা করলো এবং নেক্কার হয়ে গেল।

ছুফিয়ানে কিরাম বলেন, মুস্কিলতো সবর থেকে সহজ হয়ে থাকে কিন্তু সবর করাটাও একটি মুস্কিল বিষয়। জ্বর তিক্ত ঔষুধ দ্বারা দূরীভুত হয় কিন্তু সেই তিক্ত ঔষুধ পেটে কিভাবে যায়। তাঁরা বলেন, সবরকে সহজকারী তিনটা বিষয় রয়েছে–ভয়, উৎসাহ ও আনন্দ। অর্থাৎ খোদার আজাবের সঠিক ভয় সবরকে সহজ করে দেয়। দেখুন কারাগারের ভয়ে আমাদেরকে অনেক কষ্টের বেলায় ধৈর্যশীল বানিয়ে দেয়। তাহলে আল্লাহ্র সত্যকার ভয় আমাদেরকে কেন সবরকারী বানাবে না। অনুরূপ লক্ষ্যে পৌছার উৎসাহ মানুষকে সবরকারী বানিয়ে দেয়। যখন বি, এ, এম এ এর ছাত্রদের উচ্চস্তরে পৌছার উৎসাহ হয়, তখন অনেক ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করে। অন্যান্য লোকেরা রাতসমূহ নিদ্রায় অতিবাহিত করে আর এরা অধ্যয়নে রাত অতিবাহিত করে। যখন অফিসার বা বড় কর্তা হওয়ার উৎসাহে

মানুষ সারা রাত জেগে থাকতে পাবে, তাহলে জান্নাতী হওয়ার উৎসাহে কেন তাহাজ্জুদ ও ফজরের জন্য জাগতে পারবে না?

তবে শর্ত হচ্ছে যে উৎসাহ কেবল মৌখিক হলে হবে না বরং আন্তরিক হতে হবে। যে ব্যক্তি মুখে বলে বেড়ায় যে আমার বি.এ পাশ করা চায় কিন্তু সাধনা করে না, সে মিথ্যুক। অনুরূপ যে মুখে বলে বেড়ায় যে আমার জান্নাত লাভের উৎসাহ আছে অথচ এর বিপরীত আমল করে, সে মিথ্যা দাবীদার।

کام دوزخ کے کئے جنت کے ہیں امید وار
قصر جنت تو بنا ہر پارسا کے واسطے
حیف تو سوتا رہے مسجد میں ہوتی ہو اذاں
مرغ وماہی سب اٹھیں یاد خدا کے واسطے

অর্থাৎ দোযখের কাজ করে জান্নাতের আশাবাদী কিন্তু জান্নাতের মহলসমূহ পূণ্যবানদের জন্যই তৈরী করা হয়েছে। আফসোস! মসজিদে আযান হচ্ছে আর তুমি শুয়ে রয়েছ অথচ মোরগ ও মৎস্যকূল সব আল্লাহ্র স্মরণে জেগে উঠেছে।

সবরকে সহজকারী তৃতীয় বিষয় হচ্ছে আনন্দ অর্থাৎ ইশকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও দীদারে ইলাহীর আনন্দ। এটা হচ্ছে সবচে উচ্চ স্তরের বিষয়, যেটা মানুষের দ্বারা বড় বড় কঠিন কাজ আদায় করে নেয়। যদি শিরীকে পাওয়ার আনন্দের ফরহাদ কুঠার দ্বারা একান্ত মজবুত পাহাড়কে খোদাই করতে পারে, তাহলে ইশকে ইলাহীর আনন্দে ইমাম হোসাইন রাদি আল্লাহু আনহু কি মস্তক কাটাতে পারে না, ঘর লুণ্ঠিত করাতে পারে না?

বন্ধুগণ! শিরীর অবস্থানরত পাহাড়, না ফরহাদ খোদাই করেছে, না তার কুঠার বরং ওর প্রেমই খোদাই করেছে। মানুষের প্রত্যেক কিছু দুর্বল। এমনকি তার জ্ঞানও দূর্বল। স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা ফরমান خُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا (মানুষকে দুর্বল সৃষ্টি করা হয়েছে) কিন্তু যদি সুভাগ্য হয়, তাহলে ওর ইশক অনেক শক্তিশালী, এর দ্বারা অন্যান্য সৃষ্টিকূলকে হার মানাতে পারে। আল্লাহ্ তাআলা ফরমানঃ وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ ط اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا ○ (এবং মানুষ উহা বহন করলো। নিশ্চয় সে নিজের জানকে কষ্টে নিক্ষেপকারী, অতিশয় অজ্ঞ)।

এবার صَلٰوة 'সালাত' শব্দ নিয়ে অলোচনা করা যাক। সালাতের তিনটি অর্থ আছে– রহমত নাযিল করা, রহমতের দুআ করা এবং নামায। প্রথম অর্থ আল্লাহ্র জন্য খাস। দ্বিতীয় অর্থ ফিরিশতাগণের বেলায়ও প্রযোজ্য এবং মানুষ ও অন্যান্যদের বেলায়ও প্রযোজ্য। আল্লাহ্ তাআলা ইশরাদ ফরমান–

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ۝

কিন্তু তৃতীয় অর্থ নামায কেবল মানুষের বেলায় প্রযোজ্য। এটা একমাত্র মানুষকে দান করা হয়েছে এবং বিশেষ করে সেই নামায, যার মধ্যে রুকূ, সিজদা, কিয়াম, তিলাওয়াতে কুরআন সব কিছু আছে। এটা কেবল উম্মতে মুস্তাফারই নসীব হয়েছে, কোন ফিরিশতা বা অন্য কোন নবী বা উম্মতের নসীব হয়নি। উপরোক্ত আয়াতে এ তৃতীয় অর্থ বুঝানো হয়েছে। তবে এ ব্যাপারে ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে। এখানে পাঞ্জেগানা নামাযও হতে পারে বা বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে বিশেষ নামাযও হতে পারে। পাঞ্জেগানা নামায বুঝালে আয়াতের অর্থ এভাবে হবে–হে মুসলমানগণ! সবর ও পাঞ্জেগানা নামাযের অনুসারী হয়ে প্রত্যেক কাজে সাহায্য গ্রহণ কর। এর তফসীর সেই হাদীছ, যেটাতে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম) ইরশাদ ফরমান, যে মুমিনের অন্তর ও ধ্যান ধারণা সব সময় নামাযের প্রতি লেগে থাকবে এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাত সহকারে মসজিদে আদায় করবে এবং নামাযের পর সঙ্গে সঙ্গে মসজিদ থেকে বের হয়ে আসে না বরং কিছুক্ষণ ওখানে অপেক্ষা করে, তাহলে ওর জিন্দেগীটাও আনন্দময় হবে এবং মৃত্যুটাও। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান, فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً – (তাহলে আমি তাকে আনন্দময় জীবন দান করবো) এ ধরনের ব্যক্তির উপর নামাযের বরকতে আল্লাহ্‌র মেহেরবাণীতে মুসীবত আসেই না। আসলেও দীর্ঘস্থায়ী হয় না, আসার সাথে সাথে চলে যায়। এবং দীর্ঘস্থায়ী হলেও মনের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। ওসব মুসীবত সমূহের উপর আত্মা এমনভাবে সাঁতার কাটে, যেমন পানির উপর নৌকা।

آب در کشتی هلاك کشتی است + آب اندرزیر کشتی پشتی است

অর্থাৎ পানি নৌকায় প্রবেশ করলে নৌকার জন্য অকল্যাণকর আর পানি নৌকার নীচে থাকলে নৌকার জন্য কল্যাণকর।

নদীতে নৌকা থাকলে অনেককে তীরে পৌঁছায়ে দেয় কিন্তু নৌকাতে নদী আসলে ডুবে যায়। ও ধরনের লোকের জন্য আফসোস, যারা বাহ্যতঃ পরহিজগার মনে হয়, তসবীহ ও অজিফার বেলায় খুবই গুরুত্বারোপ করে কিন্তু নামায ও জামাতের দিকে মোটেই খেয়াল রাখে না। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম) এর যখন তাঁর শেষ তিন নিঃশ্বাস এসেছিল, তখন প্রথম নিঃশ্বাসে বলেছেন اَلصَّلٰوةَ অর্থাৎ হে আমার উম্মত নামাযের অনুসারী হও দ্বিতীয় নিঃশ্বাসে

বলেছেন, مَامَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ (নিজেদের অধীনস্তদের প্রতি সহানুভূতি কর) এবং তৃতীয় নিঃশ্বাসে বলেছেন اَللّٰهُمَّ بِالرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى (হে আল্লাহ, আমাকে উপরে অবস্থানকারী সাথীদের কাছে পৌঁছিয়ে দিন) এর পরে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম) এর ওফাত হয়।

সৌভাগ্যবান সে উম্মত, যিনি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত প্রিয় হাবীবের সেই ওসীয়ত মুতাবেক আমল করেন।

যদি সালাত দ্বারা বিশেষ নামায বুঝানো হয়, তাহলে এর ভাবার্থ হবে, হে মুমিণগণ, মসীবতে সবর ও নামায দ্বারা সাহায্য গ্রহণ কর। ইসলাম প্রতিটি দুরাবস্থায় নামাযের শিক্ষা দিয়েছেন। যেমন সূর্য গ্রহণ হলে কসুফের নামায পড় এবং চন্দ্রগ্রহণ হলে খসুফের নামায পড়, বৃষ্টি না হলে ইস্তেসকার নামায পড়, কোন ধর্মীয় বা দুনিয়াবী সমস্যার সম্মুখীন হলে হাজতের নামায পড়। মোট কথা নামায মুমীনদের আশ্রয় স্থল।

এখানে একটা প্রশ্ন জাগতে পারে যে আল্লাহ তাআলা অন্যান্য ইবাদত সমূহের কথা কেন উল্লেখ করেননি অর্থাৎ এ রকম কেন বলেননি যে সবর ও যাকাত দ্বারা বা সবর ও হজ্ব দ্বারা সাহায্য গ্রহণ কর। এর জবাব হচ্ছে, নামায ব্যতীত অন্য কোন ইবাদতে সাহায্যের ক্ষমতা কম। প্রথমতঃ এ কারণে যে, সমস্ত ইবাদত কেবল দুনিয়াতে হয়ে থাকে কিন্তু নামায পরশ আরশ সব জায়গায় হয়ে থাকে। কেননা নামাযের বিভিন্ন অংশ যেমন রুকূ সিজদা ইত্যাদি আরশ বহণকারী ফিরিশতাগণ থেকে শুরু করে প্রথম আসমানের ফিরিশতাগণের মধ্যে পাওয়া যায়। ফিরিশতাগণের মধ্যে কোন জামাত রুকূর মধ্যে, কোন জামাত সিজদারত, এভাবে বিভিন্ন জমাত বিভিন্ন অবস্থায় আছে। যেন নামাযের সকল অংশ আসমানী, যে গুলোকে আমরা এক সাথে ফিটিং করে নিয়েছি। দুনিয়া সৃষ্টির লাখ লাখ বছর আগে নূরে মুহাম্মদী সৃষ্টি হয় এবং সেটা সদা ইবাদতে নিয়োজিত রইলেন। কোন্ ইবাদতে? যাকাত হজ্ব, জিহাদ ইত্যাদিতে? না, কেবল নামায ও নামাযের রোকনসমূহে নিয়োজিত ছিলেন। যেহেতু এ নূরানী মখলুক দুঃখ–কষ্ট থেকে মুক্ত, সেহেতু নামাযীও দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্ত থাকবে। মূলের প্রভাব রূপকের মধ্যেও এসেযায়।

দ্বিতীয়তঃ চিকিৎসার একটি নিয়ম এটাও যে রোগীর ধ্যান রোগ থেকে সরিয়ে দেয়া, ফলে রোগীর রোগের কষ্ট হয়তো অনুভব হয়না অথবা খুবই কম অনুভব হয়। নামায নামাযীর ধ্যানকে দুনিয়া থেকে একবারে সরিরে দেয় বরং ওকে মানসিকভাবে দুনিয়া থেকে বের করে দেয়। তকবীর তাহরীমা বলা মাত্রই

খানাপিনা কথাবলা মোটকথা দুনিয়ারী সমস্ত কাজ হারাম হয়ে যায় এবং নামায শেষ হবার পর নামাযী বলে, আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ, যেন নিজের সাথে অবস্থিত ফিরিশতাগণ এবং লোকদেরকে সালাম করে। কেননা সে উর্ধজগত সফর করে এলো। যখন দুনিয়া থেকে অদৃশ্য হলো, তখন এখানকার সব দুঃখ কষ্টও এখানে রেখে গেল। এটাতো আমরা গুনাহগারদের নামাযের অবস্থার কথা বর্ণনা করলাম। আল্লাহ তাআলা যাদেরকে ইহসানী ও শহুদী নামায দান করেন, যায় ব্যাখ্যা হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম) এ ভাবে দিয়েছেন যে ইবাদত এ রকম কর যেন তুমি আল্লাহকে দেখতেছ আর যদি এটা বুঝে না আসে, তাহলে মনে কর যে আল্লাহ তোমাকে দেখতেছে। ওদের অবস্থা এমন হয় যে ওদেরকে নামাযের মধ্যে কতল করে দিলেও ওদের অনুভব হয় না।

আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, হযরত আলী মরতুজা শেরে খোদা (রাদি আল্লাহু আনহু) এর পবিত্র শরীরে একটি তীর বিদ্ধ হয়ে ছিল, যেটা বের করতে খুবই কষ্ট হচ্ছিল। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম) এর কাছে আরয করা হলো তীর কিভাবে বের করা যায়, আলীর অবস্থা, খুবই মারাত্মক। ফরমালেন, ওকে বল নামায শুরু করতে। যখন নিয়ত বাঁধলেন, নির্দেশ দিলেন, তীর টেনে বের করে নাও। নির্দেশ মত বের করে নেয়া হলো এবং ওনার অনুভরও হলো না।

যদি মিশরী মহিলারা হযরত ইউচুফের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে বিভোর অবস্থায় নিজেদের হাত কেটে ফেলতে পারে, তাহলে যদি নামাযী জামালে মুহাম্মদী বা খোদার নূরের তজল্লীতে বিভোর হয়ে পার্থিব অনুভূতি থেকে রেখবর থাকে, এতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে? যখন নামাযীর ধ্যান নামাযের মধ্যে নিবিষ্ট থাকে, তখন মোক্তাদীদের ইমামের কেরাতের খবর থাকে না। এমন কি ইমামেরও ধ্যান থাকে না যে সে কি পড়তেছে। এভাবে নামাযের মধ্যে সঠিক ধ্যান থাকলে দুনিয়াবী কোন খবর থাকে না।এ জন্যই ইরশাদ হয়েছে وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ

আয়াতের শেষাংশে বর্ণিত আছে- اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ

(আল্লাহ তাআলা সবরকারীদের সাথে আছেন) আল্লাহ তাআলা এলাকাগত সঙ্গ থেকে পবিত্র। কেননা তিনি কোন স্থান বা জায়গার সাথে সম্পৃক্ত নয়। তাঁর সঙ্গ দানের তিনটি ধরন রয়েছে। (১) তাঁর ইলম ও কুদরতের সঙ্গদান। এ হিসেবে তিনি সব সময় বান্দার সাথে থাকেন وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ

(যেখানেই তোমরা থাক না কেন, তিনি তোমাদের সাথে আছে) আর এক জায়গায় ইরশাদ ফরমায়েছেন- وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُبْصِرُوْنَ - وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ -

(আমি তোমাদের খুবই নিকটতম কিন্তু তোমরা দেখনা এবং আমি সাইরগ অপেক্ষাও নিকটতর)। (২) রহমতের দিক দিয়ে কেবল মুমিনদের নিকটতর। যেমন ইরশাদ করেছেন ০ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ

(নিশ্চয় আল্লাহর রহমত নেক্‌কারদের নিকটতর) (৩) কহর ও আযাবের দিক দিয়ে কাফিরদের নিকটতর।

উপরোক্ত আয়াতাংশে দ্বিতীয় ধরনের নৈকট্য বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর রহমত ও মেহেরবাণী সবরকারীদের জন্য। এ আয়াত থেকে কয়েকটি বিষয় প্রমাণিত হয়–এক, শোকরকারী থেকে সবরকারী আফজল এবং শোকর থেকে সবর উত্তম। কেননা শোকরের বিনিময়ে অধিক নিয়ামত কিন্তু সবরের বিনিময়ে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়। দুই, আল্লাহর বান্দাগণ থেকে সাহায্য গ্রহণ জায়েয, শিরক নয়। দেখুন, সবর, নামায, যা আমাদের কাজ, ওগুলোর মাধ্যমে সাহায্য গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাহলে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং আউলিয়া কিরামতো আমাদের নামায সমূহ থেকে অনেক আফজল। তাই ওনাদের মাধ্যমেও সাহায্য গ্রহণ জায়েয। যে সব আয়াতে আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারো থেকে সাহায্য গ্রহণ নিষেধ আছে, ওখানে হাকীকী অর্থ বুঝানো হয়েছে বা আল্লাহ্‌র মুকাবিলায় অন্য কারো সাহায্য গ্রহণ বুঝানো হয়েছে। সুতরাং আয়াতসমূহে কোন দ্বন্দ্ব নেই। এর বিস্তারিত বিশ্লেষণ আমার কিতার জাআল হক (১ম খণ্ড) ইলমুল কুরআন ও ফেরেস্ত কুরআনে দেখুন।

অনেক লোক আপত্তি করে যে কুরআন করীমের বিভিন্ন জায়গায় নামাযের বিভিন্ন ফায়দার কথা বর্ণিত হয়েছে। এক জায়গায় বলা হয়েছে, নামায মুস্কিল আসান করে, বিপদ দূরীভূত করে, অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে, নামায বেহায়াপনা ও পাপাচার থেকে বাঁধা দেয়, কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে অনেক নামাযী পাপাচার করে এবং অনেক নামাযীর উপর বিপদও আসে। তাই ওদের আপত্তি হলো, আল্লাহ তাআলার ওয়াদাসমূহের বিপরীত কিভাবে হতে পারে।

এর উত্তর হচ্ছে, এ প্রতিফল সমূহ কামিল নামাযের বেলায় প্রযোজ্য। কামিল নামায হচ্ছে যার ভিতর বাহির উভয়টা সঠিক থাকে। বাহ্যিক রোকনগুলো হচ্ছে নামাযের কাঠামো, মনের ভয়ভীতি ও একাগ্রতা হচ্ছে নামাযের রূহ। যে নামাযে এ দু'টি বিষয় একত্রিতভাবে পাওয়া যায়, সেটা হচ্ছে কামিল নামায। এ ধরনের নামাযের জন্যই সেই প্রতিফল সমূহ রয়েছে। যদি আমাদের নামাযে কেবল কাঠামো আছে, রূহ নেই, তাহলে আমাদের নামাযকে কামিল করার চেষ্টা করা দরকার। কুরআনের আয়াত সম্পর্কে আপত্তি করায় কোন অবকাশ নেই।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে বিদ্যুৎ বাল্ব আলো দেয়। কিন্তু কখন, যখন এতে পাওয়ারও থাকে। তবে কোন ব্যক্তি এ মনে করে যেন নামায ত্যাগ না করে যে আমার নামায়ে ভয়ভীতি ও একাগ্রতা নেই, তাই নামায পড়ে কি লাভ, রূহহীন নামায অর্থহীন। এটা ভুল ধারণা বরং নামায পড়তে থাকুন। আল্লাহ্ তাআলা এর মধ্যে রূহের আবির্ভাব ঘটাতে পারে। বৃষ্টির দ্বারা জঙ্গলের শুক্‌না ঘাস তরতাজা হয়েযায়।

কাহিনীঃ এক মুরীদ তাঁর কামিল পীরের কাছে চিঠি লিখলেন যে নামাযে আমার একাগ্রতা আসে না। বিভিন্ন আজে বাজে ধারণা খুবই উৎপীড়ন করে। আমি কি নামায ছেড়ে দেব। পীরে কামিল জবাব দিলেন যে, তোমাদের পানাহারের সময় অনেক মাছি উৎপাত করে। তাই বলে কি তোমরা পানাহার ত্যাগ কর? কখনো নয়, মাছি তাড়িয়ে খেতে থাক। নামাযও রূহানী খাদ্য। আজে বাজে ধারণা সমূহ তাড়াতে থাক এবং নামায পড়তে থাক।

دو بامداد گرآید کسے بخدمت شاه+سوئم هرآ ینه دروے کند بلطف نگاه

امید هست پر ستند گان حضرت را+ که نا امید نه گردند زآستان الٰه

অর্থাৎ যে কেউ যদি প্রতি দিন বাদশাকে সালাম করতে থাকে, শেষ পর্যন্ত একদিন না একদিন জিজ্ঞাসা করবে, তুমি কি চাও। অনুরূপ যে ব্যক্তি প্রতিদিন মসজিদে উপস্থিত হয়ে নামায আদায় করে, ওকেও ইনশাআল্লাহ কোন এক সময় জিজ্ঞাসা করা হবে। আল্লাহ্ তাআলা যেন স্বীয় ফজল ও মেহেরবাণীতে এমন নামায নসীব করে, যেটা সব জায়গায় কাজে আসে।

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ وَنُوْرِ عَرْشِهٖ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَسَلَّمْ-

বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রহীম

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ط بَلْ اَحْيَاءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ○

তরজুমাঃ যারা আল্লাহর রাস্তায় মারা যায়, ওদেরকে মৃত বল না, ওরা তো জীবিত কিন্তু তোমরা অবহিত নও।

এ পবিত্র আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর মাহবুবের উম্মতের সেই কাফেলার প্রসংশা করেছেন, যাদেরকে শরীয়তের পরিভাষায় শহীদ বলা হয়। এ আয়াতের তফসীরের আগে দু'টি কথা বুঝে নেয়া চায়।

এক, শহীদ শব্দটা শহুদ বা শাহাদত থেকে গঠন করা হয়েছে। শহুদের অর্থ হচ্ছে উপস্থিত হওয়া এবং শাহাদতের অর্থ হচ্ছে সাক্ষ্য। অতএব শহীদের অর্থ উপস্থিত বা সাক্ষী। যখন শহীদ শাহাদত বরণ করার সাথে সাথে আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত হয়, তখন আল্লাহ্ তাআলা ফরমান, কিছু কামনা কর। সে আরয করে, আমার কাম্য হচ্ছে পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে যাই এবং পুনরায় শহীদ হই। কেননা যে স্বাদ ও তৃপ্তি সেই উত্তপ্ত বালি, যুদ্ধের ভয়াবহতা ও তলোয়ারের আঘাতে পেয়েছি, সেটা অন্য কোন ক্ষেত্রে দেখিনি। আল্লাহ তাআলা ফরমান, আমি কাউকে প্রথমবার পরীক্ষায় পাশ করার পর দ্বিতীয় বার পরীক্ষা লইনা। এ জন্য ওকে শহীদ বলা হয় অর্থাৎ শাহাদত বরণ করার সাথে সাথে আল্লাহ্‌র বারগাহে উপস্থিত।

সমস্ত মুসলমান কিয়ামতের পর জান্নাতে যাবে। কিন্তু শহীদের জান বের হবার সাথে সাথেই ওখানে পৌঁছে যায়। ওখানকার মেওয়া খায়, ওখানকার বাগান নদী নালায় বিচরণ করে।

এ জন্য শহীদ হলা হয় অর্থাৎ জান্নাতে তক্ষনি উপস্থিত। অনেক রেওয়ায়েতে এ রকমও বর্ণিত আছে যে অনেক গাজী শাহাদাতের আগেই জান্নাত ও ওখানকার নিয়ামত সমূহ অবলোকন করে, সকলকে বলে, বন্ধুগণ, আসুন, ওটাই জান্নাত।

সব লোক ইসলামের সঠিকতা, তাওহীদ ও রেসালতের সাক্ষ্য স্বীয় মুখ, কলম বা অংগসমূহ দ্বারা দিয়ে থাকে। কিন্তু নিথর সাক্ষী (শহীদ) স্বীয় রক্তের ফোঁটা সমূহ দ্বারা সাক্ষ্য দেয়। এ জন্য শহীদ বলা হয়। দুই, দুনিয়াবী সালতানতের অধীনে বিভিন্ন বিভাগ থাকে। প্রত্যেক বিভাগের নাম ও কাজ কর্ম পৃথক পৃথক হয়ে থাকে। অনুরূপ সালতানতে মুস্তাফার অনেক বিভাগ আছে–ওলামা, ছুফি, গাজী, শহীদ ইত্যাদি। আবার ওলামার মধ্যে মুফাসসেরীন, মুহাদ্দেসীন ফোকহা,

মুজতাহেদীন ইত্যাদি এবং ছুফিগণের মধ্যে গাউছ, কুতুব আবদান ইত্যাদি উপবিভাগ রয়েছে। দুনিয়াবী সালতানতে (রাজত্বে) সবচে অধিক সামরিক বিভাগের কদর করা হয়। এ বিভাগে বেতন ছাড়া রশদও সরবরাহ করা হয়। দেশে অভাব দেখা দিলেও সামরিক বিভাগে এর প্রভাব পড়তে দেয়া হয় না। তাছাড়া ওদের মধ্যে যারা যুদ্ধে মারা যায়, ওদের পরিবারের লোকদেরকে বীরত্বের সনদ প্রদান করা হয়, পেনশনের ব্যবস্থা করা হয় ছেলেমেয়ের ফ্রি লেখাপড়ার সুযোগ করে দেয়া হয়। সব কিছু এ জন্যই করা হয় যে সামরিক লোকেরা স্বীয় রক্ত দ্বারা দেশের খেদমত করে। অনুরূপ খোদার জগতেও সালতানতে মুস্তাফায় শহীদের মত কদর অন্য কারো নেই। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাইলে, কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও হাদীছ দেখুন। এ রকম হবেইনা বা কেন, এরা স্বীয় জান ও রক্ত দ্বারা সেই সরকারের দেখমতে নিয়োজিত। এ দু'টি বিষয় বুঝার পর এবার সেই আয়াতের তফসীর শুনুন।

ইরশাদ হয়েছে وَلَاتَقُوْلُوْا (বল না) কাউকে কিছু বলা থেকে বাঁধা দেয়ার তিনটি প্রেক্ষাপট রয়েছে।

এক, বিষয়টা খুবই ভাল কিন্তু বলা নিষেধ। যেমন বেদ সমূহ ও রহস্যাবলি যেটা আমানত হিসেবে অন্তরে লুকায়ে রাখা হয়, কাউকে বলা যায় না। যেমন মিরাজ রজনীতে লামকানের আলোচনা সমূহ যেটা আল্লাহ তাআলা কালামে পাকে এভাবে বর্ণনা করেছেন فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَآاَوْحٰى

(অতঃপর স্বীয় বান্দাকে যা অবহিত করার আছে, তা অবহিত করায়েছেন) তাঁর মাহবুব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম)কেও বারন করেছেন যে এ বিষয়সমূহ যেন অন্য কাউকে না বলেন। আশেকগণ তো এতটুকু পর্যন্ত বলেন–

انداز حسینوں کو سکھا ئے نہیں جاتے + اُمّی بقی ھوں وہ پڑھائے نہیں جاتے

ھر ایک کا حصہ نہیں دیدارکسی کا + بو جہل کو محبوب دکھا ئے نہیں جاتے

এর ভাবার্থ হচ্ছে অপরিচিতদের কাছে বেদসমূহ বলা যায় না, আবার একান্ত আপন জনের কাছে বেদসমূহ লুকায়ে রাখা যায় না।

দুই, কথা সত্য কিন্তু বলা নিষেধ। যেমন يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا

(হে ঈমানদারগণ! رَاعِنَا বল না) رَاعِنَا শব্দটা মূলতঃ খারাপ ছিল না কিন্তু বেআদবরা এর অর্থ বিকৃতি করে বেআদবীর সুযোগ পেত। এ জন্য এ রকম বলা

থেকে বাঁধা দেয়া হয়েছে। ছুফিয়ানে কিরাম বলেন, বেআদবীর সত্য কথা কুফরী এবং বাআদবের মিথ্যা কথা প্রত্যক্ষ ঈমান।

ইবলিস বলেছিল رَبِّ بِمَا اَغْوَيْتَنِىْ (হে খোদা, তুমি আমাকে গোমরাহ করে দিলে) কথাটি সত্য ছিল। আল্লাহ্ তাআলাই হেদায়তকারী ও গোমরাহকারী। কিন্তু ওর বলাটা কুফরী হলো। কেননা এটা বেআদবী ছিল। হযরত আদম আলাইহিস সালাম আরয করেছিলেনঃ رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا

(হে আল্লাহ্! আমরা নিজের জানের উপর জুলুর করেছি) কথাটা সত্য নয়। বান্দা আল্লাহ্র ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করতে পারে না। কিন্তু ওনার বলাটা প্রত্যক্ষ ঈমান ছিল। আল্লাহ্ তাআলার অনেক প্রিয় বান্দাগণ, যারা কোন সময় গুনাহের কাছেও যায়নি, এ রকম বলতে থাকেন আমরা গুণাহগার, অপরাধী। কথাটা অবাস্তব কিন্তু এ রকম বলাটা উচ্চ মর্যাদা লাভের সহায়ক।

তিন, কথা মিথ্যা, খারাপও, বেআদবী এবং বলাটাও মন্দ, যেমন নাশোকরী ও কুফরী কথাবার্তা। উপরোক্ত শব্দে এ তৃতীয় ধরনের নিষেধাজ্ঞা বুঝানো হয়েছে, অর্থাৎ শহীদগণকে মৃত বলাটাও মিথ্যা এবং অপরাধও। সুতরাং لَا تَقُوْلُوْا এর নিষেধাজ্ঞা চূড়ান্ত পর্যায়ের। অধিকন্তু কুরআনের প্রায় সম্বোধন বিশেষ করে হুকুম আহকামের সম্বোধন কেবল মানবজাতির প্রতি করা হয়েছে। যেমন নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি ফিরিশতাগণের উপর ফরয নয়। কিন্তু আদব কায়দার আয়াত সমূহে সবাইকে সম্বোধন করা হয়েছে।

দেখুন, আল্লাহ্ তাআলা ফরমায়েছেন, আমার মাহবুবের অগ্রগামী হয়ো না, ওনার আওয়াজ থেকে তোমাদের আওয়াজ উঁচু কর না বা ওনার ঘরে বিনা অনুমতিতে যেও না ইত্যাদি। এসব আয়াতে মানুষ জ্বিন, ফিরিশতা সবাই অন্তর্ভূক্ত। হযরত আজরাঈল আলাইহিস সালামও হুযূরের বিনা অনুমতিতে না ঘরে প্রবেশ করেছেন, না জান কবজ করেছেন।

یہ ادب کہ بلبل بے نوا + کبھی کھل کے کرنہ سکے نوا !

نہ ھوا کی تیزروش روا + نہ چھلکتی نہروں کی دھارھے

بہ ادب جھکا لو سر ولا + کہ میں نام لوں گل وباغ کا

گل تر محمد مصطفے + چمن ان کا پاک دیار ھے

মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ফলেফুলে ভরপুর বাগানের এমন শান যে এখানে বুলবুল পাখি উচুস্বরে গান করে না, বাতাস জোরে বহে না, নদীনালা ধীর গতিতে প্রবাহিত হয়। মানব জাতির জন্য এ বাগান মহা পবিত্র স্থান।

এখানেও–لَاتَقُوْلُوْا (বলা না) এর মধ্যে মানুষ, জ্বিন ফিরিশতা সবাইকে সম্বোধন করা হয়েছে।। খবরদার! এ রকম বেআদবী কর না, আল্লাহ্‌র পথে শহীদগণকে মৃত বল না।

مَنْ يُّقْتَلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ (যে আল্লাহ্‌র রাস্তায় মারা যায়) قَتَلْ (কতল)

শব্দটা قِتَلْ (কেতল) শব্দের বিপরীত। অভিধানে قَتَلْ (কতল) এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে মোছড়ান; সজ্জিতকরণ এবং قِتَلْ (কেতল) এর অর্থ হচ্ছে চর্ম খসে যাওয়া, খোলা। পারিভাষিক অর্থে শরীরের গঠন বিকৃত করে জান বের করাকে কতল বলে। তলোয়ার গুলি, লাঠি, পাথর ইত্যাদি দ্বারা মেরে জান বের করে দেয়া কতলের অন্তর্ভূক্ত বরং কাউকে বিষপান করায়ে মেরে ফেলাটাও কতলের মধ্যে গণ্য হয়।

তাই খায়বরে বিষ খাওয়ানোর দ্বারা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ওফাত এবং ছুর পাহাড়ের গুহায় সাপে কাটা বিষের দ্বারা হযরত ছিদ্দিকে আকবরের ওফাত হওয়াটাও এর অন্তর্ভূক্ত। আল্লাহ্‌র রাস্তা বলতে ও সমস্ত আকাইদ ও আমলকে বুঝায়, যে গুলো গ্রহণ করার দ্বারা আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছা যায়। সুতরাং আকাইদের অনুসরণ পূর্বক নামায, আযান, কুরবাণী ইত্যাদি ধর্মীয় নিদর্শন সমূহের হেফাজতের জন্য যে ব্যক্তি মারা যায়, সে এর অন্তর্ভূক্ত।

উল্লেখ্য যে, ফিকাহশাস্ত্রে জুলুলপূর্বক নিহত প্রতিটি আকেল বালেগ মুসলমান শহীদ হিসেবে গণ্য, যদিওবা নিজের জানমাল হিফাজতের জন্য মারা যায়। ওকে গোসল ও কাফন দেয়া হবেনা। কিন্তু আল্লাহ্‌র পথে নিহত ব্যক্তির মর্যাদা অনেক উর্ধে। এ জন্য এখানে আল্লাহ্‌র পথের শর্তারোপ করা হয়েছে। ইসলামে হুকমী শহীদ অগণিত। যেমন মুসাফির সফরে মারা গেলে শহীদ, মহিলা ঋতু শ্রাবের সময় মারা গেলে শহীদ এবং যে প্রতিদিন মৃত্যুকে স্মরণ করে, সেও শহীদ ইত্যাদি। এসব লোক কাল কিয়ামতে শহীদদের কাফেলায় উঠবে।

بَلْ اَحْيَاءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ (বরং তারা জীবিত কিন্তু তোমরা অবহিত নও) শহীদগণের জিন্দেগী সম্পর্কে আজকাল মুসলমানদের মধ্যে তিন ফেরকা রয়েছে–এক ফেরকার মতে ওফাতের পর নবী ওলী শহীদ কেউ জীবিত নয়। নিম্নের আয়াত ওদের প্রধান দলীলঃ

আল্লাহ তাআলা ফরমান اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ

(হে মাহবুব, আপনার ওফাত হবে এবং ওদের সবারও) আরও ইরশাদ ফরমান كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ (প্রত্যেক জানকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে) আরও ফরমান

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (যা জমীনে আছে, তা ধ্বংশশীল) এ আয়াত সমূহে নবী ওলী ও শহীদকে বাদ দেয়া হয়নি। এ আয়াত সমূহ নিয়ে এসব লোকেরা অনেক ধোকা খেয়েছে। কোন সময় বলে যে ওদের রূহসমূহ জীবিত, শরীর নয়, কোন সময় বলে ওনাদের কাজ জীবিত অর্থাৎ ওনারা দীনের জন্য শহীদ হয়েছে এবং দীন জীবিত রয়েছে। তাই যেন ওনারাই জীবিত অর্থাৎ ওনারা দীনের জন্য শহীদ হয়েছে এবং দীন জীবিত বিধায় ওনারা জীবিত।

কিন্তু এ সব চিন্তাবিদদের কাছে জিজ্ঞাস্য যে যদি উল্লেখিত আয়াতের এ অর্থ হয়, তাহলে শহীদগণের শর্ত কেন আরোপ করা হলো? কিমামতের দিনতো প্রত্যেক মৃত ব্যক্তি জীবিত হবে এবং মৃত্যুর পর প্রত্যেকের রূহ জীবিত থাকে এবং সদ্‌কায়ে জারিয়াকারীদের কাজ জীবিত থাকে। অধিকন্তু অন্য আয়াতে শহীদগণের জিন্দেগী এভাবে বর্ণিত হয়েছে–وَلَاتَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا م بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ٥ فَرِحِيْنَ بِمَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا يَحْزَنُوْنَ ٥

তরজুমাঃ যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়েছে, তাদেরকে কখনও মৃত মনে কর না। বরং তারা জীবিত এবং তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তারা জীবিতা প্রাপ্ত। আল্লাহ্‌তাআলা নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন, তাতে তারা আনন্দিত এবং তাদের পিছনে যারা এখনও তাঁদের সঙ্গে মিলিত হয়নি, তাদের জন্য আনন্দ প্রকাশ করে। এ জন্য যে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না।)

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ্ তাআলা ফয়সালা করে দিলেন যে আল্লাহ্‌র পথে শাহাদত বরণকারীকে মৃত মনে কর না। সে আল্লাহ্‌র কাছে জীবিত, জীবিকা পায়, আনন্দ প্রকাশ করে, দুনিয়াবাসীদের অবস্থা অবলোকন করে। এ আয়াতে ওদের কোন তাবিল চলতে পারেনা।

দ্বিতীয় ফেরকা বলে যে, শহীদগণকে আমরা জীবিত স্বীকার করি। কেননা কুরআন করীমে এ সম্পর্কে ঘোষণা আছে কিন্তু নবী ও ওলীগণের জীবিত থাকা

সম্পর্কে কোন প্রমাণ নেই। বরং ওনাদের মৃত্যু সম্পর্কিত আয়াত মওজুদ আছে। সুতরাং ওনারা কেউ জীবিত নন। এরা এতটুকু পর্যন্ত বলে থাকে যে যদি ওনারা জীবিত হয়, তাহলে ওনাদের গোসল কাফন কেন, ওনাদের মিরাছ কেন বন্টন হয়, ওনাদের স্ত্রীগণ অন্যজনের সাথে কেন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এ সব বিধান থেকে বুঝা যায় যে ওনারা জীবিত নন বরং মৃত।

তৃতীয় ফেরকার আকীদা হচ্ছে, নবীগণ, ওলীগণ, শহীদগণ ও কতেক ওলামায়ে কিরাম খোদার হুকুমে ওফাতের পর জীবিত আছেন। থাকবেই না বা কেন, যদি হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নামে প্রাণ উৎসর্গকারী শহীদ চির অমর, তাহলে যার অনুসারীর এ শান, উনি কিভাবে জীবিত না থাকতে পারেন। এটাই হচ্ছে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা। অধম এ প্রসঙ্গে নবী, ওলী ও শহীদগণের জীবন সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করার ইচ্ছা পোষণ করি।

জানা দরকার যে আল্লাহ্ তাআলা মানুষের মধ্যে দু'টি রূহ স্থাপন করেন– একটি রূহে সুলতানী যার হেড কোয়ার্টার হচ্ছে মস্তিষ্ক এবং যার দ্বারা মানুষ জাগ্রত থাকে। দ্বিতীয়টি রূহে হায়ওয়ানী; যার হেড কোয়ার্টার হৃদপিণ্ড এবং যার দ্বারা জিন্দেগী বলবৎ থাকে। এ দু'টি রূহ শরীরের শিরা উপশিরায় এমনভাবে বিস্তৃত যেমণ অঙ্গারে আগুন বা ফুলে রং ও সুগন্ধ। শরীর থেকে রূহে সুলতানীর বের হয়ে যাওয়াকে নিদ্রা বলে এবং রূহে হায়ওয়ানীর বের হয়ে যাওয়াকে মৃত্যু বলে। প্রথমে আমি নিজেদের ও আল্লাহ্র মকবুল বান্দাদের নিদ্রা সম্পর্কে আলোকপাত করছি। আমাদের রূহে সুলতানী আমাদের নিদ্রায় শরীরকে ত্যাগ করে বের হয়ে যায় এবং আমরা নিদ্রায় একেবারে বিভোর হয়ে থাকি। ফলে আমাদের অযুও ভেঙ্গে যায়। কোন কোন সময় স্বপ্নদোষও হয়ে যায় এবং আমাদের স্বপ্নের কোন নির্ভরশীলতাও নেই এবং নিদ্রাকালীন আমাদের শরীর সম্পর্কে হুঁশ থাকে না অর্থাৎ আমাদের রূহে সুলতানী নিদ্রায় আমাদের থেকে বের হয়ে যায় এবং শরীরকেও ত্যাগ করে।

হযরত আম্বীয়া কিরামের নিদ্রায়ও রূহে সুলতানী ওনাদের শরীর থেকে বের হয়ে যায় কিন্তু ওনাদেরকে ত্যাগ করে না এবং সদা সম্পর্ক কায়েম রাখে। যার কারণে ওনাদের নিদ্রায় অলসতা আসতো না। এ জন্য ওনাদের নিদ্রা অযুভঙ্গ করতো না। ওনাদের কোন সময় স্বপদোষ হতোনা। ওনাদের স্বপ্ন আল্লাহ্ তাআলার ওহী হিসেবে বিবেচিত হতো। মোট কথা ওনাদের উপর নিদ্রাবস্থায়ও

জাগ্রতাবস্থার আহকাম জারী থাকে। এমনকি ওনাদের স্বপ্ন দ্বারা শয়বী আহকামও রহিত হয়ে যায়।

দেখুন, নিষ্পাপ শিশুকে জবেহ করা প্রত্যেক ধর্মে হারাম। কিন্তু হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের স্বপ্ন সেই হুকুম রহিত করে দিল এবং তিনি স্বপ্নের ভিত্তিতে স্বীয় প্রাণ প্রিয় সন্তানকে জবেহ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। কিন্তু তা সত্বেও ওনাকে নিদ্রারত বলা হয় এবং ওনার উপর জাগ্রতদের অনেক আহকাম বলবৎ নয়। ওই সময় ওনার উপর না নামায ফরয, না তবলীগ, না সালামের জবাব এবং না জাগ্রতদের অন্যান্য আহকাম। এ সময় ওনাকে নিদ্রারতও বলা যায় আবার জাগ্রতও বলা যায়। তবে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য সহকারে। অতএব আমাদের ও পায়গম্বরগণের নিদ্রার মধ্যে পার্থক বুঝা গেল। এবার মৃত্যুর মধ্যেও পার্থক্য লক্ষ্য করুন।

ওনাদের রূহে হায়ওয়ানীও ওনাদের ওফাতের সময় শরীর থেকে বের হয়ে যায়। এ রূপ বের হওয়ার নাম মৃত্যু। এ দৃষ্টিতে ওনাদেরকে মৃত বলা হয়েছে এবং রূহ বের হয়ে যাবার কারণে ওনাদের বেলায় দাফন কাফনের আহকাম প্রয়োগ হয়েছে। কিন্তু আমাদের রূহ শরীর থেকে বের হয়ে যাবার পর শরীরের সাথে কোন সম্পর্ক রাখে না, ওটার কোন হেফাজত করে না, যার কারণে আমাদের শরীর একেবারে নিষ্প্রাণ হয়ে যায়। আমাদের জ্ঞান, দৃষ্টি শক্তি ও শ্রবণ শক্তি সব নিঃশেষ হয়ে যায়। ফলে দু'তিন দিনের মধ্যে শরীর পঁচে গলে যায় এবং আমাদের উপর মৃতদের আহকাম জারী হয়ে যায়। কিন্তু ওনাদের রূহ বের হয়ে যাবার পরও ওনাদের শরীরকে ত্যাগ করে না বরং ওগুলোকে রক্ষণাবেক্ষণ ও দেখা শুনা করতে থাকে। এ কারণে ওনাদের শরীর পঁচে গলে না এবং ওনাদের সমস্ত ক্ষমতা বহাল থাকে বরং কোন কোন ক্ষেত্রে পার্থিব জীবন থেকে অধিক শক্তিশালী হয়ে যায়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ওনারা মৃত নয় বরং জীবিত। এটার সমর্থন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর এ বাণীতে পাওয়া যায় فَاِنِّىْ اَمْرَاءٌ مَقْبُوْضٌ

অর্থাৎ আমার রূহ আবদ্ধনীয়। রূহের আবদ্ধ এক জিনিষ এবং রূহের ত্যাগ অন্য জিনিষ। অনুরূপ শরীর থেকে রূহ বের হয়ে যাওয়া এক জিনিষ এবং শরীর নিষ্প্রাণ হয়ে যাওয়া অন্য কিছু। আমি হায়াতুন নবী সম্পর্কে কুরআন, হাদীছ, ফিকাহ ও উম্মতের এক্যমত থেকে কয়েকটি দলীল পেশ করতেছি।

১নং দলীল (১) প্রত্যেক ভাষায় জীবিতদের জন্য এক ধরনের শব্দ এবং মৃতদের জন্য অন্য আর এক ধরনের শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন মৃতদের জন্য উর্দুতে

تھا আরবীতে كان ইংরেজীতে was বাংলাতে 'ছিল' এবং জীবিতদের জন্য উর্দুতে ہے ইংরেজীতে is ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। যেমন জীবিতদের বর্ণনা এ ভাবে করা হয় অমুক খুবই ভাল আলেম, দানশীল, নামকরা বাদ্‌শা বা উজীর কিন্তু মৃত্যুর পর বলা হয় অমুক খুবই ভাল আলেম বা দানশীল ছিল। মৃতদের বেলায় কেউ 'আছে' বল্‌ে না। যে আছে বলে ওকে মিথ্যুক বলা হয়। মোট কথা 'আছে' জীবিতদের জন্য এবং 'ছিল' মৃতদের জন্য প্রয়োগ হয়। এটা যখন বুঝে আসলো, তখন গভীরভাবে লক্ষ্য করুন যে ইসলামের কলেমা শরীফ হচ্ছে لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ الرَّسُوْلُ اللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ্‌র রসুল। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যাহেরী জিন্দেগীতেও সাহাবায়ে কিরাম এ কলেমা পড়েছেন। আযান ও নামাযেও এর সাক্ষ্য দেয়া হয়েছে এবং ওফাতের পর থেকে আজ পর্যন্ত কলেমা এটাই আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত এটাই থাকবে। যদি হায়াতুন নবী সঠিক নয়, তাঁর মৃত্যুর আকীদা পোষণ করা হয়, তাহলে সমস্ত মুসলমানের কলেমা, নামায, আযান সবই ভুল হয়ে গেল এবং সমস্ত লোক এ কলেমার বেলায় মিথ্যুক হয়ে গেল বরং এখন কলেমা এ রকম হওয়া উচিৎ ছিল– كَانَ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلَ اللّٰهِ

(মুহাম্মদ মুস্তাফা আল্লাহ্‌র রসূল ছিলেন)

জনাব, মানুষ মুসলমান পরে হয়, আযান ও নামায পরে আদায় করে কিন্তু হায়াতুন নবী প্রথমেই মেনে নেয়া হয়। হায়াতুন নবী বিষয়টা ঈমান, নামায ইত্যাদির মূল।

২নং দলীলঃ কুরআন করীম ফরমান- وَلَا تَنْكِحُوْٓا اَزْوَاجَهٗ مِنْ بَعْدِهٖٓ اَبَدًا

অর্থাৎ আমার হাবীবের স্ত্রীগণকে ওনার পরে কখনো বিবাহ কর না। এ আয়াতে দু'ভাবে হায়াতুন নবী প্রমাণিত হয়, একেতঃ হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পর্দার অন্তরালে চলে যাবার পরও ওনার বিবিগণকে বিবি হিসেবেই গণ্য করা হয়েছে, যেমন বলা হয়েছে اَزْوَاجَهٗ

তাই বুঝা গেল যে হুযূরের ওফাতের পরও হুযূরের স্ত্রীগণ স্ত্রী হিসেবে রয়েছে। ওনাদের বিবাহ ভঙ্গ হয়নি। অথচ স্বামীর ইন্তেকালে বিবাহ ভঙ্গ হয়ে যায়। দ্বিতীয়তঃ মুসলমানদের জন্য ওনাদেরকে বিবাহ করা হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। কেননা ওনারা বিধবা নয়, ওনাদের স্বামী হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবিত আছেন।

অনেকে মনে করেন যে বিবাহ হারাম এ জন্য করা হয়েছে যে ওনারা মুসলমানদের মা। যেমন আল্লাহ তাআলা ফরমান وَاَزْوَاجُهٗٓ اُمَّهٰتُهُمْ

(ওনার স্ত্রীগণ ওদের মা) কিন্তু এটা ভুল ধারণা। কেননা ওনারা সম্মানের বেলায় মাতুল্য। আহকামের বেলায় নয়। কারণ ওনাদের মেয়েগণ মুসলমানদের বোন নয় এবং ওনাদের বোন বা ভাই মুসলমানদের খালা বা মামু নয়। ওনাদের থেকে পর্দা করা ফরয। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান

وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاۤءِ حِجَابٍ –

(যদি ওনাদের কাছে কিছু চাইবার থাকে, তাহলে পর্দার বাইর থেকে চান।

না ওনাদের মিরাছ মুসলমানগণ পায়, না মুসলমানগণের মিরাছ ওনারা পান। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর তালাক প্রাপ্ত বিবির সাথে অন্য মুসলমানদের বিবাহ হতে পারে। যেমন উম্মিমা বিনতে জাউনের বিবাহ্‌ হয়ে ছিল। আল্লাহ তাআলা ফরমান اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا –

অর্থাৎ হে বিবিগণ, তোমরা যদি দুনিয়াবী জিন্দেগী এবং শান শওকত কামনা কর, তাহলে এস, আমি তোমাদের শান শওকতের সুযোগ করে দি এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদেরকে তালাক দিই।

যদি তালাকের দ্বারা ও সব বিবিগণ অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে না পারে, তাহলে তালাক উনাদের জন্য মারাত্মক জুলুম হতো। কারণ ওনারা ঝুলন্ত অবস্থায় রয়ে যেতেন। এ জন্য আল্লাহ্‌ তাআলা ফরমায়েছেন,– مِنْ بَعْدِهٖٓ اَبَدًا

অর্থাৎ নবীর ইন্তেকালের পর ওনাদেরকে বিবাহ কর না। তাই সুস্পষ্ট ভাবে বুঝা গেল যে নবীজীর বিবিগণ সম্মান, আদর ইত্যাদির দিক দিকে মাতৃতুল্য বরং মা থেকেও অধিক সম্মানের পাত্রী। কিন্তু শরীয়তের বিধানে মা নয়। ওনাদের সাথে বিবাহ না হওয়াটার কারণ হচ্ছে যে হুযূর হায়াতুন নবী।

اس کی ازواج سے جائز ہو نکاح
اس کا تر کہ بٹے جوفانی ہے
روح تو سب کی ہے زندہ لیکن
ان کا جسم بھی روحانی ہے

অর্থাৎ ও সমস্ত ব্যক্তিদের স্ত্রীদের বিবাহ জায়েয, যাদের শরীর পঁচে গলে যায়। কিন্তু নবীগণের শরীর যেহেতু জীবিত, ওনাদের স্ত্রীগণ কারো জন্য জায়েয নয়।

৩নং দলীলঃ وَسْئَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَا

অর্থাৎ হে মাহবুব, বিগত নবীগণকে জিজ্ঞাসা করুন, আমি কি অন্য কোন মাবুদ বানিয়ে ছিলাম, যার ইবাদত করা যায়। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর প্রিয় হাবীবকে আদম থেকে ঈসা (আলাইহিস সালাম) পর্যন্ত সমস্ত নবীগণকে জিজ্ঞাসা করার নির্দেশ দিলেন। ওদের থেকেই কোন কিছু জিজ্ঞাসা করা যায়, যারা জীবিত এবং জবাবও দিতে পারেন। এ আয়াত থেকে নিম্নের মাছায়েল প্রমাণিত হয়ঃ

(১) সমস্ত নবীগণ জীবিত (২) ওনারা স্বীয় কববে আবদ্ধ নন, সমগ্র জগত ভ্রমণ করতে পারেন, জীবিত মকবুল বান্দাগণের সাথে কথাও বলেন, ওনাদের প্রশ্নসমূহের জবাবও দেন। কেননা উপরোক্ত আয়াতে এ রকম বলা হয়নি যে চিঠি বা টেলিগ্রামের মাধ্যমে ওনাদের থেকে জিজ্ঞাসা করে নিন। না নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওনাদের মাযারে কোন সময় গিয়ে ছিলেন। এর ভাবার্থ হচ্ছে হে মাহবুব, ওনারা আপনার কাছে আসা যাওয়া করে, আপনি ও ওনাদের সাথে দেখা সাক্ষাত করেন। মেরাজে ওনারা আপনার সাথে দেখা করেছেন, বিদায় হজ্বেও ওনারা যোগদান করেছেন। আপনি কোন এক সময় ওনাদেরকে জিজ্ঞাসা করে নিন। এ আয়াতটি হায়াতুল আম্বিয়ার জন্য এমন সুস্পষ্ট প্রমাণ, যেখান অন্যভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের কোন অবকাশ নেই। কেননা এ আয়াত দ্বারা না ওসব নবীগণের উম্মতের কাছে জিজ্ঞাসা করাটা বুঝায়, না ওনাদের কিতাব সমূহ থেকে অবহিত হওয়া বুঝায়। কেননা ওনাদের উম্মত বিলীন বা মুশরিক হয়ে গিয়েছিল এবং ওনাদের কিতাব সমূহও বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল বা পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল যার মধ্যে কুফর ও শিরকে ভরপুর ছিল।

৪নং দলীলঃ – مَادَلَّهُمْ عَلٰى مَوْتِهٖ اِلَّا دَآبَّةُ الْاَرْضِ الخ

অর্থাৎ সুলাইমান (আলাইহিস সালাম) এর ওফাত মাটির উই পোঁকা ছাড়া অন্য কেউ ওদেরকে বলেনি। এ উঁই পোকা তাঁর লাঠি খেয়ে ফেলেছিল। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে হযরত সুলাইমান (আলাইহিস সালাম) ওফাতের পর লাঠিতে হেলান দিয়ে এত দীর্ঘদিন দাঁড়িয়ে রইলেন যে সেই লাঠি পুরাতন হয়ে উঁই এর খোরাক হলো। অথচ এ দীর্ঘ সময়ে তাঁর শরীর মুবারকে না পঁচন ধরলো, না বিকৃত হলো। অতএব বুঝা গেল যে নবীগণের রূহ শরীর থেকে বের হয়ে যাবার পরও শরীরের হিফাজত করতে থাকে। এটার অর্থই জীবন।

৫নং দলীলঃ وَلَا تَقُوْلُوْا এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা সুস্পষ্টভাবে শহীদগণকে জীবিত বলেছেন। এ জিন্দেগীতে কোন প্রকারের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের

অবকাশ নেই। কেননা এখানে মৃতকে অস্বীকার করার পর بَلْ (বরং) দ্বারা জীবন্তের প্রমাণ দেয়া হয়েছে। ভাষাবিদগণের কাছে بَلْ এর অর্থ জানা আছে।

৬নং দলীলঃ – وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا

(যারা আল্লাহ্র পথে মারা গেছে, কখনো ওদেরকে মৃত মনে কর না) এ আয়াত ও খুবই শানদারের সাথে শহীদগণের হায়াত প্রমাণিত করছে। এতে অন্যভাবে ব্যাখ্যার কোন অবকাশ নেই।

৭নং দলীলঃ মিশকাত শরীফে 'ফযায়েলে জুমা' অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, জুমার দিন আমার প্রতি অধিক দরূদ পাঠ কর। কেননা তোমাদের দরূদ আমার সমীপে পেশ করা হয়। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, ইয়া রসুলল্লাহ, ওফাতের পর কিভাবে পেশ করা হবে। আপনার শরীর তো পঁচে গলে যাবে। ইরশাদ ফরমালেন, আল্লাহ্ তাআলা জমীনের জন্য নবীগণের শরীর সমূহ খাওয়াটা হারাম করে দিয়েছেন। আল্লাহ্র নবীগণ জীবিত থাকেন এবং তাঁদেরকে রিযিক দেয়া হয়।

৮নং দলীলঃ বর্ণিত আছে যে মিরাজ রজনীতে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুসা আলাইহিস সালামের মাযারের পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখলেন যে তিনি স্বীয় মাযারে নামায পড়তেছেন।

৯নং দলীলঃ জনৈক সাহাবী সফরের সময় কোন ময়মানে রাত্রি যাপন করছিলেন, তখন তিনি মাটির নীচ থকে সূরা মুলুকের তেলাওয়াতের আওয়াজ শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। যখন নবীর দরবারে উপস্থিত হলেন, তখন এ ঘটনা আরয করলেন। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ ফরমালেন, ওখানে কোন মুমিনের কবর আছে, যে জিন্দেগীতে সূরা মুলুক পড়ার অভ্যস্থ ছিল। সে মৃত্যুর পরও স্বীয় অভ্যাসে নিয়োজিত আছে।

১০নং দলীলঃ মিরাজ রজনীতে সমস্ত নবীগণের বায়তুল মুকাদ্দসে উপস্থিত হওয়া, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পিছনে নামায পড়া। আবার বিভিন্ন আসমানে বিভিন্ন নবী কর্তৃক হুযূরের অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত হওয়া অনেক হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত আছে।

১১নং দলীলঃ উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা ফরমান, যখন আমার কামরায় হুযূর নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও ছিদ্দিকে আকবর (রাদি আল্লাহু আনহু) সমাধিত ছিলেন, তখন আমি বিনা পর্দায় ভিতরে প্রবেশ করতাম। মনে করতাম যে একজন আমার স্বামী, অপর জন আমার পিতা। কিন্তু

যখন হযরত ওমর (রাদি আল্লাহু আনহু) কে এখানে দাফন করা হয়, তখন থেকে আমি বিনা পর্দায় ভিতরে প্রবেশ করতাম না। কারণ হযরত ওমরকে শরম লাগতো।

এ হাদীস সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে নবী ও ওলীগণ ওফাতের পরও জীবিত, জীবিতগণকে দেখেন, দুনিয়া পরিভ্রমণ করেন, এখানকার খবরাদি সম্পর্কে অবহিত থাকেন। ওনাদের গতি আমাদের দৃষ্টি ও ধারণার গতি থেকেও অধিক দ্রুতগামী।

১২নং দলীলঃ সাহাবায়ে কিরাম থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সমস্ত মুসলমানের আকীদা হচ্ছে হায়াতুন নবী, হায়াতুল ওলী ও হায়াতুশ শোহদা বরহক এবং অনেক আওলীয়া কিরামের দাফনকৃত শরীর শত শত বছর পরও এ রকম দেখা গেছে যেন সবেমাত্র দাফন করা হয়েছে। আমাদের গুজরাত জিলার নাওশোহরা শরীফে সৈয়দ মাখন শাহ সাহেবের কবর উম্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। প্রায় ৩৭০ বছর আগে তিনি ইন্তেকাল করেন। অথচ তাঁর কাফনে কোন ময়লার দাগ ছিল না। সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অবিকল এবং নরম ছিল। মনে হচ্ছিল যেন শুয়ে রয়েছেন। এ ঘটনা দেখার জন্য তিনমাস পর্যন্ত লোকের ভীড় ছিল। এ ধরনের ঘটনা বুখারী শরীফেও বর্ণিত আছে। জজবুল কুলুব ইত্যাদি ইতিহাস গ্রন্থেও বর্ণিত আছে যে আবদুল মালেক বিন মরওয়ানের যুগে রওজা পাকের দেয়াল পড়ে গিয়েছিল। ফলে একটি কবর ফেঁটে গিয়েছিল এবং একটি পায়ের গোছা দেখা যাচ্ছিল। লোকেরা ভয় পেয়ে গেল এবং মনে করলো যে এটা হয়তো নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হতে পারে। হযরত ওরওয়া বিন জুবাইর (রাদি আল্লাহু আনহু) দেখে বললেন, এটা হযরত ওমর ফারুকের পায়ের গোছা। দেয়াল পতিত হওয়া এবং তৈরী করার বর্ণনা বুখারী শরীফেও বর্ণিত আছে। এ ধরণের অগণিত ঘটনা রয়েছে। মোটঁ কথা কুরআনের আয়াত, হাদীছে নব্বী, আকায়েদে সাহারা ও অধিকাংশ উম্মতের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষ দর্শন দ্বারা হায়াতুন নবী, হায়াতুল ওলী ও থায়াতুশ শোহদা প্রমাণিত।

আয়াতের শেষাংশে ইরশাদ হয়েছে, وَلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ

(কিন্তু তোমরা জ্ঞাত নও) এতে সাধারণ মুসলমানগণের প্রতি সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ হে সাধারণ মুমিনগণ! ওনাদের হায়াতের জ্ঞান তোমাদের নেই।

যেমন জলন্ত বাতিকে কোন বড় ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখা হলে, বাতিতো স্বীয় জায়গায় আলোকিত আছে কিন্তু দর্শকদের জন্য সেই ঢাকনা প্রতিবন্ধক হয়ে

থাকে। ওনাদের হায়াত এ ধরনের উদাহরনের অনেক উর্ধে। যারা পবিত্র আত্মার অধিকারী, তাঁরা ওনাদের হায়াত প্রত্যক্ষ করেন, ওনাদের সাথে কথাবার্তাও বলেন।

পরিষেশে আমি ওসব লোকদের সন্দেহের অবসান ঘটাতে চাই, যারা ভুল বুঝাবুঝির কারণে এ বিষয়কে অস্বীকার করে। তাদের বক্তব্যে আজেবাজে কথা অনেক আছে তবে মূল আপত্তি হচ্ছে তিনটিঃ

১ম আপত্তিঃ ওসমস্ত আয়াত যা আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি এবং ওদের জবাব দিয়েছি। যেমন اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ

এবং এ জাতীয় অন্যান্য আয়াত।

দ্বিতীয় আপত্তিঃ যদি এ সব লোক জীবিত হয়, তাহলে এদের খানাপিনা কি? পানাহার ব্যতীত জীবন ধারণ অকল্পনীয়। এর জবাব অনেক আছে। একেতঃ কুরআনের আয়াত يُرْزَقُوْنَ অর্থাৎ ওনারা আল্লাহ্‌র মেহেরবাণীতে জান্নাতের নিয়ামত সমূহ খাচ্ছেন। দ্বিতীয়তঃ কোন কোন সময় মানুষের এমন অবস্থা হয়, তখন সে বাহ্যিক পানাহার থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

মায়ের পেটে শিশুর চার মাস বয়সে জানের সৃষ্টি হয়। কিন্তু জন্মগ্রহণ করে নয় মাসের পর। এ পাঁচ মাস সময়ে সে কি পানাহার করে। প্রস্রাব–পায়খানা কোথায় করে নিঃশ্বাস–প্রশ্বাস কোন দিক থেকে নেয়। এ সব বিষয় বোধগম্য নয়। ইমাম রাযী এক জায়গায় বলেন যে এ রহস্যটা বড় বড় দার্শনিকরাও উদ্‌ঘাটন করতে পারেনি যে শিশু এত দুর্বল হয় যে ওর নাকের উপর বা মূখে রুই রাখলে, শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যাবে। কিন্তু সেই শিশু মায়ের পেটে পর্দার অন্তরালে থাকে এবং জীবিত থাকে। এর থেকে আরও আশ্চর্যকর বিষয় হলো মুরগীর বাচ্চা ডিমের মধ্যে থাকে, যার মধ্যে ছিদ্র নেই কিন্তু জীবিত থাকে।

আসহাবে কাহাফ হাজার হাজার বছর শুয়ে আছেন এবং পানাহার বিনা জীবিত আছেন। ওনাদের জিন্দেগীতো কুরআনের সুস্পষ্ট দলীল দ্বারা প্রমাণিত আছে। হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) প্রায় দু'হাজার বছর যাবত আসমানে জীবিত আছেন। ওখানে কোন্ হোটেল রয়েছে? এ ভাবে ওনারাও জীবিত এবং এ দুনিয়াবী রিজিক থেকে স্বাধীন। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বেসালের রোযার সময় লাগাতার কয়েক দিন পানাহার করতেন না। সুলতানুল আরেফীন হযরত বায়যিদ বোস্তামী এক সময় তিনবছর যাবত পানি পান করেননি।

তৃতীয় আপত্তিঃ হযরত ওজাইর (আলাইহিস সালাম) একশ বছর পর্যন্ত নিষ্প্রাণ থাকার পর যখন জীবিত হলো, তখন মনে করলেন, আমি এক দিন বা এর থেকে কম সময় শুয়েছি। যেমন কুরআন করীম ইরশাদ ফরমানঃ

لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْبَعْضَ يَوْمٍ (বললেন আমি একদিন বা একদিনের কিছু অংশ শুয়েছি।

আসহাবে কাহাফ তিনশ নয়বছর নিদ্রামগ্ন থাকার পর যখন জাগ্রত হলেন, তখন বললেন আমরা দিনভর বা এর থেকে কম সময় শুয়েছি। এ সম্পর্কেও কুরআন মজীদে বর্ণিত আছে— قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْبَعْضَ يَوْمٍ

তাঁরা বললেন আমরা একদিন বা দিনের কিছু অংশ শুয়েছি।

বুঝা গেল যে নবী ও ওলীগণ ওফাতের পর এ জগত থেকে একেবারে বেখবর হয়ে যায়। এমনকি সূর্যের উদয় অস্ত, কালের বিবর্তন ওনাদের অজানা থাকে। কিন্তু আপনারা বলেন যে সব খবর রাখেন। আপনাদের এ আকীদা কুরআনের বিপরীত।

উত্তরঃ ওসব বুজুর্গগণকে আল্লাহ্ তাআলা এদিক থেকে অমনোযোগী করে তাঁর দিকে আকৃষ্ট করে রেখে ছিলেন। এটা বিশেষ ঘটনা মাত্র, স্বাভাবিক নিয়ম নয়। এতে সেই হেকমতসমূহ ছিল, যা কুরআন করীমে এ প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে যে ওনারা তাই মনে করে জনগণের সামনে এসেছেন। যেন লোকেরা ওনাদেরকে জীবিত দেখে কিয়ামতের বিশ্বাসী হয়ে যায়। যেমন ওজাইর (আলাইহিস সালাম) এর সামনে একশ বছর পর্যন্ত খাবার ও পানি রক্ষিত ছিল এবং বিনষ্ট হয়নি। খাবার এ রকম অবিকল থাকাটা কোন স্বাভাবিক নিয়ম নয় বরং একটি বিশেষ ঘটনা মাত্র।

এর উদাহরণ একেবারে এ রকম যে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফরমান, নিদ্রায় আমার চক্ষুদ্বয় ঘুমায়, আত্মা জাগ্রত থাকে। কিন্তু একবার সফরে সরকারে দুআলম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সমস্ত সাহাবার [illegible] ছিল যে ফজরের নামায কাযা হয়ে গিয়েছিল। যখন সূর্য উপরে উঠলো, তখন ঘুম ভাঙ্গলো। এ ঘটনার দ্বারা এটা বলা যাবে না যে নাউযুবিল্লাহ সরকার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সেই ফরমান ভ্রান্ত বরং এটাই বলা হবে যে যেহেতু আল্লাহ তাআলার অভিপ্রায় ছিল যে হুযূরের উম্মতগণ যেন কাযা নামায পড়ার নিয়ম জেনে নেয়, সেহেতু সেই রাত স্বীয় হাবীবকে তাঁর

দিকে আকৃষ্ট করে রেখে ছিল। এটা অলসতা ছিল না বরং ওদিকে আকৃষ্ট থাকায় এদিকে অমনোযোগী ছিলেন। এটা বিশেষ ঘটনা ছিল, স্বাভাবিক নিয়ম ছিলনা।

ছুফিয়ানা তফসীরঃ শরীরের জিন্দেগী জানের দ্বারা, জানের জিন্দেগী ঈমানের দ্বারা, দিলের জিন্দেগী আল্লাহ্র ইশ্ক দ্বারা এবং নফ্সে আম্মারার জিন্দেগী কুফর ও বিদ্রোহ দ্বারা কায়েম থাকে। নফ্সে আম্মারার জীবন দিল ও রূহের মৃত্যু। এ জন্য একে মেরে ফেলার নির্দেশ রয়েছে। আগাছার জীবন ক্ষেতের মৃত্যু। এ জন্য কৃষকেরা এ আগাছার বিনাশসাধন করে। শেখগণ সব সময় স্বীয় মুরীদগণের প্রতি দৃষ্টি রাখেন, মুজাহেদার তলোয়ার, ইবাদতের বর্শা এবং দুনিয়া ত্যাগের তীর দ্বারা নফ্সে আম্মারাকে সব সময় মৃত রাখেন, মাওলানা রুমী ফরমান—

پیر را بگزیں کہ بے پیرایں سفر + ہست بس پرآفت وخوف وخطر

چوں گرفتی پیر ہیں تسلیم شو + ہمچوموسی زیر حکم خضررو

گرچہ کشتی بشکند تودم مزن + گرچہ طفلے راکشد تومومکن

অর্থাৎ হে দূর পাল্লার পথিক, মুর্শেদ (পথ প্রদর্শক) ধর। কেননা মুর্শেদ ব্যতীত এ দুর্গম পথ চলা দুষ্কর। মুর্শেদ যখন ধরলেন, তখন তাঁর আনুগত্য কর যেমন মুসা আলাইহিস সালাম করেছিলেন খিজির আলাইহিস আলামের আনুগত্য। যদিওবা তিনি নৌকা ভেঙ্গে দেন, কোন প্রতিবাদ করো না। অবোধ শিশুকে জবাই করে দিলে আপত্তি কর না।

ছুফিয়ানে কিরাম বলেন, এ আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে, হে মুসলমানগণ! ও সমস্ত লোকগণকে মৃত বল না, যাদের নফ্সে আম্মারা ইশ্কে ইলাহীর পথে মুজাহিদগণের তলোয়ার দ্বারা কতল বা বিলীন হয়ে গেছে বরং ওনারা চিরদিনের জন্য জীবিত হয়ে গেছেন। কেননা ওনাদের রূহ ও দিলের স্থায়ী জিন্দেগী অর্জিত হয়েছে, যাদেরকে মৃত্যুর ফিরিশতাও বিলীন করতে পারবে না। অবশ্য আমাদের কাছে ওনাদের জিন্দেগীর উপলব্ধি নেই। কেননা মস্তিষ্কের চক্ষু দ্বারা কেবল শরীরের জিন্দেগী দেখা যেতে পারে। কিন্তু অন্তরের চক্ষু দ্বারা দিল ও রূহের জিন্দেগী দেখা যায়। যদি তোমরা সেই শহীদের জিন্দেগী দেখতে চাও, তাহলে অন্তরের চক্ষু সৃষ্টি কর।

সোনা চুর্ণ হয়ে অনেক রোগের শেফা দেয়। এ আশেকগণ শহীদ হয়ে হাজার শহীদকে জিন্দেগী দান করে। এ জন্য আল্লাহ তাআলা জীবন্ত কাফিরদেরকে মৃত বলেছেন اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَاءٍ (তারা জীবিত নয়, মৃত) আর ওসব শহীদগণকে জীবিত সাব্যস্থ করেছেন। কেননা ওনাদের রূহ ও দিল জীবিত ছিল কিন্তু ওনাদের নফ্সে আম্মারা মৃত। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যেন এ ধরনের জিন্দেগী নসীব করেন।

বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রাহীম

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِى الْكِتٰبِ (٧) اُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ ٥

তরজুমাঃ নিশ্চয় ওসমস্ত লোক, যারা আমার অবতীর্ণ কিতারের স্পষ্ট আয়াতসমূহ ও হিদায়েত সমূহ গোপন করে, যেগুলো আমি ওসব লোকদের জন্য কিতাবে বর্ণনা করেছিলাম। এরা ওসমস্ত লোক, যাদের উপর আল্লাহ্ লানত এবং সমস্ত লানতকারীগণেরও।

যোগসূত্রঃ আগের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে যেহেতু সাফা ও মরওয়া পাহাড় আল্লাহ্ তাআলার নিদর্শন সমূহের অন্যতম, সেহেতু ওগুলোর উপর বিভিন্ন দেবদেবী স্থাপন করলেও ওগুলোর মর্যাদা খর্ব হয় না। এখন বলা হচ্ছে যে অনুরূপ হুযূর নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যিনি ঈমানের কাবা, আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সাফা পাহাড় এবং রহমতের মরওয়া পাহাড়, ওনার শানমান না কেউ গোপন করতে পারে, না বিলীন করতে পারে, না খর্ব করতে পারে।

শানে নযুলঃ আজ প্রায় চৌদ্দশ বছর অতিক্রান্ত হলো যে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পর্দার অন্তরালে চলে গেলেন। কিন্তু তাঁর আলোচনা পর্যালোচনা পুরানো হয়নি এবং হ্রাসও পায়নি। বড় বড় বাদ্‌শাদের আলোচনা ওদের মৃত্যুর পর এক সপ্তাহ কিংবা দু'সপ্তাহ পর্যন্ত চালু থাকে। কিন্তু যেটাকে যুগের বিবর্তনে বিলীন করতে পারেনি, সেটা হচ্ছে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর গুণাবলীর চর্চা। হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) থেকে শুরু করে হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) পর্যন্ত সমস্ত নবীগণের যুগে হুযূরের নাম ও উৎকৃষ্ট গুণাবলীর ব্যাপক প্রচার হয়েছিল। তাওরীত, ইন্‌জিল ইত্যাদি কিতাবে তাঁর প্রসংশা করা হয়েছে, যা কুরআন শরীফের অনেক আয়াত দ্বারা প্রমাণিত আছে। মদীনার ইহুদীরাও তাঁর আগমণের সুসংবাদ লোকদেরকে দিত এবং তাদের ধারণা ছিল যে শেষ যুগের নবী বনী ইস্রাঈল থেকে হবে, ফলে ওদের ইজ্জত সম্মান অনেক বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু যখন বনী ইসমাইলে তাঁর আবির্ভাব হলো, তখন ওরা হিংসায় একেবার জ্বলে গেল এবং তাওরীত ও ইন্‌জিলের ওসমস্ত আয়াত, যেগুলোতে হুযূরের (সঃ) উত্তম গুণাবলীর বর্ণনা ছিল, সেগুলো গোপন করতে ও পরিবর্তন করতে লাগলো এবং বলতে লাগলো, এটা সেই নবী নয়, যার অপেক্ষায় আমরা আছি। একবার কয়েক জন সাহাবা ইহুদী আলেমদের কাছে গিয়ে ওদেরকে শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, সত্য বল, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া

সাল্লাম) এর বর্ণনা তোমাদের কিতারে আছে কিনা। ওরা বিনা দ্বিধায় অস্বীকার করলো এবং বললো, মোটেই উল্লেখিত ছিল না। তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়।

তাফসীরঃ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ (নিশ্চয় যারা গোপন করে) আল্লাহ্ তাআলা জানতেন যে হুযূরের এ প্রসংশাসুচক আয়াতের অর্থ এদিক সেদিককারী এবং তাঁর প্রসংশাকে প্রতিরোধকারী ইহুদী নাচারা এখনও মওজুদ আছে এবং ভবিষ্যতে স্বয়ং কলেমাগো মুসলমানদের মধ্যে সেই ফেরকার জন্ম হবে, যারা হুযূরের যিকরকে বাঁধা দিবে, এবং প্রসংশাসূচক আয়াত প্রকাশ করবে না বরং ওসবের অর্থ ও বিষয় পরিবর্তনের চেষ্টা করবে। এ জন্য يَكْتُمُوْنَ সার্বিকভাবে বলেছেন অর্থাৎ ওসমস্ত সব লোকই ঈসায়ী হোক বা ইহুদী হোক বা মুসলমানের পোষাকে মুনাফিক হোক, যারা এখন গোপন করছে বা ভবিষ্যতে গোপন করবে ওরা সবের, একই অবস্থা হবে, যা সামনে বর্ণিত হচ্ছে।

يَكْتُمُوْنَ শব্দটি كَتَمَ থেকে তৈরী করা হয়েছে। كَتَمَ এর অর্থ হচ্ছে গোপন করা। ستر (সতর) এর অর্থও গোপন করা। কিন্তু দু'টির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। গোপন করার উপযোগী বিষয় গোপন করাকে ستر (সতর) বলে এবং প্রকাশ করার উপযোগী জিনিস গোপন করাকে كتم (কতম) বলে। ستر (সতর) প্রশংসনীয় এবং كتم (কতম) দোষনীয়। এ জন্য আল্লাহ্‌র এক নাম সাত্তার, কত্তাম নয়।

আল্লাহ্ তাআলা কতেক জিনিসকে গোপন রাখার জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং কতেক জিনিষকে প্রকাশ করায় জন্য। আমাদের শরীরে চেহারা দেখানোর জন্য এবং লজ্জাস্থান গোপন করার জন্য। লজ্জাস্থান ঢেকে রাখাটা হচ্ছে শালীনতা এবং বিনা কারণে চেহারা ঢেকে রাখাটা হচ্ছে নির্বুদ্ধিতা। যেহেতু হুযূরের জাত ও সেফাত আল্লাহ্‌র নূর, সেহেতু নূরকে গোপন করাটা দোষণীয়। এ জন্য আল্লাহ্ তাআলা يكتمون ফরমায়েছেন يسترون ফরমাননি।

مَا اَنْزَلْنَا বলতে তাওরীত, ইনজিল ইত্যাদি গ্রন্থ বুঝানো হয়েছে এবং بَيِّنَات ও هُدٰى ইত্যাদি দ্বারা এ সব কিতাব সমূহের প্রসংশনীয় আয়াত সমূহকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা এ আয়াতে তিনটি গুণ বর্ণনা করেছেন– সুষ্পষ্ট হওয়া, হেদায়েত পূর্ণ হওয়া এবং মানুষের জন্য অবতীর্ণ হওয়া।

بَيِّنَه ও ظاهر-جلى এ শব্দ তিনটি প্রায় একই অর্থবোধক কিন্তু পার্থক্য হলো যে ظاهر হলো, যেটা হালকা আবরণ বা মামুলী পর্দা দ্বারা গোপন হয়ে যায়, جلى হলো, যেটা মোটা পর্দা এবং কঠিন আবরণ দ্বারা গোপন হয়। কিন্তু

بَيِّنَه হচ্ছে, যেটা কোন আবরণ দ্বারা গোপন হয় না, যত মোটা আবরণ হোক না কেন, যেটা প্রতিটি আবরণকে তছনছ করে দেয়। ওটার বেলায় গোপনকারীদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। যেহেতু তাওরীত ও ইন্জিলের প্রসংশাসূচক আয়াতসমূহ এ তৃতীয় স্তরের ছিল, সেহেতু সমস্ত ইহুদী ও খ্রীষ্টানের চূড়ান্ত প্রচেষ্টার পর ও গোপন করতে পারেনি। এ জন্য بَيِّنَاتٌ বলা হয়েছে।

আয়াতে আহ্‌কামতো রহিত ও পরিবর্তন হয়ে গেছে। কিন্তু প্রসংশাসূচক আয়াত না রহিত হতে পারে, না পরিবর্তন। হবেই বা কিভাবে; আল্লাহ্ তাআলা ও সমস্ত আয়াত কুরআন শরীফে নকল করে স্থায়ী করেছেন।

ওসব আয়াতকে هُدًى (হেদায়েতদানকারী) এ জন্য বলেছেন যে তাওরীত ও ইন্জিনের সমস্ত আহকাম রহিত হওয়ার আগে হেদায়েতদানকারী ছিল। কিন্তু রহিত হওয়ার পর পথভ্রষ্টকারী হয়ে গেল। তবে ও সব কিতাবের তাওহীদ, সিফাতের আয়াতসমূহ এবং হুযূরের প্রসংশাসূচক আয়াতসমূহ আগেও হেদায়েতকারী ছিল এবং এখনও হেদায়েতকারী হিসেবে আছে। ওগুলোর উপর রহিতের হুকুম বর্তায় না। রহিত তখন হতে পারে, যখন খোদা না থাকে বা হুযূর মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) না থাকে। আয়াতের পরবর্তী অংশে বর্ণিত হয়েছেঃ مِنْۢ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ

অর্থাৎ আমি ওসব আয়াতসমূহ লোকদের জন্য বর্ণনা করেছিলাম। এর ভাবার্থ বুঝার জন্য আগে একটি কথা এভাবে বুঝে নিন, যেমন দুনিয়ার সমস্ত নিয়ামত খোদা প্রদত্ত কিন্তু ওগুলোর মধ্যে কতেক নির্দিষ্ট, যার ফায়দা নির্দিষ্ট লোকেরা ভোগ করে এবং কতেক অনির্দিষ্ট, যার ফায়দা সার্বিকভাবে সকল মখলুক ভোগ করে। দেখুন, গরীবদের কুঁড়ে ঘরে চেরাগ, ওদের থেকে একটু স্বচ্ছল লোকদের ঘরে হারিকেন এবং ধনীদের কুটিরে বিদ্যুত বাল্ব শোভা পায়। এ সব আল্লাহ্‌র বিশেষ নিয়ামত বিশেষ বিশেষ লোকদের জন্য। কিন্তু চাঁদ ও সূর্য তাঁর সার্বজনীন নিয়ামত, যার থেকে আমীর গরীব সবাই ফায়দা ভোগ করে। এ রকম প্রতিটি ক্ষেতের কূয়া আল্লাহর নিয়ামত কিন্তু নির্দিষ্ট, কেননা প্রতিটি কূয়া স্বীয় মালিকের ক্ষেতকে জলদান করে কিন্তু বৃষ্টির পানি সার্বিক নিয়ামত, যা কোন আমীর গরীবের পার্থক্য করে না। এ রকম বলা যেতে পারে যে চেরাগ গরীবদের জন্য এবং বিদ্যুত বাতি ধনীদের জন্য কিন্তু চাঁদ সূর্য সবার জন্য। কূয়া কূয়ার মালিকের জন্য কিন্তু বৃষ্টি সমস্ত লোকের জন্য। যখন পার্থিব নিয়ামত সমূহের উদাহরণ বুঝে নিলেন, এবার রূহানী নিয়ামত অর্থাৎ আসমানী কিতাবের উদাহরণও বুঝে নিন। এর কতেক আয়াত কাফিরদের জন্য হয়ে থাকে, কতেক আয়াত গুণাহ্‌গার

মুমিনদের জন্য, কতেক আয়াত নেক্‌কার ভাগ্যবানদের জন্য, কতেক আয়াত কেবল নবীর জন্য। কিন্তু সমস্ত আয়াতকে সবাই মান্য করবে। তবে আমলের বেলায় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে করবে এবং সম্পর্কটাও ভিন্ন ভিন্নভাবে হবে। দেখুন, আল্লাহ্ তাআলা ফরমান, 'হে লোকগণ! স্বীয় সৃষ্টিকর্তার উপর ঈমান আন। এখানে সম্বোধন কাফিরদের প্রতি করা হয়েছে। কেননা মুসলমানগণতো প্রথমেই ঈমান এনেছে। অন্য আর এক জায়গায় ফরমান, 'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর। এখানে গুনাহগারদের প্রতি সম্বোধন করা হয়েছে। 'হে ঈমানদারগণ! নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর।' নামাযের সম্পর্ক শিশু, পাগল ও নাপাক স্ত্রী–পুরুষ ব্যতীত বাকী সমস্ত মুসলমানের সাথে। যাকাতের সম্পর্ক ধনীদের সাথে। 'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে।' এর সম্পর্ক মুসাফির, শিশু, নাপাক মহিলা ও পাগল ব্যতীত বাকী সমস্ত মুসলমানের সাথে। 'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর হজ্ব ফরয'। হজ্বের সম্পর্ক ওসব ধনীদের সাথে যাদের হজ্ব করার সামর্থ হয়। ইয়াসীন, তোয়াহা, আলিফলাম বা এ জাতীয় দূর্বোধ্য শব্দের সম্পর্ক কেবল নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে। জিব্রাঈল আমীনও এর অর্থ জানে না। قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ (হে মাহবুব বলুন, আমি তোমাদের মত মানুষ) اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ। (নিশ্চয় আমি যালিমদের অন্তর্ভূক্ত) رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا (হে আল্লাহ্! আমি নিজের উপর জুলুম করেছি) এ ধরনের আয়াতের সম্পর্ক কেবল নবীগণের সত্ত্বার সাথে এবং ওনাদের মুখে শোভা পায়। যদি অন্য কেউ ওনাদের সম্পর্কে এ শব্দসমূহ ব্যবহার করে, তাহলে সে ঈমান হারাবে।

এ সমস্ত আয়াত আল্লাহ্‌র কিতাবের মধ্যে আছে এবং সবই আল্লাহ্ তাআলার নিয়ামত। কিন্তু এগুলোর সম্পর্ক বিশেষ বিশেষ লোকের সাথে। কিন্তু হামদে খোদা ও নাতে মুস্তাফা সম্পর্কিত আয়াত সমূহ সূর্যের আলো ও বৃষ্টির পানির মত এমন সর্বব্যাপী নিয়ামত, যার সম্পর্ক আল্লাহ্‌র প্রতিটি মখলুকের সাথে। এ জন্য আল্লাহ্ তাআলা আহকামের আয়াত সমুহে প্রায় সময় মুসলমানগণকে সম্বোধন করেছেন এবং হুযূরের আবির্ভাব সম্পর্কিত আয়াত সমূহে প্রায় সময় সমস্ত লোকদেরকে সম্বোধন করেছেন। যেমন– يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ (হে লোক সকল! তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট দলীল (নবী) এসেছে।

وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ (আপনাকে সারা বিশ্বের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি) এ আয়াত থেকে বুঝা গেল যে হুযূরের রহমত আল্লাহ্‌র খোদায়ীত্বের মত বিশ্বব্যাপী।

যখন এটা বুঝলেন, আয়াতের ভাবার্থ পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ হয়ে গেল অর্থাৎ হে ইহুদী ও খৃষ্টানগণ! আমি আমার হাবীবের প্রসংশার আয়াতসমূহ তাওরীত ও ইন্‌জিলে সমস্ত লোকের জন্য বর্ণনা করেছিলাম; এগুলোকে গোপন করা বা বদলানোর তোমাদের কি অধিকার আছে। অবশ্য তাওরীত ও ইন্‌জিলে আহকাম সম্পর্কিত আয়াতসমূহ তোমাদের জন্য ছিল। এগুলো অন্যদের কাছে পৌছানো বা না পৌছানো তোমাদের জিন্মায় ছিল। কিন্তু এ সূর্যের উপর পর্দা দেয়ার জন্য কেন ব্যর্থ চেষ্টা করছ। মোটকথা ওসব লোকদের এ অপরাধের কথা বর্ণনার পর এবার এর শাস্তির বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। যেমন ইরশাদ ফরমান اُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ। وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ অর্থাৎ এরা ওসমস্ত লোক, যাদের উপর আল্লাহ্‌ তাআলা লানত করেন বা করবেন এবং সমস্ত মখলুক লানত করতে থাকবে।

লানতকারী যদি আল্লাহ্‌ হয়, তাহলে এর অর্থ হবে যে স্বীয় রহমত থেকে এমনভাবে দূরীভূত করা যে জীবনে ওদের হেদায়েত, মৃত্যুর সময় ঈমান, কবরের পরীক্ষায় কামিয়াবী, হাশরে নাজাত, এরপর দোযখ থেকে রক্ষা এবং জান্নাতে প্রবেশ নসীব না হওয়া। এ কঠিন শাস্তির কারণ হচ্ছে যে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সমস্ত রহমতের মূল। যখন ওনার সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করলো, তখন খোদার সমস্ত নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হলো। দেখুন, যদি বৃষ্টি না হয়, তাহলে শহর সমূহের সৌন্দর্য, ক্ষেত খামারের সজীবতা, বৃক্ষ সমূহের ফল, জীবন ধারনের জন্য শষ্য, কূপের পানি, সমুদ্রের প্রবাহ, পুকুরের নাব্যতা সব হাহাকার হয়ে যায়। এ রকম ওনার আস্তানা থেকে যদি বিতাড়িত হয়, তাহলে ঈমান, আধ্যাত্মিক জ্ঞান, খোদার রহমত সবকিছু থেকে বঞ্চিত হলো। আর যদি লানতকারী বান্দা হয়, তাহলে এর অর্থ হবে রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়ার বদদুআ করা অর্থাৎ ওসব লোকদের প্রতি খোদার লানত এবং সমস্ত মখলুক অভিসম্পাত দিতে থাকবে। স্মরণ রাখা দরকার যে হুযূরের দুশমনকে বালুকণা, সমুদ্রের প্রতিটি ফোঁটা, বৃক্ষের পাতা, সমস্ত ফিরিশতা বদদুআ দেয় বরং ওরা নিজেরাই নিজেদের উপর লানত করে। কাফিরেরাও বলে যে পাপীদের উপর খোদার লানত, অথচ তারা নিজেরাই পাপী।

কতেক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে হাশরের হিসেব নিকেশ হওয়ায় পর যখন কাফিরেরা দোযখে যেতে থাকবে, তখন প্রথমে ওদেরকে জাহান্নামের

দরজার সামনে দাঁড় করায়ে ওদের উপর সবার অভিশাপ দেয়া হবে। অতঃপর দোযখে পাঠানো হবে। ওখানে পৌছে ওদের এমন অবস্থা হবে যে প্রতিটি কাফির একে অপরকে লানত দিবে। যেমন আল্লাহ্‌ তাআলা ইরশাদ ফরমান

وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا (এবং একে অপরকে লানত করবে)

এর পরের আয়াতে দয়ালু আল্লাহ্‌ ওদেরকে রহমতের আশ্বাস দিয়েছেন। যেমন ইরশাদ ফরমান। اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَبَيَّنُوْا অর্থাৎ হ্যাঁ, যারা তওবা করে নেয়, বিকৃত বিষয়কে ঠিক করে দেয় এবং লুকায়িত আয়াত সমূহকে প্রকাশ করে দেয়, ওদের তওবা কবুল হবে। কেননা আল্লাহ্‌ তাআলা এখনও আছেন এবং দয়ালুও। অবশ্য কেবল মৌখিক তওবা যথেষ্ট নয় বরং এর জন্য তিনটি শর্ত রয়েছেঃ

এক, বিগত কাজের জন্য অনুতপ্ত হওয়া, দুই, লুকানো বা বদলানোর দ্বারা লোকের মধ্যে যে বদআকীদা বিস্তার লাভ করেছে, সেটার সংশোধন করা, তিন, লুকায়িত আয়াত সমূহের প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয়া। কেননা যেমন গুনাহ, তেমন তওবা। প্রকাশ্য গুণাহের প্রকাশ্য তওবা, লুকায়িত গুণাহের লুকায়িত তওবা। এ আয়াত দ্বারা কয়েকটি ফায়দা অর্জিত হয়েছেঃ

প্রথম ফায়দাঃ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রসংশাকে লুকানো, বা প্রসংশাসূচক আয়াতের অপব্যাখ্যা করে ওগুলোকে বিকৃত করা, তাঁর যিক্‌রকে তালবাহানা করে বাঁধা দেয়া জঘন্যতম কুফ্‌রী। এটা ওসব পাদরী ও পোপদের কাজ, যাদের উপর আল্লাহ্‌র ও সমস্ত মখলুকের অভিশাপ। এ আয়াত থেকে ওসব লোকেরা যেন শিক্ষা গ্রহণ করে, যারা খোদাভক্ত ও তাওহীদের সোল এজেন্ট সেজে নবীর প্রসংশাসূচক আয়াত সমূহ গোপন করাকে উৎকৃষ্ট তাওহীদী কাজ মনে করে। অথচ বাস্তব ব্যাপার হলো, যার মনে আজমতে মুস্তাফা নেই, তার কাছে তাওহীদও নেই। তাওহীদ হচ্ছে হারিকেনের একটি নূরানী ফিতা এবং রেসালত হচ্ছে এর রঙিন চিমনী। তাওহীদের নূরের সাথে সাথে রেসালতের রংও অপরিহার্য। কেউ যদি খাটি তাওহীদ চায়, যেখানে নাবুয়াতের রং নাই, সে শয়তানের ভক্ত।

দ্বিতীয় ফায়দাঃ আসমানী কিতাবসমূহ বিশেষ করে কুরআন শরীফকে মান্য করা এক কথা এবং জানা ও আমল করা অন্য কথা। দেখুন, কুরআন করীমের প্রতিটি শব্দ প্রত্যেক মুমিন কর্তৃক মান্য করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু জানা বা আমল করার জন্য অবতীর্ণ হয়নি। যেমন মুতশাবিহাত ও বেদসমূহের আয়াত সমূহ আমাদের আমলের বাইরে, রহিত আয়াতসমূহের উপরও আমল করা

অসম্ভব। এ জন্য আল্লাহ্ তাআলা بَيَّنَّهُ لِلنَّاسِ বলেছেন অর্থাৎ আমি সেই প্রসংশামূলক আয়াতসমূহ লোকদের মান্য করা ও জানার জন্য বর্ণনা করেছি। প্রায় জিনিষে এ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আমরা আমাদের শরীরের অঙ্গসমূহকে স্বীকারও করি এবং জানিও কিন্তু রূহকে স্বীকার করি, তবে কি রকম জানিনা। তাজা গাছের পাতা, ফুল, ফলকে জানিও, মানিও কিন্তু এর আভ্যন্তরীন রস, যেটার উপর এর সজীবতা নির্ভরশীল, মানি তবে জানি না। বিদ্যুতের ফিটিং, বাল্ব, তার ইত্যাদি আমরা জানিও, মানিও কিন্তু পাওয়ারকে মানি, অথচ কি জিনিষ জানিনা। এ ভাবে আল্লাহ্র কিতাবের সমস্ত আয়াতসমূহ মান্য করা হয়।

তৃতীয় ফায়দাঃ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নবী হওয়া, ওনাকে নবী বলা, ওনাকে নবী বলানো এ তিনটি ভিন্ন বিষয়। এগুলোর যুগ ও ভিন্ন ভিন্ন। এটা জানা নেই যে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখন থেকে নবী। এতটুকু জানা গেছে যে যখন আদম (আলাইহিস সালাম) পানি ও কাদায় বিলীল ছিলেন, তখনও হুয়ূর নবী ছিলেন। হাদীস শরীফে তাই বর্ণিত আছে। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চির দিন নবী থাকবেন অর্থাৎ হুযূরের নাবুয়াতে শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই অর্থাৎ নাবুয়াত অস্থায়ী নয় বরং চিরস্থায়ী। হুযূরকে নবী বলার ব্যাপারে সুচিন্তিত অভিমত হলো যখন থেকে মখলুকের সৃষ্টি হয়েছে, তখন থেকে হুযুরকে নবী বলা হয়েছে।

ফিরিশতাগণ তাঁকে নবী বলেছেন, জান্নাতে তুবা বৃক্ষের পাতা সমুহের উপর, হাউজে কাউসারের পাত্র সমুহের উপর, গেলমানদের বুকের উপর, হুরগণের চোখের পূতলী সমূহে, জান্নাতের দরজাসমূহে, আরশ আযমের স্তম্ভে লিখা আছে لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ যেমন আদম (আলাইহিস সালাম) সৃষ্টি হয়ে চোখ খুলতেই আরশে আযমে কলেমা লিখিত দেখেছেন এবং পড়েছেন। আল্লাহ্ তাআলা ফরমান– اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ

আল্লাহ্ তাআলা সেই নবীর প্রতি রহমত প্রেরণ করছেন এবং ফিরিশতাগণ রহমতের দুআ প্রার্থনা করতেছেন। আল্লাহ্ তাআলা কখন থেকে রহমত প্রেরণ করছেন? যখন থেকে নূরে মুস্তাফা সৃষ্টি হয়েছে এবং ফিরিশতাগণ কখন থেকে দুআ করছেন, যখন থেকে ওনারা সৃষ্টি হয়েছেন। ঈসা (আলাইহিস সালাম) স্বীয় উম্মতকে বলেছিলেন– مُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِىْ مِنْۢ بَعْدِى اسْمُهٗٓ اَحْمَدُ ؕ

(আমি এমন রসুলের সুসংবাদ দিচ্ছি, যিনি আমার পরে আসবেন, ওনার নাম আহমদ অর্থাৎ ওনার আগমণ আমার পরে কিন্তু ওনি আজও রসুল এবং তাঁর নাম এখনও আহমদ।

এ আয়াতে করীমা, যেটার উপর আমি বক্তব্য রাখছি, বলা হয়েছে যে তাওরীত, ইন্জীল, যবুর ইব্রাহীমী ও নূহী সহীফা সমূহ সবগুলোতে হুযূরের নাবুয়াতের ঘোষণা ছিল। এর উদাহরণ একেবারে এ রকম ধরে নিন যে সূর্য সব সময় আলো দান করছে কিন্তু পৃথিবীর কোন অংশে দিন, কোন অংশে রাত। আবার যেখানে দিন, ওখানেও কোন অংশে ভোর, কোন অংশে দ্বিপ্রহর, কোন অংশে সন্ধ্যা। এ পার্থক্য সূর্যের গতিবিধির কারণে, তাপ বা আলোর কারণে নয়। অনুরূপ হুযূরের বেলাদত, হিজরত, মক্কী মদনী হওয়া, ওফাত হওয়া ইত্যাদি হুযূরের আগমণ ও গমণের নাম, অন্যথায় হুযূর বেলাদতের আগ থেকে নবী ছিলেন এবং অনন্ত কাল পর্যন্ত নবী থাকবেন।

یہ دونوں گھرنبی کے ہیں جہاں جی چاہا جا بیٹھے

کبھی اس گھر میں آبیٹھے کبھی اس گھرمیں جابیٹھے

অর্থাৎ উভয় জাহান হুযূরের ঘর। যখন যেখানে ইচ্ছে, সেখানে গিয়ে আরাম করেন।

হুযূরকে নবী বলানো সম্পর্কে আমার অভিমত হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলা ফিরিশতা, হুর, গেলমান, চাঁদ তারা, বালিকণা পানির ফোঁটা ইত্যাদিকে সৃষ্টি করার সাথে সাথে এ গুলোর দ্বারা হুযূরকে নবী বলানো শুরু করে দিয়েছিলেন। অতঃপর নবীগণ নিজ নিজ যুগে নিজ নিজ উম্মতগণ দ্বারা হুযূরকে নবী বলানো শুরু করে দিয়েছিলেন। উপরোক্ত আয়াত দ্বারা তাই বুঝা যায়। কিন্তু স্বয়ং নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বীয় বেলাদতের চল্লিশ বছর পর নিজেকে লোকের দ্বারা নবী বলায়েছেন।

মজার ব্যাপার হলো, এ চল্লিশ বছরের মধ্যে হুযূর আনোয়ার কাউকে বলেননি যে আমাকে নবী বল কিন্তু লাকড়ী, পাথর, পশু প্রকাশ্যভাবে হুযূরকে নবী বলতো। যেন আল্লাহ্ তাআলা বলছেন, আপনিতো চল্লিশ বছর পর স্বীয় নাবুয়াতের ঘোষণা দিবেন কিন্তু আমি আগ থেকে অন্যদের দ্বারা ঘোষণা দিচ্ছি। সূর্য পরে উদিত হয় কিন্তু যোহরা তারা আগেই এর আগমণের খরব দেয়। পূর্ব দিকের আলো, তাঁরা সমূহ আলোহীন হয়ে আগ থেকেই পৃথিবীকে সূর্যের আগমণের খবর দেয়, নাযামীদেরকে মসজিদে পৌছায়ে দেয়। আলসেদেরকে ধাক্কা দেয়, সতর্ক হয়ে যাও, সূর্য আসতেছে। মোট কথা, নাবুয়াতের যুগ এক জিনিষ এবং নাবুয়াত প্রকাশের যুগ আর এক জিনিষ।

চতুর্থ ফায়দাঃ দীনি প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ গোপন করা কুফরী। দেখুন, আল্লাহ্ তাআলা ওসব ইহুদী আলেমদের উপর লানত করেছেন, যারা দীনি প্রয়োজনীয় বিষয় গোপন করতো। সুতরাং আমাদের আকীদা হচ্ছে, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সমস্ত বিষয় উম্মতকে পৌছায়েছেন এবং কোন কিছু উম্মত থেকে গোপন করে নিয়ে যাননি। আল্লাহ্ তাআলা ঘোষণা করেছেনঃ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ (আজ তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিয়ামতকে সম্পূর্ণ করলাম) যদি দীন সম্পর্কিত কোন বিষয় গোপন থেকে যেত, তাহলে না দীন পূর্ণ হতো, না নিয়ামত সম্পূর্ণ হতো। যে ব্যক্তি এটা বলে যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হযরত আলী মরতুজার খেলাফতের ঘোষণা দিতে চেয়েছিলেন এবং কাগজে লিখে দিতে চেয়ে ছিলেন কিন্তু জনাব ওমরের বারণ করার কারণে লিখেননি, সে পূর্ণ বেঈমান। কেননা সে বাহ্যতঃ হযরত ওমরের বিরুদ্ধে আপত্তি করলেও মূলতঃ সে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর কতেক বিষয় গোপন করার অভিযোগ আরোপ করছে। আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে কতেক সাহাবার বিরোধীতা করতে গিয়ে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর আপত্তি কর না। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে দুনিয়ার কোন শক্তি যেখানে তাওহীদের ঘোষণা থেকে বিরত রাখতে পারেনি, সেখানে হযরত ওমরের কারণে এ হক কেন প্রকাশ করতে পারেনা। গভীর ভাবে লক্ষ্য করুন, কাগজ তালাশ করার ঘটনা বৃহস্পতিবার হয়েছিল এবং ওফাত এর পাঁচ দিন পর অর্থাৎ সোমবারে হয়েছিল। ধরে নিন, যদি হযরত ওমর বৃহস্পতিবার লিখতে বাঁধা দিয়ে থাকে, তাহলে এ পাঁচ দিন বাঁধা দানকারী কে ছিল? মনে হয় যে হুযূর কাগজের উপর সেই কথাটাই লিখতে চেয়েছিলেন, যেটার ব্যাপারে একাদিকবার ঘোষণা করেছিলেন এবং যেটা ওফাতের সময় বলেছিলেনঃ اَلصَّلٰوةَ وَمَامَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ অর্থাৎ নামাযের অনুসারী হও এবং নিজের অধীনস্তদের হক সমূহ আদায় কর।

পঞ্চম ফায়দাঃ পবিত্র আহলে বায়ত বিশেষ করে হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) কোন দীনি বিষয় কারো ভয়ে না গোপন করেছেন, না কোন অবস্থায় প্রকাশ করতে দ্বিধাবোধ করেছেন। কেননা দীনি বিষয় গোপন করার সেই পরিণতির কথা তাঁর জানা ছিল যা উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

যদি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মীরাছ বন্টনের উপযোগী হতো বা হুযূর আনোয়ার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জনাব আলী মরতুজাকে কোন বাগান, ক্ষেত, ঘর বা বৃক্ষের ওসীয়ত করে যেতেন, এবং পরবর্তীতে হযরত ছিদ্দিক আকবর, ওমর ফারুক, ওসমান গণী (রাদি আল্লাহু আনহুম) সেই হুকুমের বিপরীত করে থাকেন, তাহলে হযরত আলী নিশ্চয় ওনাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতেন, ওনাদের খেলাফত তিনি মেনে নিতেন না, ওসমস্ত জিনিষের দখল মেনে নিতেন না, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে স্বীয় হুজরায় দাফন করতে দিতেন না, জনাব ছিদ্দিক আকবর ও জনাব ওমর ফারুককেও বরং তিনি বলেদিতেন যে কবরস্থান ওয়াকফ্‌কৃত হয়ে থাকে এবং হুজরা হুযূরের ওয়ারীশগণের হক, আপনারা সেটাকে কবরস্থানে কেন পরিণত করছেন। যদি হযরত আলী এ সমস্ত বিষয় জেনে নীরবতা অবলম্বন করলেন বরং তিন খলিফার হাতে বায়াতও করলেন, তাহলে সেটা এ আয়াতের সম্পূর্ণ বিপলীত হলো।

সাহাবায়ে কিরামের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতে গিয়ে পবিত্র আহলে বায়তের দামনকে কালিমাযুক্ত না করা চায়। যদি হযরাত আহলে বায়তের হক কথার প্রমাণ দেখতে চান, তাহলে কারবালার ময়দানের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন, জনাব হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) যে পাপিষ্টকে খেলাফতের উপযোগী মনে করেননি, ওর মুকাবিলায় জান দিয়েছিলেন, বায়ত করেননি। কেননা ওনার সামনে এ আয়াত ছিল। তিনি জানতেন যে হক গোপনকারী লানতের শিকার হয়।

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَسَلَّمَ

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ
وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا
أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ
مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيٰحِ
وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

তরজুমাঃ নিশ্চয় আসমানসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে, নৌযানে, যা মানুষের উপকারে সমুদ্রে চলাচল করে এবং আসমান থেকে আল্লাহ্ তাআলা যে বারিবর্ষণ করে মৃত জমীনকে জীবিত করেন, তাতে এবং জমীনে সব রকমের পশুর বিস্তার লাভে, বায়ুর দিক পরিবর্তনে এবং পৃথিবীর ও আসমানের মাঝখানে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে জ্ঞানবানদের জন্য নিশ্চয় নিদর্শন সমূহরয়েছে।

যোগসূত্রঃ আল্লাহ্ তাআলা এর আগের আয়াতে তাওহীদের দাবী করেছিলেন যে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নেই। এ আয়াতে তাওহীদের দলীল সমূহ পেশ করা হয়েছে।

অন্য যোগসূত্রঃ আগের আয়াতে বলা হয়েছিল যে আল্লাহ্ তাআলা রহমানও এবং রহীমও। এ আয়াতে এর প্রমাণের জন্য তাঁর আটটি এমন নিয়ামত সমূহের উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলোতে আমাদের প্রচেষ্টার কোন হাত নেই, কেবল খোদায়ী দান। যেমন আসমান জমীনের সৃষ্টি ইত্যাদি।

শানে নাযুলঃ আরবের মুশরিকরা খোদার একত্বের কথা শুনে বিস্মিত হয়ে বলতো যে এত বড় পৃথিবীকে একক খোদা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, এর ব্যবস্থাপনার জন্য একাদিক খোদার প্রয়োজন, যারা একত্রিত ভাবে দুনিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে। ওদের এ ধারণাকে খণ্ডন করে এ পবিত্র আয়াত নাযিল হয়।

উল্লেখ্য যে আরবের মুশরিকদের এ বিস্ময় কেবল এ জন্যই ছিল যে ওরা পৃথিবীর বিশালতা দেখেছে কিন্তু খোদার কুদরতের উপর দৃষ্টি দেয়নি। কোন গেঁয়ো লোক মালগাড়ীর বোঝাই করা বাহাত্তর বগি দেখে বলেছিল, এত লম্বা গাড়ীকে একটি ইঞ্জিল কিছুতেই টানতে পারেনা। সে তখনও ইঞ্জিন দেখেনি এবং ইঞ্জিনের শক্তি সম্পর্কেও অবহিত ছিলনা। মুমীনগণ যারা আল্লাহ্র কুদরত সম্পর্কে জ্ঞাত, তাঁরা মনে করে যে এ রকম হাজার হাজার জগত আল্লাহ্র কুদরতের সামনে ঘাসের পাতার মত।

তাফসীরঃ আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় কুদরত প্রকাশের জন্য এখানে আটটি বিষয় উল্লেখ করেছেন। প্রথম বিষয় আসমান সমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টি। যেহেতু বাকী সব বিষয় এর পরে হয়েছে, সেহেতু ওসবের আলোচনা পরে করেছেন।

কাহিনীঃ ইমাম ফখরউদ্দীন রাযী কোন এক বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করলেন, খোদার কি অস্থিত্ব আছে? বৃদ্ধ বললো হ্যাঁ। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, এর প্রমাণ? বুড়ী বললো–আমার এ ছড়কা। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কীভাবে? বুড়ী বললো, যে পর্যন্ত আমি এটাকে না ঘুরাই, সেটা ঘুরে না। যখন ঘুরানোকারী ব্যতীত এ মামুলী চড়কা ঘুরতে পারে না, তাহলে এতবড় আসমান সমূহের চড়কা ঘুরানোকারী ব্যতীত কীভাবে ঘুরতেছে। ইমাম রাযী বললেন, ঠিক বলেছ। আচ্ছা বল দেখি, আল্লাহ্ এক, না একাধিক? বুড়ী বললো এক। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এর প্রমাণ? বললো, আমার এ চড়কা। জিজ্ঞাসা করলেন কীভাবে? বললো এ জন্য যে, যদি আমি একাকী ঘুরাই, তাহলে নিয়ম মাফিক ও ঠিকমত ঘুরে, কিন্তু এটা ঘুরাবার সময় যদি অন্য হাত লেগে যায়, তাহলে ঠিকমত ঘুরেও না এবং সূতাও তৈরী হয় না। একটি চড়কা দু'জন চালকের ফলে বিশৃংখ হয়ে যায়, তাহলে আসমান সমূহের চড়কা–চালক যদি দু'জন হতো, তাহলে ওগুলোর নিয়মনীতি বলবৎ থাকতো না এবং ভেঙ্গে পড়ে যেত। তাই আসমান জমীন আল্লাহ্ তাআলার একত্বের অতূলনীয় দলীল।

خَلَقَ শব্দের অর্থ অস্থিত্বহীন থেকে অস্থিত্ববান করা, অতূলনীয় সৃষ্টি করা, আবিষ্কার করা। এখানে প্রথম অর্থ হতে পারে। অর্থাৎ আসমান–জমীন সৃষ্টি করার মধ্যে নিদর্শন রয়েছে।

একটা বিষয় স্মরণ রাখা দরকার যে যদিওবা আসমানও সাতটি এবং জমীনও সাতটি কিন্তু প্রত্যেক আসমানের বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ভিন্ন এবং সমস্ত জমীন সমূহের বৈশিষ্ট্য এক অর্থাৎ মাটি। অধিকন্তু প্রতিটি আসমান অন্য আসমান থেকে পাঁচশ বছরের পথ দূরত্বে অবস্থিত এবং সমস্ত জমীন পিঁয়াজের ছিলকার মত একটি অপরটির সাথে এমনভাবে লেগে আছে যে দেখতে একটিই মনে হয়। এ জন্য আসমান সমূহকে বহুবচন এবং জমীন সমূহকে এক বচন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। আর আসমান যদিওবা জমীনের পরে সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু যেহেতু আসমান দাতা এবং জমীন গ্রহীতা আর দাতা গ্রহীতা থেকে আফজল হয়ে থাকে, সেহেতু আসমান সমূহের উল্লেখ আগে এবং জমীনের উল্লেখ পরে করা হয়েছে।

আল্লাহ্ তাআলা এ আটটি বিষয়ের প্রত্যেকটি সম্পর্কে বলেছেন যে এ গুলোর মধ্যে অগণিত নিদর্শন রয়েছে। সুতরাং আসমানেও অনেক নিদর্শন এবং জমীনেও অনেক নিদর্শন রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে থেকে কয়েকটি নিম্নে বর্ণনা করা হলোঃ

(১) আসমানের বিশালতা সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাই জানেন। এর ওজন কারো জানা নেই। জানবেই বা কীভাবে। ওটা কোন কিছুর উপর রক্ষিত নয়, কোন কিছুর সাথে ঝুলন্তও নয়। শুন্যের উপর আছে, পতিত হয় না। (২) এত যুগ পর্যন্ত কাজে নিয়োজিত আছে কিন্তু ক্ষয়ও হয় না, ভেঙ্গেও পড়ে না এবং মেরামতেরও প্রয়োজন হয়নি। মোট কথা সেটা যুগের প্রভাব থেকে মুক্ত।

(৩) আসমান সাতটি, প্রতি আসমানে একটি তারা রয়েছে এবং কুরসীতে অগণিত তারা আছে এবং আরশে আযম তারকারাজি থেকে মুক্ত। দার্শনিকগণতো এসব আসমান সমূহের গতিশীলতা স্বীকার করেন। আরশে আযমের গতি হচ্ছে চব্বিশ ঘন্টায় পূর্ণ এক চক্কর। এ গতির সাথে রাত দিন এবং তারা সমূহের উদয় অস্ত মাস, বছর ও যুগের সম্পর্ক রয়েছে। কুরসীর গতি এত ধীরস্থির যে এটা ছয় হাজার বছরে এক চক্কর দেয়। চতুর্থ আসমান যেটার উপর সূর্য অবস্থিত, এর গতি তিন শত ষাট দিনে এক চক্কর। প্রথম আসমান, যেটার উপর চন্দ্র অবস্থিত, আটাশ দিনে এক চক্কর করে। আবার এ গুলোর মধ্যে কোনটার গতি পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে এবং কোনটার গতি পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে। কিন্তু শরীয়ত এ ব্যাপারে নিশ্চুপ।

আল্লাহ্ তাআলা ফরমান كُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ প্রতিটি তারা স্বীয় আসমানে সাঁতার কাটে। অর্থাৎ আসমান সমূহের গঠন পাতলা, পানির মত এবং প্রতিটি তারা ওটাতে সাঁতরায়। এ রকমও হতে পারে যে আসমান গতিশীল এবং তারাসমূহও গতিশীল। প্রতিটি আসমান থেকে পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকারের ফয়েজ আসতেছে। যেমন চাঁদের আলোর প্রভাবে ফল ও দানায় দুধের সৃষ্টি হয়, সূর্যের আলো এ দুধকে জমাট করে এবং অন্যান্য তারার আলোতে বিভিন্ন প্রভাব পতিত হয়, কোনটার দ্বারা ফলসমূহের মধ্যে রং এর সৃষ্টি করে, কোনটার দ্বারা স্বাদ, কোনটার দ্বারা সুগন্ধ।

ابرو باد ومه وخورشید فلك در كاراند
تاتونانے بكف اری وبغفلت نخوری
همه از بهرتو سر گشته وفرمان بردار
شرط انصاف بناشد كه تو فرمان نه بری

অর্থাৎ হে মানব, আকাশ বাতাস, চন্দ্র–সূর্য সবই তোমারই সেবায় নিয়োজিত যেন এক মুটো অন্ন মূখে দিতে অসুবিধা না হয়। এত সবকিছু তোমার সেবায়

নিয়োজিত ও অনুগত। তাই এটা কি ন্যায় বিচার হবে, তুমি যদি মহাপ্রভুর অনুগত না হও।

পৃথিবী থেকে যে তারা যতটুকু দূরত্বে হওয়া প্রয়োজন ছিল, অতটুকু দুরত্বে স্থাপন করা হয়েছে। যদি সূর্য প্রথম আসমানে হতো, তাহলে ক্ষেত সমূহ জ্বলে যেত বরং মাথার খোল পেটে যেত আর চাঁদ যদি চতুর্থ আসমানে হতো, তাহলে এর আলো এত হালকা হতো যে ফলসমূহে দুধের সৃষ্টি করতে পারতো না। অনুরূপ জসীনে অগণিত নিদর্শন সমূহ রয়েছে। দেখুন, হাজার হাজার বছর ধরে জমীন সব রকমের নিয়ামত সমূহ উৎপন্ন করছে। কোন সময় বলেনি যে আমি খালি হয়ে গেছি। তাছাড়া সমস্ত আকার আকৃতিও অবিকল রয়েছে। কিন্তু বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন প্রভাব ভিন্ন ভিন্ন। পাঞ্জাবের জমীনে জাফ্রান উৎপন্ন হয় না এবং কাশ্মীরের জমীনে আম উৎপন্ন হয়না। এটাতো বাহ্যিক অবস্থা। এবার জমীনের ভিতরের অবস্থা অবলোকন করুন। এর কোন জায়গায় পানির ঝর্ণা রয়েছে, কোন জায়গায় তৈলের খনি, কোন জায়গায় স্বর্ণের খনি, কোন জায়গায় ইস্পাতের খনি ইত্যাদি ইত্যাদি। মোট কথা জমীনে হাজার হাজার রকম বিস্ময়কর বস্তু রয়েছে। এ জন্য বলা হয়েছে যে আসমান জমীনের সৃষ্টিতে নিদর্শন সমূহ রয়েছে।

ছুফিয়ানে কিরাম বলেন যে, মানুষের মধ্যে নবীগণ হচ্ছেন যেন আসমান এবং সাধারণ লোকগণ যেন জমীন এবং হুযূর সৈয়্যদুল মুরসালীন (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হচ্ছেন যেন নবম আসমান (আরশে আযম) যেটা সমস্ত আসমান সমূহ এবং জমীনকে পরিবেষ্টিত করে আছেন। আসমান সদা দিতেই থাকে, গ্রহণ করে না। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সদা প্রদানই করেন, আমাদের থেকে গ্রহণ করেন না। এবং জমীন সবসময় আসমানের মুখাপেক্ষি, আমরা ও সব সময় হুযূরের মুখাপেক্ষি। আসমান থেকে আলো, বৃষ্টি ইত্যাদি নানা রকম নিয়ামত সমূহ জমীনে পতিত হতে থাকে। অনুরূপ হুযূরের পক্ষ থেকে ঈমান, এরফান, কুরআন, রহমানের রহমত মোট কথা সমস্ত খোদায়ী নিয়ামত আমরা পেয়ে থাকি।

(৪) জমীন সবসময় আসমানের মুখাপেক্ষি। শষ্য পাকার আগে বৃষ্টির প্রয়োজন হয় এবং পাকার সময় সূর্যের তাপের প্রয়োজন পড়ে আর কাটার পর শুকনো মৌসুমের প্রয়োজন হয়। এ গুলো সব আসমান থেকে অর্জিত হয়। এ রকম আমরা সব সময় হুযূরের মূখাপেক্ষি। যেমন জীবিত থাকাকালীন ওনার নামাযের মূখাপেক্ষি, মৃত্যুর সময় ওনার কলেমার মূখাপেক্ষি, কবরে গিয়ে ওনাকে সনাক্ত করার মূখাপেক্ষি, হাশরে ওনার শাফায়াতের মূখাপেক্ষি। সারকথা মৃত্যুর সাথে

সাথে দুনিয়ার সমস্ত প্রয়োজন শেষ হয়ে যায় কিন্তু তাঁর প্রয়োজন বাকী থাকে। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর আস্তানাকে সদা আবাদ রেখেছেন। দান–খয়রাত ওখান থেকে বন্টন হয়। আমরা গ্রহণ করি, তিনি প্রদান করেন।

برتو او پاشد تو بر ما ! ÷ تا ابدایں سلسلہ ہو!

অর্থাৎ হে হাবীবে খোদা! আপনার উপর খোদার রহমত সব সময় অবতীর্ণ হতে থাকুক। আর আপনি আমদেরকে দিতে থাকুন। দেয়া নেয়া যেন শেষ না হয়।

(৫) জমীন যত উঁচু হোক না কেন এবং এতে যতইনা উন্নত বীজ বপন করা হোক কিন্তু আসমান থেকে বেনিয়াজ নয়। বাংলাদেশের জমীন যেমনি আসমানের মুখাপেক্ষি, তেমনি কাশ্মীরের জমীনও। তদ্রুপ কোন মানুষ যত উচ্চস্তরে পৌছুক না কেন এবং যত নেক আমল করুক না কেন, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বেনিয়াজ নয়। আমরা পাপীরা উনার মুখাপেক্ষি, আওলীয়া আবরারও ওনার দরবারের ভিখারী। জমিদার, ব্যবসারী সবাই ওনার দস্তরখানার পতিত অংশ ভক্ষণকারী।

منگتے تو ہیں منگتے کوئی شا ہوں میں دکھادو
جس کو میری سرکارسے ٹکڑا نہ ملا ہو!

অর্থাৎ ভিখারী ধনীদের দরজায় ওনাদের সম্পদ ও ছেলে মেয়েদের কল্যাণ কামনা করলে ভিক্ষা পেয়ে যায়। ইন্শাআল্লাহ্ আমরা আল্লাহ্র দরবারে ওনার হাবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কল্যাণ কামনা করে ক্ষমার ভিক্ষা নিয়েনিব।

(৬) জমীনের কোন অংশের এ অধিকার নেই যে নিজেকে আসমানের মত বলা। কীভাবে বলতে পারে। এটা সব সময় ভিক্ষা করে জীবন ধারণকারী,. ভিক্ষার পাত্র প্রসারিতকারী। কিন্তু আসমান সব সময় প্রদানকারী। এ রকম কোন মানুষ এটা বলতে পারে না যে আমি হুযূরের মত হয়ে গেছি। গ্রহীতা দাতার বরাবর কীভাবে হতে পারে। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে যে উপরের হাত নীচের হাত থেকে উত্তম। আমরা নীচের হাতের অধিকারী এবং হুযূর আনোয়ার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপরের হাতের অধিকারী।

ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم ÷ ہیں سخی کے مال میں حقدار ہم

অর্থাৎ দানশীলদের সম্পদে আমরা ভিখারীদের হক রয়েছে। অতএব হে দয়ালু, হাত উঠায়ে আমাদেরকে কিছু দান করুন।

(৭) আসমান কোটি কোটি মাইল দূরে রয়েও জমীনকে সবরকমের ফয়েজ দান করে। ফয়েজ দেয়ার জন্য আসমানকে না জমীনের কাছে আসতে হয়, না জমীনকে আসমানের কাছে যেতে হয়। এ রকম নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দান আসা–যাওয়ার উপর নির্ভর নয়। এক দৃষ্টিতে ভেল্লা কুলে পৌছায়ে দেন। আসমান জমীনকে সবদিক দিয়ে পরিবেষ্টিত অবস্থায় আছে। জমীনের কোন অংশ আসমানের বেষ্টনী ভেদ করতে পারে না। অনুরূপ নাবুয়াতে মুস্তাফা সমস্ত জগতকে পরিবেষ্টিত অবস্থায় আছে। নবী, ওলী, কাফির এবং আমাদের মত গুনাহগার বান্দারা মোট কথা খোদার সমস্ত খোদায়ী হুযূরের বেষ্টনীর মধ্যে রয়েছ। যেমন আল্লাহ্ তাআলা ফরমান। لِيَكُوْنَ لِلْعَالَمِيْنَ نَذِيْرًا (জগত সমূহের জন্য ভয় প্রদর্শনকারী।) আরও ফরমান وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ (আপনাকে জগত সমূহের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি। এ জন্যই বলা হয়েছে– اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

অর্থাৎ আসমানসমূহ ও জমীন সৃষ্টির মধ্যে অগণিত নিদর্শন রয়েছে।

(৮) আসমানের তারকারাজি যেমনি দুনিয়ার উৎপাদনের বেলায় ভূমিকা রাখে, যেমন ইতোপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে, তেমনি ভ্রমণকারীদের জন্য পথ প্রদর্শকও বটে, পূর্ব পশ্চিম ইত্যাদি দিক ওগুলোর দ্বারাই নির্ধারিত হয়। সময়ের তারতম্য ওগুলোর দ্বারাই নির্ধারিত হয়। সময়ের তারতম্য ওগুলোর গতিবিধির দ্বারাই হয়ে থাকে। মোট কথা, দিক ও কাল ওগুলোর দ্বারা জানা যায়। স্থল পথ ও জলপথের ভ্রমণকারী ওগুলোর মাধ্যমে মন্জিলে মকসুদে পৌছে। ঘড়ি ও দিক নির্ণয়ন যন্ত্র ওগুলোর উপর ভিত্তি করে তৈরী করা হয়েছে।

অনুরূপ নাবুয়াতের আসমানের তারকারাজি অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরামের সত্বার উপর আমাদের সব রকমের হেদায়েত নির্ভরশীল। পরকালের ভ্রমণকারী হোক স্থলপথের যাত্রী হোক, যিনি শরীয়তের পথ অতিক্রম করছে অথবা জলপথের যাত্রী হোক যিনি তরীকতের সমুদ্র অতিক্রম করছে, ওনাদের হেদায়েতের মুখাপেক্ষি অর্থাৎ ওনাদের অনুসরণ ব্যতীত আলেম, ফাজেল, মুফতী, গাজী, গাউছ কুতুব আবদাল তো অনেক দুরের কথা, মুমিনও হতে পারবেনা। মূল ঈমান ওনাদের গোলামীর উপর নির্ভরশীল। এ জন্য হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ ফরমায়েছেন اَصْحَابِىْ كَالنُّجُوْمِ بِاَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ

অর্থাৎ আমার সাহাবা উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত। যারই অনুসরণ করবে হেদায়েত পেয়ে যাবে। এ হাদীছ শরীফে হেদায়েতকে সার্বিকভাবে বলেছেন, যার মধ্যে

ঈমানের হেদায়েত, তকওয়ার হেদায়েত, এরফানের হেদায়েত মোট কথা দীন দুনিয়ার সমস্ত হেদায়েত অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং সমস্ত মুসলমানের সব রকমের হেদায়েত সাহাবায়ে কিরামের অনুসরণ দ্বারাই অর্জিত হবে। আসলে খালেক ও মখলুকের মাঝখানে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) হচ্ছেন বৃহত্তম মাধ্যম এবং হুযূর ও উম্মতের মাঝখানে সাহাবায়ে কিরাম হচ্ছেন উঁচস্তরের ওসীলা। কেননা কুরআনের আয়াত ও হাদীছসমূহকে আল্লাহ্ তাআলা সাহাবায়ে কিরামের মাধ্যমে আমরা পর্যন্ত পৌছায়েছেন।

وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ (এবং দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে) এ আয়াতাংশ কুদরতের দ্বিতীয় দলীল। اِخْتِلَاف শব্দটি خَلْف শব্দ থেকে তৈরী করা হয়েছে। যার অর্থ পিছনে। اِخْتِلَاف এর অর্থ পরিবর্তন করা, একে অপরের খলীফা হওয়া এবং আসা–যাওয়া। এখানে এ তিন অর্থ গ্রহণ করা যায় অর্থাৎ দিন রাতের পরিবর্তনে বা আসা–যাওয়ায় বা একে অপরের প্রতিনিধি হওয়ার মধ্যে কুদরতের নিদর্শন সমূহ রয়েছে।

পরিবর্তনের কয়েকটি ধরণ রয়েছে–রাতের আগমণ দিনের বিদায় বা এ দু'টার বড় ছোট হওয়া যেমন শীতকালে রাত বড়, দিন ছোট এবং গরম কালে এর বিপরীত বা এ দু'টার ঠাণ্ডা বা গরম হওয়া বা রাত উজ্জ্বল বা অন্ধকার হওয়া–এ সব পরিবর্তনের অন্তর্ভূক্ত। রাত দিন পরস্পর বিপরীত, কোন সময় একত্রিত হয় না। কিন্তু তা সত্বেও ওদের পরস্পরের মধ্যে এতটুকু সন্ধি রয়েছে যে কোন সময় দিন নিজের অনেক অংশ রাতকে দিয়ে দেয়, যার ফলে রাত বড় হয়ে যায় এবং দিন ছোট হয়ে যায়। আবার কোন সময় রাত স্বীয় অংশ দিনকে ছেড়ে দিয়ে নিজে ছোট হয়ে যায় এবং দিন বড় হয়ে যায়। এটাও পরিবর্তনের অন্তর্ভূক্ত।

এ আয়াতাংশে ইঙ্গিতে বান্দাগণকে বুঝানো হয়েছে যে তোমরা সব সময় একই অবস্থায় থাকবে না। যখন যুগের স্থিরতা নেই, তখন তোমরা যুগের অধিবাসীদের স্থিরতা কিভাবে হতে পারে। এ পৃথিবীতে সব সময় একটি কউমের রাজত্ব থাকবে না। কোন সময় কাফিরেরা এতে অন্ধকার রাজত্ব কায়েম করবে এবং সমস্ত পৃথিবীতে অন্ধকার বিরাজ করবে। কোন সময় এখানে ইসলামী উজ্জ্বল হুকুমত কায়েম হবে এবং পৃথিবীতে হেদায়েতের আলো প্রসারিত হবে। যে কউম যখন পৃথিবীতে রাজত্ব করার সুযোগ পায়, সে কউম তখন যেন একে গণীমত মনে করে এবং ভাল কাজ করে যায়।

কাহিনীঃ বাগদাদের বাদ্‌শা হারুনুর রশীদের স্ত্রী যোবাইদা খাতুন হজ্ব করতে মক্কা শরীফ গিয়ে ছিলেন। তিনি দেখলেন যে হাজীদের পানি সমস্যাটা খুবই প্রকট।

এ অবস্থা দেখে তিনি মনে মনে স্থির করে নিলেন যে ইন্‌শাআল্লাহ্ কিয়ামত পর্যন্ত হাজীদেরকে পানি পান করাবো। সিদ্ধান্ত মুতাবেক ইরাক থেকে এমন একটি খাল খনন করালেন যে পানির স্তর মক্কা শরীফের পাহাড় সমূহের কিনারায় পৌছায়ে দিলেন এবং সমগ্র মক্কা শহরে এ খালের স্রোতধারা প্রবাহিত করালেন। প্রায় সাড়ে বারশ বছর থেকে আজ পর্যন্ত এ খাল প্রবাহিত আছে। হাজীগণ এর পানি পান করছেন এবং ওকে দুআ করছেন। যখন যোবাইদার ইঞ্জিনিয়ার খালের হিসেব দিতে তাঁর কাছে গেল, তখন তিনি বললেন, ঘাটতি হলে আমার থেকে নিয়ে যাও আর যদি আমাকে কিছু ফেরত দিতে এসে থাক, তাহলে আমি সে হিসেব কিয়ামতের জন্য ত্যাগ করলাম। যা কিছু অবশিষ্ট আছে,এ ভাল কাজের তাওফীক হওয়ার শুকরীয়া স্বরূপ গরীবদের মধ্যে বন্টন করে দাও। ছুফীগণ বলেন যে অন্তরের জগতে কোন সময় অলসতার রাত আসে, কোন সময় জাগ্রতার দিন। যেমন দিন সূর্যের আলো দ্বারা এবং রাত স্বয়ং পৃথিবীর ছায়া থেকে সৃষ্টি হয়। অনুরূপ জাগ্রতার দিন মদীনাওয়ালা সূর্য দ্বারা সৃষ্টি হয় এবং রাত আমাদের নফ্‌সের প্রভাবে সৃষ্টি হয়। অন্তরের জগতে দিনরাত হতেই থাকে, যাকে ছুফীয়ানে কিরামের ভাষায় قبض (সংকোচন) ও بسط (সম্প্রসারণ) বলা হয়। যেমন আল্লাহ্ তাআলা ফরমান وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ

(এবং আল্লাহ্ তাআলা সংকোচিত ও সম্প্রসারিত করেন) শেখ সাদী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বলেন–

کسے پر سیدازاں گم کردہ فرزند + کہ اے روشن گھر پیرے خرد مند

زمصرش بوئے پیراھن شنیدی + چرادر چاہِ کنعانش نہ دیدی

بگفت احوال ما برق جھان است + دمے پیدا ودیگردم نہان است

گھے برطارم اعلیٰ نشینم + گھے برپشت پائے خودنہ بینم !

অর্থাৎ কোন একজন ইয়াকুব (আলাইহিস সালাম)কে জিজ্ঞাসা করলো যে এটা কী ধরনের কথা যে ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) এর কামীজের সুগন্ধি তো হাজার হাজার মাইল দুরত্ব থেকে আপনি অনুভব করলেন কিন্তু সে কেনানের কূপে থাকাকালীন আপনি তাকে দেখলেন না। উত্তরে বললেন, আমার অবস্থা বিদ্যুৎ চমকানোর মত। কোন সময় আমি সমগ্র জগতের খবর রাখি এবং কোন সময় নিজের বেলায়ও বেখবর হয়ে যাই।

মানুষের প্রার্থনা করা চায় যে রাত্রেও যেন আল্লাহ্‌র সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়। মৃত্যুর সময়ও যেন আল্লাহ্‌ তাআলা অন্তরের জগতে দিনের আলো বিকশিত রাখেন।

বা রাত দিন বলতে কউম সমূহের বা মানুষের উত্থান বা পতনের যুগকে বুঝানো হয়েছে। একই কউমের উপর কোন সময় দুর্যোগের রাত আসে আর কোন সময় সৌভাগ্যের দিন আসে। কোন সময় বনী ইসরাইল ফেরাউনের হাতে নাজেহাল হয় আবার কোন সময় মিশরের ভূখণ্ডে রাজত্ব করে। ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) কোন সময় কূপে নিক্ষিপ্ত, কোন সময় কারাগারে, আবার কোন সময় রাজ সিংহাসনে অধিষ্টিত এবং সারা জাহানের খাদ্য ভাণ্ডার তাঁর হাতে ন্যস্ত। আমাদের এ পরিবর্তন আল্লাহ্‌র অস্থিত্বের প্রমাণ। ঘুড়ি যত উপরে উড়ুকনা কেন, এর নাটাই অন্য জনের হাতে।

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ وَنُوْرِ عَرْشِهٖ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ –

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ

তরজুমাঃ কতেক লোক, যারা আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কিছুকে অংশীদার সাব্যস্ত করে ওগুলোকে আল্লাহ্‌র ন্যায় ভালবাসে এবং ঈমানদারগণ আল্লাহ্‌কে গভীর ভালবাসে।

তাফসীরঃ এ আয়াতের তিন ধরনের তাফসীর রয়েছে–একটি হচ্ছে জাহেলানা (অজ্ঞতাসূলভ) দ্বিতীয়টি হচ্ছে আলেমানা (জ্ঞানীসূলভ) তৃতীয়টি হচ্ছে আশেকানা (প্রেমিকসুলভ)

জাহেলানা তফসীর হচ্ছে ওগুলো, যা আজকাল ওলীদ্রোহীরা বলে, লিখে ও বিভিন্ন মাহফিলে বয়ান করে থাকে। ওদের মতে আয়াতে النَّاس বলতে কবর পূজারী মুসলমানকে বুঝানো হয়েছে। من دون الله বলতে নবী, ওলী, পীর দরবেশকে বুঝানো হয়েছে এবং اَنْدَادْ বলতে এসব নবীগণ ওলীগণ, পীরগণ ও দরবেশগণকে হাজত রওয়া, মুশকিল কোশা, ফরিয়াদ শ্রবণকারী, অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী ও হাজির নাজির মনে করে ওনাদেরকে ডাকা ইত্যাদি বুঝানো হয়েছে। অতএব ওদের মতে আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে কবরপূজারী মুসলমানেরা আল্লাহ্‌ ব্যতীত নবী ওলী, পীর ও দরবেশগণকে মুশকিল আসানকারী, হাজতপূর্ণকারী, ফরিয়াদ শ্রবণকারী মনে করে এবং মুসীবতের সময় ওনাদেরকে আহবান করে কিন্তু তওহীদী মুসলমানগণ আল্লাহ্‌কে গভীর মহব্বত করে, ওনারা আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কাউকে মানে না এবং বিপদের সময় অন্য কাউকে আহবান করে না। আয়াতের এ তফসীরটার প্রচারনা আরব ও অনারবে খুব জোরে সোরে চলছে। এর সমর্থনে এ আয়াতটিও উল্লেখ করা হয়–

وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন আশ্রয়দাতা ও সাহায্যকারী নেই। ওরা আরও বলে থাকে যে আরবের মুশরিকরা আল্লাহ্‌ দু'জন মনে করতো না কিন্তু নিজেদের মূর্তিদেরকে অদৃশ্যজ্ঞানী, হাজির নাজির, মুশকিল কোশা ইত্যাদি মনে করতো। এ জন্য ইসলাম ওদেরকে মুশরিক সাব্যস্থ করেছিল। কবর পূজারী মুসলমানেরাও যদিওবা তাওহীদ রেসালত স্বীকার করে কিন্তু পীর দরবেশগণকে হাজত পূর্ণকারী মনে করার ফলে মক্কার কাফিরদের ন্যায় মুশরিক। আরও বলে থাকে যে, لَااِلٰهَ

কোন হাজত পূর্ণকারী নেই, কোন মুশকিল লাগবকারী নেই, কোন ফরিয়াদ শ্রবণকারী নেই, কোন অদৃশ্য জ্ঞানী নেই, কোন হাজির নাজির নেই, اِلَّا اللّٰه (কিন্তু এক আল্লাহ্) আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে হাজির নাজির ইত্যাদি বিশ্বাসকারী হলো কলেমার অস্বীকারকারী, কুরআনেরও অস্বীকারকারী এবং নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর শিক্ষার বিরোধীতাকারী। কিন্তু এ তাফসীর ভ্রান্ত। এটা তাফসীর নয় বরং কুরআনের অপব্যাখ্যা এবং আল্লাহ্‌র অভিপ্রায়ের একেবারে বিপরীত। মূর্তি সম্পর্কিত আয়াতসমূহ নবী ও ওলীগণের নামে চালিয়ে দেয়া, মুশরিক ও কাফিরদের সম্পর্কিত আয়াতসমূহ মুসলমানগণের বেলায় প্রয়োগ করা, ইসলামী আকীদা সমূহকে শিরকী আকীদা বলে সাব্যস্ত করা খারেজীদের স্বভাব। আমি এ তাফসীরকে তিনভাবে খণ্ডন করছি।

একেত; যদি اَلنَّاسُ (লোক) দ্বারা মুসলমানকে বুঝানো হয়, তাহলে এর বিপরীত অংশে যে বলা হয়েছে وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ (মুমিনগণ আল্লাহ্‌কে খুবই ভালবাসেন) তা ভুল হলো। কেননা মুমিনের বিপরীত মুমিন বলা হয় না বরং মুমিনের উল্লেখ কাফিরের বিপরীত হয়ে থাকে। অতএব স্বীকার করতেই হবে যে اَلنَّاسُ দ্বারা কাফির ও মুশরিকদেরকে বুঝানো হয়েছে। এখন ভাবার্থ একেবারে সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে কাফিরেরা মূর্তিদেরকে অংশীদার মনে করতো এবং মুমিনগণ কেবল আল্লাহ্‌রই পূজারী।

দ্বিতীয়তঃ যদি এ আয়াতের অর্থ এটা হয় যে, কবর পূজারী মুসলমানগণ নবীও ওলীগণকে হাজত পূর্ণকারী মনে করতো, তাহলে যে সময় এ আয়াত অবতীর্ণ হয়, তখন নবীর যুগছিল এবং সে যুগের মুসলমান ছিলেন সাহাবা, যাদের ব্যাপারে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, ওনাদের মধ্যে কবর পূজারী কে ছিল এবং তখন পীর দরবেশগণকে কে হাজত পুর্ণকারী মনে করতো। যাদের বর্ণনা এ আয়াতে করা হয়েছে, যদি সে যুগে এ রকম কেউ না থাকতো, তাহলে এ আয়াত ভুল হয়ে গেল এবং আল্লাহ্ মিথ্যা বললেন। সুতরাং মান্‌তেই হবে যে এ আয়াতে সেই মুশরিক ও কাফিরদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যারা সে যুগে মওজুদ ছিল এবং মূর্তি পূজা করতো।

তৃতীয়তঃ যদি আল্লাহ্‌র কোন বান্দাকে খোদা প্রদত্ত ক্ষমতা বলে ফরিয়াদ শ্রবণকারী, মুশকিল আসানকারী মনে করাটা শিরক হয় এবং কাউকে হাজির নাজির, অদৃশ্য জ্ঞানী মনে করাটা তওহীদের বিপরীত হয়, তাহলে দুনিয়াতে কোন মুসলমান থাকতে পারে না। স্বয়ং এ রকম তাফসীরকারকরাও শয়তান ও মৃত্যুর

ফিরিশতাকে হাজির নাজির বলে স্বীকার করে এবং ধনীদেরকে চাঁদার সময়, ডাক্তারদেরকে রোগের সময় ও বিচারকদেরকে বিশেষ বিপদের সময় ফরিয়াদ শ্রবণকারী, হাজত পূর্ণকারী মুশকিল আসানকারী মনে করে ওনাদের দরজায় ধর্ণা দেয়। আশ্চর্যের বিষয়! ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) এর কামিজ বিপদ লাঘবকারী হতে পারে। জঙ্গলের লতাপাতা বিভিন্ন রোগ নিরাময়কারী হতে পারে, এমন কি কোন এক শরবতের নাম ফরিয়াদরসও হয়ে থাকলে, তওহীদের বিপরীতে হয় না কিন্তু হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে ফরিয়াদ শ্রবণকারী মনে করাটা এ আয়াতের বিপরীত হয়ে গেল। এটা এক অদ্ভুত তাফসীর, কোন জায়গায় অশুদ্ধ কোন জায়গায় শুদ্ধ।

একটি রসালো ঘটনাঃ এ ধরনের তাফসীরকারকদের এক আলেমকে কোন এক মাহফিলে দাওয়াত দেয়া হয়েছিল। মাওলানা সাহেব মঞ্চে উপবেশন করে যথারীতি এভাবে ওয়াজ শুরু করলেন– لَآ اِلٰهَ অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত কোন হাজত পূর্নকারী নেই, কোন মুশকিল আসানকারী নেই। যা হোক এ ভাবে ওয়াজ করে মাহফিল শেষ করলেন। সকাল বেলা মাওলানা সাহেব চলে যাবার সময় দাওয়াতকারীদের থেকে নজরানা ও গাড়ী ভাড়া চাইলেন। ওনারা বললো মাওলানাজী, আপনি কি রাতের ওয়াজ ভুলে গেলেন? এ যে لَآ اِلٰهَ অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ গাড়ীভাড়া দাতা, নজরানা দাতা নেই। আপনি কেন মুশরিক হতে চাচ্ছেন এবং আমাদেরকেও কেন মুশরিক বানাতে চাচ্ছেন, আমরা আমাদের তওহীদী আকীদায় অটল থাকবো এবং আপনাকে এক পয়সাও দিব না।

وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ আয়াতাংশে কাফিরদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে অর্থাৎ হে কাফিরেরা! পরকালে তোমাদের কোন সাহায্যকারী নেই। আর একটি আয়াতে আছে وَالظّٰلِمُوْنَ مَا لَهُمْ مِّنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ অর্থাৎ কাফিরদের আল্লাহ্‌র মুকাবিলায় না কোন আশ্রয়দাতা, না কোন সাহায্যকারী আছে। বা এ আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে যদি আল্লাহ্ কারো উপর আযাব নাজিল করে, তাহলে একে প্রতিরোধ করে কেউ সাহায্য করতে পারেনা। এর তফসীর হলো সেই আয়াত وَاِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِيْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ بَعْدِهٖ যদি আল্লাহ্ তোমাদের অপদস্ত করে, তাহলে এমন কে আছে, যে তোমাদের সাহায্য করতে পারে।

মুসলমানদের জন্য এ আয়াতটি প্রয়োজ্য,

اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

অর্থাৎ তোমাদের সাহায্যকারী আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুল এবং মুমিনগণ। সুতরাং উপরোক্ত বক্তব্য উল্লেখিত আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা নয় বরং অপব্যাখ্যা, যা কুরআনের আয়াতের বিপরীত।

আলেমানা তাফসীরঃ ওলামায়ে দীন এ আয়াত সম্পর্কে বলেন যে কুরআন করীমে اَلنَّاس শব্দটি কোন সময় কেবল কাফিরদের জন্য বলা হয় এবং কোন সময় সমস্ত মানুষের জন্য ব্যবহৃত হয়। দেখুন সুরা নাসে চার জায়গায় اَلنَّاس বলা হয়েছে।

কিন্তু প্রথম তিন জায়গায় بِرَبِّ النَّاسِ (মানুষের প্রতিপালন مَلِكِ النَّاسِ (মানুষের অধিপতি اِلٰهِ النَّاسِ মানুষের ইলাহ) এর দ্বারা মানুষ বুঝানো হয়েছে। কেননা আল্লাহ্ তাআলা সমস্ত লোকের প্রতিপালক, অধিপতিও এবং ইলাহও। চতুর্থ বার مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (জ্বিন ও মানুষ থেকে) দ্বারা কেবল কাফিরদেরকে বুঝানো হয়েছে। নবী, ওলী ও সাধারণ মুসলমানের সাথে এ আয়াতের কোন সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ কাফিরদের মধ্যে কতেক। যেহেতু কতেক কাফির জড়বাদী ও খোদার অবিশ্বাসী ছিল, কতেক একেশ্বরবাসী ছিল এবং কতেক মুশরিক ছিল, সেহেতু مِنْ ব্যবহৃত হয়েছে।

يَتَّخِذُوا শব্দটি اِتِّخَاذ থেকে গঠন করা হয়েছে, যার অর্থ তৈরী করা, ধরা, মান্য করা, অর্থাৎ কতেক কাফির ধরে, মান্য করে এবং তৈরী করে।

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ আরবী ভাষায় اِلَّا – غَيْرَ – سَوَاء – دُوْنَ এ চার শব্দ প্রায় একই অর্থবোধক (ব্যতীত) কিন্তু دُوْنَ ওই ক্ষেত্রে বলা হয়, যেখানে কেটে পৃথক করার অর্থ বুঝায়। دُوْنَ এর অর্থ কেটে যাওয়া, পৃথক হয়ে যাওয়া। যেমন আল্লাহ্ তাআলা ফরমান وَوَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمُ امْرَاَتَيْنِ تَذُوْدَانِ

অর্থাৎ মূসা আলাইহিস সালাম ওসব লোকদের থেকে আলাদা দু'জন মহিলাকে পেলেন। এখানে دُوْنَ আলাদা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

যেমন সংযোগ বিচ্ছিন্ন সমস্ত বৈদ্যুতিক ফিটিং অর্থহীন এবং ইঞ্জিন থেকে আলাদা রেলের সমস্ত বগি বেকার, তেমন আল্লাহ্ থেকে বিচ্ছিন্ন বান্দা অকেজো মাত্র। সমস্ত মখলুক আল্লাহ্র বান্দা। তবে আল্লাহর সাথে সম্পর্কিতদেরকে اَوْلِيَاءَ اللّٰه বলা হয় এবং আল্লাহ্ থেকে বিচ্ছিন্ন দেরকে مِنْ دُوْنِ اللّٰه বলা হয়। অতএব আয়াতের অর্থ এটাই হলো যে, কতেক কাফির এসব বান্দাকে আল্লাহ্র অংশীদার সাব্যস্ত করে, যারা আল্লাহ্ থেকে একেবারে সম্পর্কচ্যুত যেমন

কাফিরদের সরদার, মূর্তি ইত্যাদি। আল্লাহ্র অনুসারী ও আল্লাহ্ থেকে সম্পর্কচ্যুতদের অনুসারীর পার্থক্য ইসলামের সব জায়গায় দৃষ্টি গোচর হয়।

রমযান ও ঈদের তাযীম ঈমানের অংগ কিন্তু হুলী ও দেওয়ালীর তাযীম কুফরী। কেননা রমযান ইত্যাদির সম্পর্ক আল্লাহ্র অনুগতদের সাথে এবং হুলী ও দেওয়ালীর সম্পর্ক আল্লাহ্ থেকে সম্পর্কচ্যুতদের সাথে।

اَنْدَادًا–اِنْدَاد হচ্ছে نِدْ এর বহুবচন। এর অর্থ বিপরীত, শরীক, অংশীদার। ইসলামেও আছে যে আল্লাহ্ তাআলা সমস্ত কাজ নিজে করেন না বরং তাঁর খাদেম ফিরিশতা ও অন্যান্যরা করে। যেমন প্রাণ হরণের ফিরিশতা আলাদা, বৃষ্টি বর্ষণের ফিরিশতা আলাদা। এর প্রমাণ কুরআন হাদীছে রয়েছে। কাফিরেরাও এটা বলে যে সমস্ত কাজ আল্লাহ্ স্বয়ং করে না। কিন্তু মুসলমানরা এসব ফিরিশতা ও অন্যান্যদেরকে আল্লাহ্র খালেছ বান্দা মনে করে, যারা আল্লাহ্র দরবারে খাদেম হিসেবে নিজ নিজ দ্বায়িত্ব পালন করে। আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে সমস্ত কাজ নিজে করতে পারে, কিন্তু দরবারে আলার শান হচ্ছে তার চাকর বাকর খাদেম তাঁর নির্দেশে যেন নিজ নিজ দ্বায়িত্ব পালন করে।

কাফিরদের বিশ্বাস এটা ছিল যে আল্লাহ্ এ সব কাজ একা করতে পারে না। তাঁর অপরাগতা ও বাধ্যতার কারণে আমাদের মূর্তিদেরকে তাঁর সাহায্যকারী করে রেখেছেন। এ জন্য এরা আল্লাহ্র সমকক্ষের দাবীদার। এ হিসেবে ওরা মূর্তিদেরকে আল্লাহ্র অংশীদার মনে করতো। এ আয়াতে তাই বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ কতেক কাফির আল্লাহর বিপরীত কতেক মূর্তিকে আল্লাহ্র অংশীদার মনে করতো। এবং يُحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰه ওগুলোকে আল্লাহ্কে মহব্বত করার মত মহব্বত করতো। এর মূল শব্দ হচ্ছে حُبّ যার অর্থ দানা। দিলের মধ্যে একটি কাল দানা থাকে, যাকে সওদা বলা হয়। প্রিয় জনের মহব্বত এ দানায় থাকে। মহব্বত অনেক প্রকারের আছে–শারীরিক মহব্বত, রূহানী মহব্বত, ঈমানী মহব্বত, আবেগী মহব্বত। আবার শারীরিক মহব্বত কয়েক প্রকারের হয়ে থাকে, যেমন যৌন মহব্বত, করুনামূলক মহব্বত, সুন্দর আকৃতির মহব্বত, সুন্দর চরিত্রের মহব্বত, রক্ত–সম্পর্কের মহব্বত। রূহানী মহব্বতের বিশ্লেষণ সেই হাদীছে রয়েছে, যেখানে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফরমায়েছেন যে, আল্লাহ্ তাআলা নানা ধরনের রূহ সৃষ্টি করেছেন, প্রত্যেক রূহ স্বজাতির প্রতি মহব্বত সৃষ্টি করে। কেউ যদি জানতে চায় যে আমার রূহ কোন্ প্রকারের? তাহলে মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করা দরকার যে আমার

দিলের আকর্ষণ কোন ধরনের লোকের প্রতি। যে দিকে আকর্ষণ, ওর রূহও সেই রকমের। মাওলানা রুমী (রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি) ফরমানঃ

ناریان مرنا ریان راطالب اید ÷ نوریاں مر ناریاں را جاذب اند

অর্থাৎ ভাল ভালোর দিকে টানে, মন্দ মন্দের দিকে অর্থাৎ সৎসঙ্গ স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গ সর্বনাশ। ঈমানী মহব্বত হচ্ছে যেটার উপর ঈমান নির্ভরশীল। যেমন আল্লাহ্‌র প্রতি মহব্বত এ জন্য যে তিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা, তাঁর রসুলের প্রতি মহব্বত, কেননা আমরা তাঁর উম্মত। হুযূরের সাহাবা ও আহলে বায়তের প্রতি মহব্বত, কেননা তাঁরা হুযূরের খাস খাদেম ও প্রাণপ্রিয় আপনজন। এ সব মহব্বত ঈমানী মহব্বতের অন্তর্ভূক্ত।

আবেগী মহব্বত কুফর ও ধর্মদ্রোহীতার মুল, যেমন মূর্তিদের প্রতি মহব্বত, শয়তানের প্রতি মহব্বত, কাফিরদের কুফরীর প্রতি মহব্বত। এ সব মহব্বত আবেগী। উপরোক্ত আয়াতে এ ধরনের মহব্বতকে বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ এসব কাফিরেরা মূর্তিদেরকে নিজেদের সৃষ্টিকর্তা ও রক্ষাকর্তা মনে করে ওগুলোকে মহব্বত করে।

স্মরণ রাখা দরকার যে শারীরিক, নফ্‌সানী ও আবেগী মহব্বত মৃত্যুর সাথে সাথে শেষ হয়ে যায় বরং দুশমনীতে পরিবর্তন হয়ে যায়। কিন্তু রূহানী মহব্বত অটল থাকে। ওটা কবর হাশব সব জায়গায় বলবৎ থাকে। শরীর ধবংসশীল। এর মহব্বতও ধ্বংসশীল। রূহ অটল, এর মহব্বতও অটল। আল্লাহ্‌ তাআলা ফরমানঃ

اَلْاَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ ۝

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন বন্ধু দুশমন হয়ে যাবে, পরহেজগারগণ ব্যতীত।

কতেক মহব্বত ফরয, যেমন মা–বাপ, ওস্তাদ, পীরের প্রতি মহব্বত। কতেক মহব্বত মুস্তাহাব, যেমন আপনজন ও আত্মীয় স্বজনের প্রতি, কেননা এদের মহব্বত করা রসুলের সুন্নাত। কতেক মহব্বত জায়েয, যেমন স্বীয় ধন–দৌলত ইত্যাদির প্রতি দুনিয়াবী মহব্বত। কতেক মহব্বত নাজায়েয, যেমন অপরের স্ত্রীর প্রতি মহব্বত, অপরের মাল চুরি করার নিয়তে মহব্বত। কতেক মহব্বত কুফর, যেমন আল্লাহ ও রসুলের মুকাবিলায় তাঁদের দুশমনদের প্রতি মহব্বত। উপরোক্ত আয়াতে এ শেষ প্রকারের মহব্বত বুঝানো হয়েছে। এ জন্যই কাফিরদের উপর অভিশাপ।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ এ আয়াতাংশের তিন রকম তাফসীর হতে পারে–এক, আল্লাহ্‌র প্রতি কাফিরদের যতটুকু মহব্বত, মুমিনদের মহব্বত আল্লাহ্‌ প্রতি এর থেকে অনেক বেশী। এর কয়েকটি কারণ রয়েছে। একেতঃ মুমিন আল্লাহ্‌কে এক মনে করে তাঁকে মহব্বত করে এবং কাফির কয়েকজন মাবুদের প্রতি মহব্বত করে। তাই খণ্ডিত মহব্বত থেকে একক মহব্বত অনেক দৃঢ় হয়ে থাকে। দ্বিতীয়তঃ কাফির দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌র প্রতি মহব্বত দেখায় কিন্তু মুমিন আল্লাহকে আন্তরিক মহব্বত করে। উদ্দেশ্য প্রণোদিত মহব্বত থেকে আন্তরিক মহব্বত অনেক শক্তিশালী হয়ে থাকে। যেমন ভারত বর্ষের হিন্দুরা লক্ষী পূজা এ জন্য করে যে লক্ষী তাদেরকে ধনদৌলত দিবে। তৃতীয়তঃ মুশরিক বিপদের সময় আল্লাহ্‌কে ডাকে এবং সুখের সময় অন্যদেরকে কিন্তু মুমিন আপদ বিপদ সুখ–দুঃখ সবসময় আল্লাহ্‌র দুয়ারে থাকে।

দ্বিতীয় অর্থ এটা হতে পারে যে মুমিন স্বীয় জানমাল সন্তানসন্ততি সব কিছু থেকে আল্লাহকে অধিক মহব্বত করে। এ জন্যই সময় আসলে তাঁর নামে সবকিছু উৎসর্গ করে জান পর্যন্ত দিয়ে দেয়। এর বাস্তব দৃশ্য দেখতে চাইলে কারবালা ময়দানের ঘটনা দেখুন।

ছুফিয়ানা তফসীরঃ ছুফিয়ানে কিরাম বলেন যে আলমে আরওয়াহে মুমিন, কাফির মুনাফিক সমস্ত মানুষ আল্লাহ্‌র জাত, সেফাত এবং প্রায় সমস্ত অদৃশ্য জগতকে জানতো এবং চিনতো। কিন্তু দুনিয়াতে এসে ওদের মধ্যে চার ভাগ হয়ে গেছে। (১) কতেক ওসব বিষয়কে স্মরণকারী যেমন আল্লাহ্‌র খাস ওলীগণ। ওনাদের কাছে আল্লাহ্‌র সাথে সমস্ত ওয়াদা অঙ্গীকার এ রকম স্মরণ থাকে যেন কালকের কথা। قَالُوْا بَلٰى تے کل دی گل + ای پھلے ھی پر یت لگا بیٹھے

(২) কতেক এসব ওয়াদা অঙ্গীকার স্মরণ করানোকারী হয়ে থাকেন যেমন নবীগণ বিশেষ করে হুযূর সায়্যেদুল আম্বীয়া (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। আল্লাহ তাআলা তাঁদের ব্যাপারে বলেন فَذَكِّرْ اِنَّمَآ اَنْتَ مُذَكِّرٌ

অর্থাৎ হে মাহবুব, ওদেরকে আল্লাহ্‌র সাথে কৃত ওয়াদা অঙ্গীকার স্মরণ করায়ে দিন। কেননা আপনিই স্মরণ করানোকারী। (৩) কতেক এসব বিষয় ভুলে যায় কিন্তু নবী কর্তৃক স্মরণ করায়ে দিলে মেনে নেয়। যেমন আমরা মুসলমান (৪) কতেক এসব বিষয় ভুলে থাকে এবং নিজেরাও স্মরণ রাখে না এবং নবীর কথাও মানেনা। এ আয়াতে এ চতুর্থ পর্যায়ের লোকদের কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ ওসব ভুলে থাকা লোকদের মধ্যে কতেক যারা مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا

আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছুকে অংশীদার সাব্যস্ত করে অর্থাৎ ওসব লোক কেবল নিজের বিবেক দ্বারা ঈমান তৈরী করেছে, আল্লাহকে মান্য করেছে। এ জন্য প্রত্যেক জায়গায় হোঁচট খেয়েছে। নাবুয়াতের আলো ছাড়া কেবল বিবেক অর্থহীন বরং ক্ষতিকর।

عقل زیر حکم دل یزدانی است ÷ چون زدل آزاد شد شیطانی است

অর্থাৎ দিল কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত জ্ঞান রহমত, দিলের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত জ্ঞান অভিশপ্ত। অপরিচিত শহরের অলিগলি কোন দার্শনিক বা জ্ঞানী স্বীয় দর্শন বা জ্ঞান দ্বারা জানতে পারেন না বরং ওখানকার বাসিন্দাদের কাছে জিজ্ঞাসা করতে হবে। এ রকম পরকালের অলিগনি, ঈমানের রাস্তা কেবল জ্ঞানবুদ্ধি দ্বারা জানতে পারে না বরং এমন উপযুক্ত ব্যক্তিদের থেকে জেনে নিতে হবে, যাঁরা ওখানকার সম্পর্কে জ্ঞাত। তাঁরাই হচ্ছেন আম্বীয়া কিরাম। সুতরাং مَنْ يَتَّخِذُ এর অর্থ এটাই হলো যে জ্ঞান বুদ্ধির জোরে ওরা অংশীদার বানিয়েছে। জ্ঞান দ্বারা রেডিও, টি ভি, বিমান ইত্যাদি বানানো যায় কিন্তু ঈমান বানানো যায় না। ওখানে জ্ঞানশুন্যতাই কল্যাণকর হয়ে থাকে।

عقل قرباں کن بہ پیش مصطفے অর্থাৎ হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সামনে জ্ঞানকে বিসর্জন দিন।

ছুফিয়ানে কিরামের মতে ও ধরনের প্রতিটি বিষয় যেগুলো আল্লাহ্ থেকে উদাসীন করে দেয়, সব اَنْدَاد (অংশীদার), কেউ সন্তানদেরকে অংশীদার বানায়, কেউ ধন সম্পদকে, কেউ স্বীয় জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে। শয়তানের সিজদা ও নামায সমূহ ওর জন্য اَنْدَاد অংশীদার হয়ে গেল।

اگر چہ بُت ہیں جماعت کی آستینوں میں
مجھے ہے حکم اذاں لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہ

অর্থাৎ হাতার মধ্যেও যদি মূর্তি থাকে, সেটাকেও ঈমাদের দাওয়াত পৌছানো আমার প্রতি নির্দেশ রয়েছে। জিন্দেগী সবাই লাভ করেছে। কিন্তু কেউ জিন্দেগীর উদ্দেশ্য ধনদৌলতকে করেছে, কেউ সর্বোচ্চ স্থানকে অর্থাৎ রাজা উজীর হওয়াকে। এ উদ্দেশ্যদ্বয় ধ্বংসাত্মক এবং পরিনাম ক্ষতিকর। ইবাদতকারীগণ স্বীয় জিন্দেগীর উদ্দেশ্য আমলসমূহকে সাব্যস্ত করেছেন এবং আশেকগণ আল্লাহ তাআলার রেজামন্দীকে জীবনের উদ্দেশ্য সাব্যস্ত করেছেন। বরযাত্রায় বরের ঘর থেকে সমস্ত বরযাত্রী রওয়ানা হয় কনের ঘরের দিকে। কিন্তু বরযাত্রীদের উদ্দেশ্য কেবল খানাপিনা, আত্মীয় স্বজনের উদ্দেশ্য যৌতুক। এসব লোক হচ্ছে অংশীদার। কিন্তু বরের উদ্দেশ্য কেবল কনেকে পাওয়া। বরের এ উপমাটি আরেফীনদের জন্য

প্রযোজ্য। এ আয়াতে ওসব লোকদের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে, যাদের উদ্দেশ্য সম্পদ লাভ বা উচ্চস্থান লাভ ছিল, কিয়ামতের দিন ওদের পরস্পরের সম্পর্ক ভেঙ্গে যাবে।

ছুফিয়ানে কিরাম বলেন, মানুষের জিন্দেগী হয়তো নফ্‌সানী বা শয়তানী অথবা ঈমানী বা রহমানী। যে জিন্দেগী অলসতায় অতিবাহিত হয় সেটা নফসানী, যেটা অসৎকাজে অতিবাহিত হয়, সেটা শয়তানী এবং যেটা নেক কাজে অতিবাহিত হয়, সেটা ঈমানী জিন্দেগী এবং যেটা আল্লাহ্ ও রসূলের প্রেমে মগ্ন হয়ে অতিবাহিত হয়, সেটা রহমানী। এ আয়াতে নফসানী ও শয়তানী জিন্দেগী যাপনকারীদের কথা বলা হয়েছে। অধমের উপরোক্ত পূর্ণ আলোচনা থেকে আপনারা, নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন যে আয়াত ও হাদীছ একই হয়ে থাকে কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন ভিন্ন। এ আয়াত সম্পর্কে কুখ্যাত ব্যাখ্যাকাররা কি বললো আর ওলামায়ে কিরাম ও ছুফিয়ানে এজাম কী সুন্দর বক্তব্যই না পেশ করলেন।

সুক্ষ্মকথাঃ একটি হাদীছে বর্ণিত আছে যে একবার নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবায়ে কিরামকে নামায পড়াতে ছিলেন। নিজেও জুতা পরিহিত ছিলেন এবং সাহাবায়ে কিরামও। হঠাৎ নামাযের মধ্যে হুযূর আনোয়ার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বীয় জুতা মুবারক খুলে ফেললেন। হুযুরকে জুতা খুলে ফেলতে দেখে সাহাবায়ে কিরামও নিজ নিজ জুতা খুলে ফেললেন। নামাযের পর হুযূরই জিজ্ঞাসা করলেন–আপনারা নিজেদের জুতা কেন খুলে ফেললেন? আরয করলেন, আপনাকে খুলতে দেখে। ফরমালেন, জিব্রাইল আমীন আমাকে নামাযের মধ্যে খবর দিয়েছেন যে আপনার নালাইন শরীফে কাযর (নোংরা বস্তু) লেগেছে। তাই আমি জুতা খুলে ফেলেছি। সুতরাং যখন তোমরা নামায পড়তে আসবে, নিজ নিজ জুতা ঘসে নিবে। হাদীছ এখানে শেষ হলো।

এক মওলভী আমাদের এলাকায় একবার লোকদেরকে এ হাদীছটি শুনায়ে ছিল এবং এর থেকে একটি মাস্‌আলা বের করে বললো–এ হাদীছ থেকে বুঝা গেল যে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে স্বীয় জুতার পাক–নাপাকের খবরও থাকতো না। লোকেরা যে বলে–হুযূরের কাছে সমগ্র জগতের খবর ছিল, তা ভুল। যদি নিজের খবর জান্‌তেন, তাহলে নাপাক জুতা নিয়ে কেন মসজিদে এসে যেতেন এং নামায কেন শুরু করতেন। লক্ষ্য করুন, এটাও এক প্রকার চিন্তাধারা, যদ্বারা হাদীছের অর্থ এভাবে করলো। অধম স্বীয় কিতাব মেরাত শরহে মিশকাতে এ হাদীছের ব্যাখ্যায় আরয করেছি যে 'কাযর' অর্থ নাপাকী নয় বরং এর অর্থ নোংরা বস্তু যেমন থুঁ থুঁ ইত্যাদি। হুযূরের সেটা জানা

ছিল। কিন্তু জায়েয প্রমাণ করার জন্য সেই জুতা পরিহিতাবস্থায় নামায শুরু করে ছিলেন, যাতে লোকেরা বুঝতে পারে যে জুতায় থুঁ থুঁ লেগে থাকলে নামায ভঙ্গ হয় না। আল্লাহ্ তাআলাও আগ থেকে জিব্রাইল আমীনকে হুযূরের কাছে পাঠাননি বরং নামাযের কিছু অংশ আদায় করার সুযোগ দিলেন। অতঃপর ফরমালেন, হে মাহবুব। আপনার উদ্দেশ্য পূর্ণ হলো, মাস্আলা লোকদের জানা হয়ে গেল। এখন আমি চাই না যে থুঁ থুঁ লাগা জুতা আপনার পায়ে থাকুক। ব্যবহারিক ফত্ওয়াতো দিয়ে দিলেন। এবার তকওয়ার উপর আমল করুন এবং নালাইনদ্বয় খুলে ফেলুন।

যদি নালাইন শরীফে নাপাকী লেগে থাকতো, তাহলে নামায পুনরায় পড়াটা ওয়াজিব হতো। কিন্তু নামায পুনরায় পড়া হয়নি। এটা কীভাবে হতে পারে যে আল্লাহ্র প্রিয় হাবীব স্বীয় জুতার নোংড়া সম্পর্কে অবহিত নন অথচ পিছনের মুক্তাদীদেরকে বলেন যে আমার কাছে তোমাদের রুকু সিজদা মনের ভীতি ও একাগ্রতা লুকায়িত নয়।

(১) অধমের উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে সাহাবায়ে কিরাম হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে কেবল জ্ঞান–বুদ্ধি দ্বারা মান্য করতেন না বরং ইশ্ক দ্বারা মান্য করতেন, তাঁর প্রতিটি কাজের অনুকরণ করতেন, কারণ জিজ্ঞাসা করতেন না। দেখুন, হুযূরকে জুতা পরিহিত দেখলেন, ওনারাও পড়ে রইলেন। যখন খুলে ফেলতে দেখলেন, ওনারাও খুলে ফেললেন। এটা জিজ্ঞাসা করলেন না যে, পড়ে রইলেন কেন আবার খুলে ফেললেন কেন? একেই বলে ফানা ফিল রসূল। ছিদ্দিক আকবর হুযূরকে অসুস্থ দেখলেন, নিজে অসুস্থ হয়ে গেলেন এবং হুযূরকে সুস্থ দেখলেন, নিজেও আরোগ্য হয়ে গেলেন–

از سر بالین من برخیز اے ناداں طبیب
درد مند عشق را دارد بجز دیدار نیست

অর্থাৎ হে অজ্ঞ ডাক্তার, আমার শিয়র থেকে সরে দাড়াও, প্রেমের রোগীর চিকিৎসা প্রেমিকের দর্শন ছাড়া আর কিছুই না।

(২) এ হাদীছ থেকে বুঝা গেল যে সাহাবায়ে কিরাম নামাযের সময় সিজদার স্থানকে দেখতেন না বরং ঈমানের স্থান হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে দেখতেন। যেমন হেরম শরীফে নামাযী কাবা শরীফকে দেখে দেখে নামায পড়ে। তা নাহলে হুযূরের নালাইন শরীফ খোলাটা ওনারা কীভাবে টের পেলেন।

(৩) হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সব সময় আল্লাহ্ তাআলার করুনাময় নজরে থাকেন। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর গতিবিধি দেখা শুনা করেন। জুতা পরিহিত ছিলেন, খুলে ফেলতে বললেন। আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং ফরমান –

فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا অর্থাৎ হে মাহবুব! আপনি আমার নযরে থাকেন।

(৪) নামাযের অবস্থায় জিব্রাইল আমীনের সাথে কথা বলা, সংবাদ গ্রহণ করা, ওনার পরামর্শ অনুযায়ী আমল করার দ্বারা নামায ভঙ্গ হয় না।

দেখুন, হাদীছ এক কিন্তু গবেষকদের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন ভিন্ন।

دونوں کی ہے پرواز اسی ایک فضا میں کرگس کا جہاں اور ہے شاہیں کا جہاں اور

আল্লাহ্র কালাম ও রসুলের বানীকে ইশ্কের দৃষ্টিতে দেখা চায়।

عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ

অর্থাৎ জ্ঞান বুদ্ধি সমালোচনায় মত্ত। ইশ্কের উপরই ঈমানের ভিত্তি স্থাপন করুন।

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ وَنُوْرِ عَرْشِهٖ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ۝

বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রাহীম

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ০

তরজুমাঃ হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যা রুজিসমূহ দিয়েছি, ওগুলো থেকে উত্তম জিনিষগুলো খাও এবং আল্লাহ্‌র শুকরীয়া আদায় কর যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত কর।

যোগসূত্রঃ (১) আগের আয়াতে কাফিরদের আকীদা ও বদআমলসমূহের বর্ণনা ছিল। আকায়েদ হচ্ছে রূহের খাদ্য, আমাল দিলের। এখানে মুসলমানদেরকে দৈহিক পবিত্র খাবার সমূহ খাওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হচ্ছে অর্থাৎ কাফিরেরা দৈহিক, আত্মিক ও রূহানী নোংরা খাদ্যসমূহ গ্রহণ করে। হে মুসলমানগণ, তোমরা এ সব কলঙ্ক থেকে বিরত থেকো এবং সব সময় উত্তম খাবার খাও।

(২) আগের আয়াতে কাফিরদের জিদ ও ওদের কঠোর হৃদয়ের কথা উল্লেখিত ছিল। এ দোষ খারাপ খাদ্যসমূহ থেকেই সৃষ্টি হয়। এ জন্য মুসলমানদেরকে উত্তম খাবার সমূহ খাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেন মুসলমানগণ এসব আত্মিক দোষসমুহ থেকে নিরাপদ থাকে।

শানে নাযুলঃ আরবের কাফিরেরা হয়তো খানাপিনার ব্যাপারে কোন বাচ বিচার করতো না; হালাল হারাম সব খেয়ে ফেলতো অথবা খোদা প্রাপ্তির জন্য এমন আত্মসংযম করতো যে হালাল রুজিও খেত না। ওদের মতে নগণ্য খাওয়া বরং কিছু না খাওয়া, মোটা কাপড় পরিধান করা, জংগলে থাকা বড় ইবাদত। এদের দেখাদেখি অনেক নও মুসলিমেরও দুনিয়া ত্যাগের উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছিল। ওনারা মনে করলেন যে আত্মসংযম দ্বারা আল্লাহ্‌কে লাভ করা যায়। ওনাদেরকে বুঝানোর জন্য এ আয়াত নাযিল হয়, যেখানে বলা হয়েছে যে হালাল বস্তু ত্যাগ করা খোদা প্রাপ্তির মাধ্যম নয় বরং হারাম থেকে বিরত থাকা খোদা প্রাপ্তির সহায়ক।

· অন্যান্য মযহাবের সাথে ইসলামের তূলনা এ রকম, যেমন এক ডাক্তার কোন এক রোগীকে আরোগ্য করে বললেন, তুমি কোন সময় মাস কলাই, তৈল ও গোমাংস খেয়ো না, অন্যথায় পুনরায় রোগাক্রান্ত হবে। অন্য আর এক ডাক্তার তাঁর চিকিৎসায় আরোগ্য প্রাপ্ত রোগীকে একটি ট্যাবলেটের নাম লিখে দিয়ে বললেন, **তোমার যা ইচ্ছে খেতে পার, তবে এ ট্যাবলেটটা খেয়ে নিও, কোন ক্ষতি হবেনা।**

এতে বুঝা যায়, দ্বিতীয় ডাক্তারটা খুবই উপযুক্ত। অনুরূপ অন্যান্য ধর্ম লোকদেরকে দুনিয়া ত্যাগ শিখায়েছে কিন্তু ইসলাম দুনিয়াকে দীন করেছে এবং বলেছে যে, উন্নত খাবার খাও তবে শোকর ও ইবাদতের ট্যাবলেট ব্যবহার কর, কোন ক্ষতি হবেনা।

তাফসীরঃ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا (হে ঈমানদারগণ!) কুরআন করীম কোন কোন জায়গায় মুসলমানদেরকে আহবান করে, অতঃপর নির্দেশ দান করে। প্রায় ক্ষেত্রে এর দু'টি কারণ হয়ে থাকে। একেতঃ সেই নির্দেশ বিরক্তকর মনে হয়, মানুষ বাধ্য হয়ে গ্রহণ করে। তাই স্বীয় প্রিয় সম্বোধন দ্বারা প্রথমে আহবান করে; অতঃপর নির্দেশ শোনায়। যেমন– يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে। বিজ্ঞ ডাক্তার কঠিন অপারেশনের আগে ইন্‌জেকশান দিয়ে শরীরকে অবশ করে নেয়। আল্লাহ্‌ তাআলার সম্বোধন করুনাময় ইন্‌জেকশান। দ্বিতীয়তঃ যেই নির্দেশ খুবই শানদার হয়ে থাকে, এর শানমান দেখানোর জন্য প্রথমে আহবান করা হয় এবং পরে নির্দেশ শুনানো হয়। যেমন–

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

(হে ঈমানদারগণ, তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ কর) দরূদ ও সালাম যেহেতু খুবই শানদার বিষয় সেহেতু মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে সেই নির্দেশ শুনায়েছেন। এ আয়াতে উভয় কারণের সম্ভাবনা রয়েছে। খাবারের উপর শরয়ী বাঁধা নিষেধ মনঃপুত ছিল না। তাই প্রথমে সম্বোধন করেছেন। বা খাবার খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, যেটার উপর মানুষের জিন্দেগী নির্ভরশীল এবং ওটার সাথে পৃথিবীর শৃংখলা সম্পৃক্ত, এজন্য প্রথমে সম্বোধন করেছেন; পরে নির্দেশ দান করেছেন। লক্ষ্যণীয় যে, এ সম্বোধনে কোন জায়গায় কেবল মুমীন মুসলমান অন্তর্ভূক্ত, কোন জায়গায় মানুষ ও জ্বীন উভয় এবং কোন জায়গায় মানুষ, জ্বীন ও ফিরিশতাগণও অন্তর্ভূক্ত। যেমন–

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ

(হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কণ্ঠস্বর নবীর কণ্ঠস্বর থেকে উঁচু কর না) বা

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ

(হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সম্মুখে তোমরা কোন বিষয়ে অগ্রণী হয়ো না) এ আয়াতদ্বয়ে মানুষ জ্বীন ও ফিরিশতা সব অন্তর্ভূক্ত। যে সব আয়াতে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সম্মান করা শিক্ষা

দেয়া হয়েছে, সেখানে يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا (ঈমানদারগণ শব্দের মধ্যে মানুষ, জ্বীন, ফিরিশতা সব অন্তর্ভূক্ত। কেননা নবীকে সম্মান করা সবার জন্য অপরিহার্য। কিন্তু আলোচ্য আয়াতের সম্বোধনে মোমেন জ্বীন ও ইনসান অন্তর্ভূক্ত। কেননা এরাই পানাহার করে। ফিরিশতাগণ পানাহার থেকে মুক্ত। এ দু'সম্প্রদায়কে বলা হয়েছে যে, হে মুমিন মুসলমানগণ এবং হে মুমিন জ্বীনগণ, পবিত্র রুজি খাও। অবশ্য এটা ভিন্ন কথা যে জ্বীন সম্প্রদায়ের খাদ্য কয়লা ও হাড্ডিও, যেগুলো মানুষেরা খায় না। তবে ওদের জন্য সেটাও পবিত্র রুজি।

كُلُوا (খাও) শব্দটা নির্দেশাত্মক ক্রিয়া, যেটা কোন সময় অপরিহার্যতার জন্য এবং কোন সময় অনুমতির জন্য ব্যবহৃত হয়। খাবার খাওয়াটা কোন সময় ফরয হয়ে থাকে, কোন সময় ওয়াজিব, কোন সময় সুন্নাত, কোন সময় মুস্তাহাব, কোন সময় মকরূহ এবং কোন সময় হারাম হয়ে থাকে। জান বাঁচানোর জন্য খাওয়া ফরয, অতটুকু খাওয়া ওয়াজিব, যতটুকু খেলে ইবাদত সমূহ আদায় করতে সামর্থবান হয়, দৈনিক দু'বেলা খাওয়া রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাত। আমাদের নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সকালেও খেতেন এবং সন্ধ্যায়ও খেতেন। কুরআন মজীদে বর্ণিত আছে যে মূসা আলাইহিস সালাম স্বীয় সাথীকে বললেন آتِنَا غَدَاءَنَا (সকালের খাবার (নাস্তা) আন। মেহমানের সাথে খাওয়া মুস্তাহাব। অতিরিক্ত খাওয়া মকরূহ এবং যে খাবার ধ্বংসের কারণ হয়, সেটা হারাম। ফকীহগণ বলেন যে প্রত্যেক তবিয়তের লোক স্বীয় তবিয়ত অনুযায়ী খাদ্য খাওয়া উচিৎ। তবিয়ত বিরোধী ও ক্ষতিকর খাবার সমূহ থেকে বিরত থাকা শরীয়তের দৃষ্টিতে প্রয়োজন। উপরোক্ত আয়াতের كُلُوا শব্দের মধ্যে বড় রহস্য রয়েছে। এ নির্দেশাত্মক ক্রিয়া অপরিহার্যতার জন্যও হতে পারে, আবার মুস্তাহাব ইত্যাদির জন্যও হতে পারে অর্থাৎ হে মুসলমানগণ পেট খালি রেখো না, উপবাস রয়ে জান দিওনা। নিশ্চয় খাও অন্যথায় জঘন্য অপরাধী হবে বা হে মুসলমানগণ প্রতিদিন সকাল–সন্ধ্যা খাও। এটা মনে করো না যে আমি উপবাসকারীদের সাথে মিলিত হই। আমিতো পরহিজগারদের সাথে মিলিত হই। পরহিজগার হচ্ছে সে, যে মন্দ বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকে। তবে সব কিছু খেয়ো না বরং مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ (পবিত্র রুজি সমূহ থেকে খাও) طَيِّبَات শব্দ طَيِّبَه শব্দের বহুবচন অর্থাৎ পাক পবিত্র। আরবী অভিধানে طَيِّب ওই জিনিসকে বলা হয়, যেটা খেতে আগ্রহ হয় এবং শরীয়তের ভাষায় طَيِّب ওই জিনিসকে বলা হয়, যেটা স্বয়ং অপবিত্র নয় এবং অপবিত্র মাধ্যম দ্বারা অর্জিতও নয় অর্থাৎ ওটা স্বয়ং ভাল

এবং একে অর্জন করার মাধ্যমটাও ভাল। শুকুর গাধা, কুকুর ইত্যাদি স্বয়ং অপবিত্র হারাম। গরু হালাল কিন্তু যদি চুরি করা হয় বা ঘুষ, জুয়া ইত্যাদি হারাম পয়সা দ্বারা খরিদ করা হয়, তাহলে পবিত্র নয় বরং অপবিত্র।

সারকথা হলো ওধরনের রুজি খাও, যেটা হারাম নয় এবং অপবিত্রও নয় বরং হালালও এবং পবিত্রও। কেননা পবিত্র রুজি গ্রহণকারীদের জিন্দেগী পবিত্র হয়ে থাকে এবং অপবিত্র রুজি ভক্ষণকারীদের জিন্দেগীও অপবিত্র হয়ে থাকে। খাবারের প্রভাব মন–মানসিকতা ও ধ্যান ধারণা সবকিছুতে পতিত হয়। হালাল ও পবিত্র রুজি দ্বারা ধ্যান–ধারণায় পবিত্রতা, অন্তরে নুরানিয়াত ও নম্রতা, ইবাদত সমুহে একাগ্রতা, চোখে আদ্রতা, নামাযে স্বাদ, দোয়ায় গ্রাহ্যতা, মুখে তাসীর সবকিছু সৃষ্টি হয়। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ ফুরমায়েছেন যে শেষ যুগে লোকেরা লম্বা লম্বা দুআসমূহ প্রার্থনা করবে কিন্তু ওনাদের খাবারও হারাম হবে এবং পোষাকও। তাই দুআসমূহ কীভাবে কবুল হতে পারে। হযরত সা'দ আবি ওকাস বারগাহে নববীতে আরয করলেন, ইয়া রসুলল্লাহ আমার জন্য দুআ করুন যেন আমি মকবুলুদ্দুআ (যার দুআ বিফল হয়না) হয়ে যেতে পারি। আল্লাহ্ তাআলা যেন আমার দুআ কবুল করেন। ফরমালেন, হালাল ও পবিত্র রুজি খাও, হারাম ও নাপাক রুজি থেকে নিজের মুখ ও পেটকে বাঁচাও, তাহলে মকবুলুদ্দুআ হয়ে যাবেন।

জেনে রাখা দরকার যে মানুষ পশু থেকে কয়েকটি কারণে উৎকৃষ্ট। এর মধ্যে একটি হচ্ছে, পবিত্র খাবার ও পবিত্র স্ত্রী। যদি এ দু'টি বিষয়ে বাঁধা নিষেধ অনুসারে আমল না করে হালাল ও হারাম সবকিছু খায় এবং হালাল–হারাম প্রত্যেক মহিলার প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তাহলে ওর মধ্যে ও পশুর মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না বরং সে পশু থেকে নিকৃষ্ট। কেননা পশু জ্ঞান বুদ্ধিহীন আর মানুষ জ্ঞান–বুদ্ধি সম্পন্ন। তাছাড়া পশু প্রথমে শুঁকে দেখে, অতঃপর খায় কিন্তু মানুষ খোঁজখবর ছাড়া খাবারে মূখ দিয়া দেয়। এদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ (ওরা পশুর মত বরং পশু থেকেও অধম)

ইনসানী শারাফতের এটা অভিপ্রায় যে ওদের খানাপিনা, চলাফেরা, শোয়া–জাগা, কথাবার্তা, দেখাশুনা ইত্যাদিতে শরীয়তের প্রতিবন্ধকতা থাকা চায়। যদি এসব বিষয়ে লাগামহীন হয়ে যায়, তাহলে পশু বরং পশু থেকে নিকৃষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহ্ তাআলা ফরমান–إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ

عَنْهُ مَسْئُوْلًا (নিশ্চয় কর্ণ, চক্ষু, হৃদয়–উহাদের প্রত্যেকের সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে) আরও ফরমান مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ (মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, তা লিপিবদ্ধ করার জন্য তৎপর প্রহরী (ফিরিশতা) তার নিকটে রয়েছে) মানুষের প্রতিটি বিষয় নিয়ন্ত্রিত। দেখুন, উজীর, বাদশাহ, বিচারপতি প্রমূখের খানাপিনা, চালচলন, কথাবার্তা খুবই সতর্কতামূলক হয়ে থাকে। ওনাদের বক্তব্যের শব্দগুলো খুবই সতর্কতার সাথে নির্বাচিত করা হয়। পত্রিকায় ওনাদের বক্তব্য হুবহু ছাপা হয়। বলা হয় অমুক বাদশাহ স্বীয় বক্তৃতায় এ রকম বলেছেন। এর কারণ হলো, ওনাদের মান–মর্যাদা যত বড়, ওনাদের কথাবার্তা ও চালচলনও তত নিয়ন্ত্রিত। এ জন্যই বলা হয়েছে যে উৎকৃষ্ট রুজি খাও।

ছুফীগণের মতে উৎকৃষ্ট রুজি হচ্ছে সেটা, যেটা তিনটি দোষ থেকে মুক্ত এবং তিনটি গুনে গুণান্বিত। অর্থাৎ স্বয়ং মন্দ না হওয়া এবং মন্দ কোন উপায়ে অর্জিত না হওয়া এবং মন্দ কোন উদ্দেশ্যে যেন অর্জন করা না হয় বরং স্বয়ং ভাল হওয়া চায়, ভাল উপায়ে অর্জিত হওয়া চায় এবং ভাল উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা চায়। উদ্দেশ্যের কারণেই কাফিরের প্রতিটি জিনিস অপবিত্র যদিওবা হালাল ও উত্তম হয়ে থাকে। কেননা সেটা মন্দ উদ্দেশ্যে অর্থাৎ কুফর শিরক মূর্তি পূজার জন্য ব্যবহার করে এবং মুমিনের রুজি হালাল ও উত্তম হয়ে থাকে, কেননা সেটা ভাল উদ্দেশ্যে অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ইবাদতে ব্যবহৃত হয়। ছুফীগণ বলেন যে এখানে কেবল উত্তম খাবারের কথা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে প্রত্যেক জিনিসে উত্তম ও নিকৃষ্ট উপাদান পাওয়া যায়। কতেক চলন উত্তম, কতেক চলন নিকৃষ্ট, কতেক কথাবার্তা উত্তম, কতেক নিকৃষ্ট, কতেক দৃষ্টি ভাল, কতেক মন্দ, কতেক ধারণা ভাল, কতেক মন্দ, কতেক শোয়া জাগা ভাল এবং কতেক মন্দ বরং এ রকম বলতে পারেন যে কতেক জিন্দেগী উৎকৃষ্ট, কতেক জিন্দেগী নিকৃষ্ট, কতেক মৃত্যু উৎকৃষ্ট এবং কতেক মৃত্যু নিকৃষ্ট। মুমিনের উচিৎ যেন পবিত্র বস্তু খায়, পবিত্র ভাবে নিদ্রা যায় এবং পবিত্র ভাবে জীবন ধারণ করে ও মৃত্যুবরণ করে।

কাহিনীঃ এক জালিম ও অত্যাচারী বাদশাহ কোন এক বুযূর্গের কাছে জিজ্ঞাসা করলো, উৎকৃষ্ট ইবাদত কি? তিনি ফরমালেন, তোমার জন্য দ্বিপ্রহর পর্যন্ত শোয়া উৎকৃষ্ট ইবাদত যেন জেগে মখলুককে জ্বালাতন করতে না পার।

ظالمے را خفته دیدم نیم روز ÷ گفتم ایں فتنه است خوابش برده به

وان که خوابش بهتر ازبیداری است ÷ زاں چناں بدزندگانی مرده به

অর্থাৎ আমি একজন জালিমকে অর্ধ দিবস ঘুমন্ত অবস্থায় দেখে বললাম যে এ ব্যক্তি একটি ফিৎনা. (যাবতীয় অন্যায়–অত্যাচারে হোতা) যার নিদ্রা জাগ্রত থাকা থেকে উত্তম। এ ধরনের হতভাগা মানুষের মৃত্যুই শ্রেয়।

সারকথা হলো মুমিন সমগ্র জগত থেকে উৎকৃষ্ট। তাই ওনার সমস্ত কাজকর্ম উৎকৃষ্ট হওয়া চায়। আজকাল যে সব লোকেরা ইসলামী বাঁধা নিষেধকে অপছন্দ করে এবং কাফিরদের লাগমহীন জিন্দেগী পছন্দ করে, তারা আসলে ইনসানী পোষাক ত্যাগ করে পশুত্ব বরণ করে নিতে চায়। এটা আজাদী নয় বরং বরবাদী। আমরা দেখেছি যে বাদশাহদের খাবার ও পানি টেষ্ট করে ওনাদেরকে খেতে দেয়া হয়, যাতে কোন শত্রু বিষ বা ক্ষতিকর কোন কিছু মিশাতে সক্ষম না হয়। হে মুসলমানগণ, তোমাদের খানাপিনাও পরীক্ষিত হওয়া চায়, যেন শয়তান বিষ বা ক্ষতিকর কোন কিছু মিশাবার সুযোগ না পায়। এ জন্যই বলা হয়েছেঃ كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ (যা রুজি সমূহ দেয়া হয়েছে, ওগুলো থেকে উত্তম জিনিসগুলো খাও এবং আল্লাহ্‌র শুকরীয়া আদায় কর) হালাল রুজির পর আল্লাহ্‌র শুকরীয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন এ শুকরীয়ার বরকতে সেই রুজি ক্ষতিকর না হয় অর্থাৎ শুকরীয়া আদায় কর যে আল্লাহ্ তোমাকে হালাল রুজি দিয়েছেন, তোমাকে নেক কাজ করায় তৌফিক দান করেছেন। কেননা এ সব আল্লাহ্‌র তরফ থেকেই প্রদত্ত, আমাদের নিজস্ব ক্ষমতা বলে অর্জিত কিছু নেই।

শুকর তিন রকম হয়ে থাকে–দু'টি সার্বিক এবং একটি বিশেষ। সার্বিক শুকরের একটি হচ্ছে–মানুষ স্বীয় জানমালকে যেন নিজের উপযুক্ততার ফসল মনে না করে বরং আল্লাহ্‌র অবদান মনে করে। ঘুড়ি কত উর্ধে উড্ডয়ন করে কিন্তু স্বীয় ক্ষমতা বলে উড়ে না, উড্ডয়নকারীর সূতার বদৌলতে উড়ে। এ জন্যই দেখা যায় যে অনেক বেকুব সম্মানিত হয় এবং অনেক বুদ্ধিমান অপদস্থ হয়। একই ব্যক্তি কোন সময় সিংহাসনে উপবেশন করে, আবার কোন সময় মাটিতে উপবেশন করে। যদি এটা স্মরণ থাকে, তাহলে ইনশাআল্লাহ্ কখনো মনে অহংকার সৃষ্টি হবেনা।

সার্বিক শুকরের অপরটি হচ্ছে–মানুষ যেন প্রত্যেক নিয়ামতের হক আদায় করে। যেমন পানাহারের পর শরীরে শক্তি আসলে, সেই শক্তি দ্বারা যেন আল্লাহ্‌র

ইবাদত করা হয় এবং বিশেষ শুকর হচ্ছে–যদি আল্লাহ্ তাআলা আমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত রুজি আমাদেরকে দেয়, তাহলে সেটা কেবল আমাদের জন্য নয় বরং এতে গরীব মিসকীনদের অংশ রয়েছে। তাই এর যেন বিশেষ শুকরীয়া করা হয় যে ওসব লোকেরা স্বীয় রুজি আমাদের হাত দ্বারা খায়।

شکر بجاآر که مهمان تو ÷ روزی خودمی خورداز خوان تو

অর্থাৎ শুকরীয়া জ্ঞাপন কর যে তোমার মেহমান তোমার দস্তরখানায় স্বীয় রিযিক যাচ্ছে।

প্রত্যেক নিয়ামতের শুকর পৃথক পৃথক। সফলকাম বান্দা হচ্ছে সে, যে সফলকাম শুকর গুজারকারী হয়ে জিন্দেগী যাপন করে।

إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ (যদি তোমরা তারই ইবাদত কর) এ অংশটা হচ্ছে শর্ত এবং আয়াতের আগের অংশটা হচ্ছে এর জযা। অর্থাৎ হে মুসলমানগণ! যদি তোমরা সঠিক অর্থে আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তাহলে তাঁর প্রদত্ত পবিত্র রুজি খাও এবং শুকরও আদায় কর, তখন তোমরা সত্যকার আবেদ হবে। বা উপরোক্ত আয়াতের ভাবার্থ এটাই যে, কেবল নামায রোযাই ইবাদত নয় বরং হালাল রুজি উপার্জন ও খাওয়া এবং এর শুকরীয়া আদায় করাও ইবাদত। যে ব্যক্তি সুস্থ ও সবল হয়ে হালাল রুজি উপার্জন না করে, ভিক্ষা বৃত্তি করে জিন্দেগী অতিবাহিত করে, সে সত্যকার আবেদ নয়।

কাহিনীঃ এক ব্যক্তি খুবই সুস্থ ছিল। ওর স্ত্রী ওকে উপার্জন করার জন্য জোর দেয়ায়, একদিন সে সফরে বের হলো। জংগলে একটি পঙ্গু শৃগালকে দেখলো, যেটা খুবই মোটা তাজা ছিল। সে আশ্চর্য হলো যে এটা কোথেকে খায়? তা দেখার জন্য সে সেখানে অবস্থান করলো। সন্ধ্যার কাছাকাছি সময়ে দেখলো যে একটি বাঘ এক শিকার ধরে আনলো, কাছে বসে কিছু খেল এবং বাকী অংশ ফেলে চলে গেল। শৃগালটি হামাগুড়ি দিয়ে ওখানে গেল এবং তৃপ্তি সহকারে খেল। দ্বিতীয় দিন প্রায় একই সময় এক চিতাবাঘ কিছু শিকার নিয়ে এসে সেই জংগলে বসে কিছু খেয়ে অবশিষ্টগুলো ফেলে চলে গেল। শৃগালটি পুনরায় তৃপ্তিসহকারে খেয়ে নিল। তৃতীয় দিন নেকড়ে বাঘও শৃগালকে এভাবে খাওয়ালো। এ ব্যক্তি ওখানে সাতদিন অবস্থান করলো এবং প্রতিদিন শৃগালকে এভাবে খেতে দেখলো। তখন সে মনে মনে বললো, হে মওলা, যখন তুমি এভাবে রুজি দাও, তাহলে আমি কেন উপার্জন করবো। কিছুদূর গিয়ে একটি মসজিদে বসে রইলো এবং অপেক্ষা করতে রইলো, যেন কোন জায়গা থেকে অদৃশ্য ভাবে খাবার এসে যায়।

কিন্তু কোন জায়গা থেকে কিছু আসলো না। পাঁচ দিন উপবাস রইলো; অবস্থা একেবারে কাহিল হয়ে গেল, সিজদায় পতিত হয়ে আল্লাহ্‌র কাছে আরাধনা করলো হে আল্লাহ্, আমি কি শৃগাল থেকে অধম, ওকে তুমি প্রতি দিন অদৃশ্য ভাবে রুজি পৌঁছাও, আর আমি কয়েক দিন ধরে উপবাস পড়ে রইলাম, আমার কোন খবর নিচ্ছেন না। এ অবস্থায় ঘুম এসে গেল, তখন সে স্বপ্ন দেখলো যে, কেউ বলছে, হে কমবখত। তোকে হাত–পা উপার্জনের জন্য দেয়া হয়েছে, উঠ, ওগুলো নাড়া চাড়া কর। তুমি কি শুধু শৃগালকে দেখেছ? বাঘ বা চিতা বাঘকে দেখনি, যে নিজেও খায় এবং অপরকেও খাওয়ায়। পঙ্গু শৃগাল হতে চেয়ো না, বাঘ হয়ে নিজে খাও এবং পঙ্গু লোকদেরকেও খাওয়াও। যখন তুমি হাত–পা বিহীন হয়ে যাবে, তখন আমি তোমার জন্য কোন এক বাঘকে নিয়োজিত করবো। এ জন্য আল্লাহ্ তাআলা ফরমায়েছেন, হে মুসলমানগণ, যদি তোমরা আমার সঠিক ইবাদত করতে চাও, তাহলে হালাল রুজিও খাও এবং শুকরও আদায় কর।

এ আয়াতের বাস্তব উদাহরণ হচ্ছে হুযূর ((সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর সাহাবার আমল। আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে যেন ওনাদের পথচিহ্নের উপর চলার তৌফিক দান করেন।

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ وَنُوْرِ عَرْشِهٖ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَسَلَّمَ -

বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রাহীম

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ
عَلَيْهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

তরজুমাঃ আল্লাহ্ তোমাদের উপর হারাম করেছেন কেবল মৃত, রক্ত এবং শুকুরের মাংস এবং সেই পশু যেটা গায়রুল্লাহর নামে জবেহ করা হয়েছে। তবে যে অনন্যোপায় কিন্তু স্বাদের লালসাকারী এবং সীমা লংঘনকারী নয়, ওর বেলায় কোন গুনাহ নেই। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

যোগসূত্রঃ আগের আয়াতে মুসলমানগণকে হালাল ও উত্তম জিনিস খাওয়ার এবং হারাম ও নিকৃষ্ট জিনিস থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এবার এর বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। যেহেতু হালাল ও পবিত্র জিনিস অগণিত এবং হারাম ও নাপাক জিনিস মাত্র কয়েকটি, সেহেতু এ আয়াতে ওগুলো উল্লেখিত হয়েছে, যেন বুঝা যায় ওগুলো ছাড়া বাকী সব হালাল। কেননা প্রত্যেক জিনিস মূলতঃ মুবাহ, হুরমতটা প্রাসঙ্গিক বিষয়।

তাফসীরঃ إِنَّمَا শব্দটি পরবতী শব্দকে জোর দেয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ প্রথম শব্দটা পরবর্তী শব্দকে জোর দেয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। পরবর্তী শব্দ প্রথম শব্দের জন্য নয়। যেমন আল্লাহ্ তাআলা ফরমান- قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ এর অর্থ এ নয় যে আমিই বশর। আমি ছাড়া কোন বশর নাই। বরং, এর অর্থ হচ্ছে আমি বশরই, রব নই, তাঁর অংশও নই। আর এক জায়গায় ফরমায়েছেন إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ এর অর্থ এ নয় যে আল্লাহ্ তাআলাই এক, অন্য কোন জিনিস এক নয় বরং এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্ একই, তাঁর মধ্যে কোন দ্বিতীয় নেই, সত্বাগত হোক বা গুণগত।

সারকথা হচ্ছে إِنَّمَا এর অর্থ কেবল বা একমাত্র। সুতরাং আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের উপর কেবল এ পরবর্তী উল্লেখিত জিনিসগুলো হারাম করেছেন। এ إِنَّمَا শব্দের বেলায় এখানে দু'টি আপত্তি রয়েছে। এক এখানে চারটি জিনিসের কথা উল্লেখিত আছে। অন্য আয়াতে ৭/৮টি জিনিসের কথা উল্লেখিত আছে। যেমন- اَلنَّطِيحَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ الخ

তাহলে এখানে চারের মধ্যে সীমাবদ্ধতা কীভাবে শুদ্ধ হলো। এর উত্তর হচ্ছে পরবর্তী আয়াতের আটটি বিষয় প্রথম চারের অন্তর্ভূক্ত। দেখুন, যে পশু শিং এর

গুতায়, গুলির আঘাতে, লাঠির আঘাতে বা উপর থেকে নীচে পড়ে মারা যায় বা যেটাকে পশু খেয়ে ফেলে, এসব মৃতের অন্তর্ভূক্ত।

দ্বিতীয় আপত্তি হলো যে এ আয়াতে কেবল চারটি জিনিসের হারামের কথা উল্লেখিত হয়েছে অথচ হাজার হাজার পশু হারাম যেমন কুকুর, বিড়াল ইঁদুর ইত্যাদি। তাই এখানে সীমাবদ্ধকরণ অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাদের উপর কেবল চারটি জিনিস হারাম করেছেন-এ রকম বলা কীভাবে শুদ্ধ হতে পারে।

এর জবাব হলো যে এখানে প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ্‌র হারামকৃত চারটি জিনিসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বাদ বাদী সমস্ত হারাম জিনিস আল্লাহ্ তাআলা পরোক্ষভাবে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মাধ্যমে করেছেন। কেননা আল্লাহ্ তাআলা জানতেন যে শেষ যুগে হাদীছ অস্বীকারকারীর দল সৃষ্টি হবে, যারা বলবে যে আমাদের জন্য কেবল কুরআন যথেষ্ট। ওদের মুখ বন্ধ করার জন্য আল্লাহ্ তাআলা কুরআন করীমের প্রত্যক বিষয় সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণনা করেছেন। দেখুন কলেমার পর ইসলামের প্রথম রুকন নামায। কিন্তু কুরআন করীম কেবল নামাযের নাম উচ্চারণ করেছে, নিয়ম কানুনের কথা কোথাও উল্লেখ করেনি। এ আয়াতেও সংক্ষেপে এটা বলে দিয়েছেন যে তোমাদের জন্য মৃত, রক্ত হারাম। এটা বলেননি মৃতের কোন্ কোন্ অংশ দ্বারা কি কি কাজ করা হারাম এবং কোন্ ধরনের রক্তের কোন্ ধরনের ব্যবহার হারাম।

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ্ তাআলা ফরমান, শুকুরের মাংস হারাম। কিন্তু সেটার কলিজা, গোর্দা, মাথা পায়ের কথা উল্লেখ নেই। এটা একমাত্র এ জন্য যে মুসলমান কুরআন বুঝার জন্য যেন প্রতি পদে জনাব মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুহতাজ থাকে। এ নিশ্চুম কুরআনকে মুখে পড়ুন এবং মুখরিত কুরআন (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম) কে অন্তরে লিখুন। তখন কোন সমস্যা হবে না।

حَرَّمَ (হারাম করেছেন) এ শব্দটি تَحْرِيمٌ শব্দ থেকে গঠন করা হয়েছে, যার মূল শব্দ حَرَّمَ বা حَرَامٌ এর অর্থ দূরে বা পৃথক থাকা। হারাম শব্দটা সম্মানজনকও এবং জিল্লতীপূর্ণও। শুকুর, কুকুর হারাম ও ঘৃণার পাত্র ওগুলো থেকে দূরে থাক। কাবাতুল্লাহির হারাম, মসজিদে হারাম, মুহরেমুল হারাম, শাহরুল হারাম সম্মানজনক ও পবিত্র বিষয়, ওগুলোর বেআদবী থেকে দুরে থাক। বুঝা গেল যে একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন সম্পর্কের কারণে ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। যেমন বশর শব্দ। এটা যদি নবীর গুণবাচক হয়, তাহলে এর অর্থ অনেক শানদার হবে। তখন এর অর্থ হবে ফিরিশতার মাধ্যম ছাড়া আল্লাহ তাআলার কুদরতী হস্তে তৈরী। কারিগর

মামুলী জিনিস তার অধীনস্থ শ্রমিকদের দ্বারা তৈরী করায় কিন্তু শানদার জিনিস যেটায় নিজের যোগ্যতা দেখাতে চায়, সেটা নিজ হাতে তৈরী করে। আল্লাহ্ তাআলা ফরমান হে ইবলীস, তুমি ওনাকে সিজদা কেন করনি, যাকে আমি নিজ হাতে তৈরী করেছি। যদি বশর আমাদের মত লোকের গুণবাচক শব্দ হয়, তাহলে এর অর্থ হবে আবরণ ধারণকারী মখলুক। দেখুন, শব্দ এক কিন্তু অর্থ ভিন্ন।

عَلَيْكُمْ শব্দে কেবল মুসলমানগণকে সম্বোধন করা হয়েছে অর্থাৎ হে মুসলমানগণ! এ নাপাক জিনিসগুলো আল্লাহ্ তাআলা কেবল তোমাদের জন্য হারাম করেছেন এবং কাফিরেরা যদি খায়, তাহলে ওদেরকে খেতে দাও। কারণ নিয়ম হচ্ছে, যাদের মর্যাদা যত বেশী, ওদের উপর বাঁধা নিষেধ তত বেশী হয়ে থাকে। আমরা যেখানে ইচ্ছে, যেতে পারি এবং যা ইচ্ছে খেতে পারি, কিন্তু রাজা বাদ্‌শাহদের চলাফেলার রাস্তা নির্ধারিত এবং পাহারাদার নিয়োজিত থাকে। ওনাদের খাবার টেষ্ট করার পর ওনাদেরকে খেতে দেয়া হয়, যেন শত্রু বিষ বা ক্ষতিকর কোন কিছু মিশাতে না পারে। ওনাদের কথাবার্তা নিয়ন্ত্রিত, কারণ ওনাদের কথা নানা ভাষায় অনুদিত হয়ে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। মোট কথা রাজা–বাদ্‌শাহদের প্রতিটি কাজ প্রতিটি আচরণ নিয়ন্ত্রিত। এ নিয়ন্ত্রণ ভঙ্গ করলে তাঁদের পতন অনিবার্য।

মুসলমানগণ! আপনারা হলেন হাবীবে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর উম্মত। আপনাদের মর্যাদা অনেক উর্ধে। আপনাদের খানাপিনা, চাল–চলন, কথাবার্তা মোট কথা প্রত্যেক কাজ নিয়ন্ত্রিত। আল্লাহ্ তাআলা ফরমান–

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

(তোমাদের কান, চোখ, অন্তর সবের আচরণের জবাবদিহি করতে হবে) আরও ফরমমান مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (তোমাদের মুখ থেকে যে কথা বের হয়, সেটা লিপিবদ্ধ করার জন্য আমার সজাগ প্রহরী নিয়োজিত আছে) মোটকথা ইসলামে এ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে আমাদেরকে মানুষ বানিয়েছেন। এ নিয়ন্ত্রণসমূহ ভঙ্গকারী মূলতঃ মানুষের সীমানা অতিক্রম করে পশু হয়ে যায়। এটা মানুষের স্বাধীনতা নয়, বরং অধঃপতন। বুলবুল পাখী ফুল ভক্ষণ করে জীবন ধারণ করে, আবর্জনার পোকা আবর্জনা খেয়ে বেঁচে থাকে। যদি বুলবুল পাখী আবর্জনা খায়, তাহলে মারা যাবে। কাফিরেরা সুদ খেয়ে বেঁচে থাকবে আর মুসলমানগণ যাকাত প্রদান করে বেঁচে থাকবে।

অর্থাৎ এ উম্মতে মুহাম্মদীকে অন্যান্য জাতির সাথে তুলনা কর না। এ উম্মতকে ভিন্ন ভাবে তৈরী করা হয়েছে। অবৈধ প্রতিবন্ধকতা অপসারিত হওয়ার নাম আজাদী এবং বৈধ প্রতিবন্ধতা অপসারিত করার নাম উৎশৃংখলতা। আজাদী নিয়ামত এবং লাগামহীনতা আজাব। গোলামের আজাদী নিয়ামত কিন্তু স্ত্রীর তালাক মসীবত।

اَلْمَيْتَةَ শব্দটা مَوْت শব্দ থেকে গঠন করা হয়েছে। এর অর্থ হলো প্রাণীর প্রাণহীন হয়ে যাওয়া। مَيِّت ও مَيْتَة এ দু'শব্দের মধ্যে কোন কোন সময় এভাবে পার্থক্য করা হয় যে হালাল অবস্থায় মরা প্রাণীকে مَيِّت বলা হয় এবং হারাম অবস্থায় মরা প্রাণীকে مَيْتَة বলা হয়।

শরীয়তের পরিভাষায় مَيْتَة ওই ধরনের পশুকে বলা হয়, যেটা জবেহের উপযুক্ত কিন্তু জবেহহীন অবস্থান মারা যায়। এ কারণে মাছ ও ফড়িং مَيْتَة এর অন্তর্ভূক্ত নয় কেননা এদের মধ্যে প্রবাহমান রক্ত নেই এবং জবেহের উপযুক্ত নয়। শরীয়তে তিন ধরনের জবেহের নিয়ম আছেঃ

শিকার জবেহ করার নিয়ম হচ্ছে 'বিস্‌মিল্লাহ আল্লাহ্ আকবর' বলে ওটার প্রতি তীর বা ধারালো বস্তু নিক্ষেপ করা বা ওটার প্রতি শিকারী পশু বা পাখী লেলিয়ে দেয়া। এ শিকার যদি তীরের আঘাতে বা শিকারী কুকুরের কামড়ে বা শিকারী পাখীর আঁচড়ে মারাও যায়, তবুও হালাল। এটা শরয়ী জবেহ হিসেবে গণ্য হয়ে গেল। যে পশু পালিয়ে কূপে গিয়ে পতিত হয়ে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, ওকে বিস্‌মিল্লাহ বলে কোন এক জায়গায় জখম করলে হালাল হয়ে যায়। শরীয়তে এটাই এর জবেহ বলে বিবেচ্য। যে পশু নিয়ন্ত্রণাধীন, ওটার জবেহের নিয়ম হচ্ছে, ধারালো কোন কিছু দ্বারা কণ্ঠনালী ও এর সংলগ্ন রগ কেটে দেয়া। এ তিন ধরনের প্রাণহরণ ব্যতীত অন্য যে কোন ভাবে মারা হলে, مردار (মরা) হিসেবে গন্য। ওগুলো খাওয়া হারাম। তবে ওগুলোর চামড়া, পশম, শুকনো হাড্ডি অন্য কাজে ব্যবহার করা যায়।

وَالدَّم (রক্ত) বলতে প্রবাহমান রক্তকে বুঝানো হয়েছে। অবশ্য জমাট বাঁধা রক্ত যেমন তিলি, কলিজা হালাল। তবে প্রবাহমান রক্ত যেটা জমে যায়, সেটা হারাম। রক্তের লক্ষণ হচ্ছে, বের হবার সময় লাল বের হয় এবং জমে গেলে কালো হয়ে যায়। মাছ থেকে যে লাল পানি বের হয়, সেটা রক্ত নয়। কারণ সেটা পরে সাদা হয়ে যায়, কালো হয় না।

ছুফিয়ানে কিরাম বলেন যে মৃত ও রক্তের এ ব্যাখ্যা একেবারে বরহক। কিন্তু অন্যভাবে বলা যায় যে দুনিয়া হলো মুর্দার, যদি সেটার উপর আল্লাহ্‌র নাম নেয়া না হয় এবং মুসলমান ভাইদের ইজ্জত ও জানমাল হলো যেন রক্ত। হে মুসলমানগণ! তোমাদের জন্য এ জিনিসদ্বয় হারাম, দুনিয়ার কাছেও যেও না এবং মুসলমান ভাইদেরকেও অপমানিত করো না। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে–

اَلدُّنْيَا جِيْفَةٌ وَطَالِبُهَا كَلَابٌ দুনিয়া হলো মুর্দার, এর তলবকারী হচ্ছে কুকুর বিশেষ। উল্লেখ্য যে কাকও মৃত ভক্ষণকারী এবং কুকুরও। কিন্তু কাকের অভ্যাস হলো অন্যান্য কাককে জড়ো করে খাওয়া কিন্তু কুকুর অন্যান্য কুকুরকে তাড়ায়। যদিওবা সেই মৃত প্রাণী ওর চাহিদার অতিরিক্ত হয়। দুনিয়া তলবকারী মানুষের অবস্থাও একই রকম। এরা অন্যদের খানাপিনা পছন্দ করেনা। ছুফিগণের মতে, যে কাজ নফ্‌সের জন্য করা হয় এবং আন্তরিকতার অভাব থাকে, সেটা দুনিয়া।

সায়্যেদেনা উসমান গণীর সম্পদ দুনিয়া ছিলনা বরং দীনই ছিল এবং মুনাফেকদের নামাযও দুনিয়া ছিল।

وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ(এবং শুকূরের মাংস) যদিওবা শুকূরের প্রত্যেক কিছু হারাম এবং কোন কাজে ব্যবহার করা যায় না। কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলা কেবল মাংস হারাম হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। এর রহস্য হলো যে মুসলমানগণ এর অন্যান্য অংশ হারাম হওয়ার বিষয়টা জানার জন্য যেন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর শিক্ষার মুখাপেক্ষি হয় অর্থাৎ শুকূরের মাংসতো আমি হারাম করছি, এর চর্বি, কলিজা গোর্দা ইত্যাদি হারাম হওয়া সম্পর্কে আমার মাহবুর থেকে জেনে নাও। হাদীছ অস্বীকারকারীরা এ সবের হুরমত কুরআন থেকে প্রমাণ করতে পারবে না।

উল্লেখ্য যে, শুকুর মুলতঃ হারাম এবং মুর্দার ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক হারাম অর্থাৎ মুলতঃ ওটা হারাম ছিলনা, কিন্তু কোন প্রাসঙ্গিক কারণে হারাম হয়ে গেল।

ছুফিয়ানে কিরাম ফরমান, নফ্‌সে আম্মারা যেন শুকুর ও নফ্‌সের হারাম বাসনা, ইসলাম বিরোধী আকীদা যেন শুকূরের মাংস। মুসলমানদের জন্য ওগুলো থেকে বিরত থাকা এ রকম প্রয়োজন, যে রকম শুকূরের মাংস থেকে বিরত থাকা হয়।

وَمَا اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ (এবং যে পশু গায়রুল্লাহের নামে জবেহ করা হয়েছে) এ বাক্যাংশের তিন ধরনের তফসীর রয়েছে–জাহেলানা তাফসীর,

আলেমানা তাফসীর এবং আশেকানা তাফসীর। জাহেলানা তফসীর হচ্ছে সেটা, যা আজকাল সাধারণ অনুবাদ গ্রন্থ পড়ুয়া কাটমোল্লারা বয়ান করে লোকদেরকে গুমরাহ করে। তাদের মতে اُهِلَّ শব্দটা اِهْلَال থেকে গঠন করা হয়েছে, যার অর্থ ডাকা। ও রকম প্রতিটি জিনিস হারাম যেটার উপর গায়রুল্লাহর নাম নেয়া হয়। সুতরাং গিয়ারবী শরীফের খাবার, কারো মানতের টাকা পয়সা, ওরসে জবেহকৃত পশু ইত্যাদি সব কিছু হারাম, কেননা ওগুলোতে গায়রুল্লাহর নাম লওয়া হয়। যেমন বলা হয় যে এটা গাউছে পাকের ছাগল, খাজা আজমীরীর ফাতেহার হালুয়া, অমুক মাযারের তাবরুক, অমুক খানকার ডেকসী ইত্যাদি। এ গুলো সব হারাম এবং এ আয়াতের বিপরীত প্রমাণিত হয়। কিন্তু এ তাফসীর একেবারে বাতিল ও ভ্রান্ত। এটা তাফসীর নয় বরং আল্লাহ্‌র কালামের অর্থগত বিকৃতি। এ তাফসীর কুরআনের আয়াত, হাদীছে নব্বী, সাহাবায়ে কিরামের আমল এবং উম্মতের আকীদার বিপরীত, এমনকি স্বয়ং ওদের মুরুব্বীদের উক্তিরও বিপরীত।

চিন্তা করে দেখুন, আগে কাফিরেরা তাদের মূর্তিদের নামে চার প্রকার পশু ছেড়ে দিতো এবং বলতো যে, এ পশুগুলো হারাম। আল্লাহ্‌ তাআলা ওদের বক্তব্য খণ্ডন করে ইরশাদ ফরমায়েছেনঃ

مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَائِبَةٍ وَّلَا وَصِيْلَةٍ وَّلَا حَامٍ وَّلٰكِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ –

অর্থাৎ এসব কাফিরেরা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয় যে এরা এসব পশুগুলোকে হারাম মনে করে। আল্লাহ্‌ তাআলা ওগুলোকে হারাম করেনি। অন্যত্র মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করে বলেন–

فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَّاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

অর্থাৎ হে গাজীগণ! গণীমত হিসেবে যা তোমাদের হাতে আসে, বহীরা সায়েবা হোক বা অন্য প্রকার, সব হালাল ও পবিত্র এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ক্ষমা প্রদানকারী মেহেরবান। এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে মূর্তিদের নামে ছেড়ে দেয়া পশু ও অন্যান্য জিনিস হালাল এবং পবিত্র, ওগুলোকে হারাম মনে করা শয়তানের অনুসরণ বুঝায়।

হুযূর নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তিন ভাগ কুরবাণী করতেন। একভাগ নিজের জন্য, দ্বিতীয় ভাগ তাঁর স্ত্রীগণের পক্ষ থেকে এবং তৃতীয় ভাগ তাঁর উম্মতের পক্ষ থেকে এবং জবেহ করার সময় বলতেন

اَللّٰهُمَّ هٰذَا لِاُمَّةِ مُحَمَّدٍ (হে আল্লাহ্ এটা আমার উম্মতের নামে। ওদের উপরোক্ত তাফসীর মতে এ সব পশু হারাম হওয়া উচিৎ ছিল। হযরত সা'দ (রাদি আল্লাহু আনহু) হুযূরের খেদমতে এসে আরয করতে লাগলেন, ইয়া রসূলল্লাহ! আমার মা মারা গেছেন। আমি ওনার খেদমত করতে চাচ্ছি। ফরমালেন, মদীনায় পানির ঘাটতি আছে। ওনার নামে পানি খয়রাত কর। সে মতে তিনি এক কূপ খনন করালেন এবং বললেন هٰذَا لِاُمِّ سَعْدٍ (এ কূপ সা'দের মায়ের নামে উৎসর্গিত) সেই কূপ এখনও আবাদ আছে। নবীর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সাধারণ মুসলমান সেই কূপের পানি পান করে আসতেছে।

উপরোক্ত তাফসীর মতে সেই কূপের পানি হারাম হওয়া উচিৎ ছিল। কেননা সেটাতে সাদের মায়ের নাম নেয়া হয়েছে।

হযরত আবু হুরাইরা (রাদি আল্লাহু আনহু) বলতেন যে কোন আল্লাহ্র বান্দা মসজিদে ইশায় গিয়ে দু'রাকাত নামায পড় তো এবং বল তো

هٰذَا لِاَبِيْ هُرَيْرَةَ 'এটা আবু হুরাইরার জন্য'। উপরোক্ত তাফসীর মতে সেই নামায হারাম হয়ে যায়। মদীনা মনোয়ারায় গিয়ে দেখুন বিভিন্ন নদী ও সরাইখানা বিভিন্ন লোকের নামে পরিচিত। উপরোক্ত তাফসীর মতে এসব নাজায়েয ও হারাম হয়ে যায়। এবার ফকীহগণের ফত্ওয়া দেখুনঃ

হযরত মাওলানা আহমদ জয়ুন (রহমতুল্লাহে আলাইহি) তাফসীরাতে আহমদীয়ায় এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, আমাদের যুগে আওলীয়া কিরামের মানত হিসেবে যে গরু রাখা হয়, সেটা হালাল এবং পবিত্র। কেননা সেটা আল্লাহর নামে জবেহ করা হয়।

ফত্ওয়ায়ে আলমগীরীতে বর্ণিত আছে যে মজুসী সম্প্রদায় অগ্নি দেবতার নামে পশু পালন করলো। সেটা দেবতার সামনে নিয়ে গেল এবং মুসলমান দ্বারা জবেহ করালো। মুসলমান বিস্মিল্লাহ বলে জবেহ করলে, সেই পশু হালাল। কেননা যদিওবা সেই পশু পালন করা হয়েছে মূর্তির নামে কিন্তু জবেহ করা হলো আল্লাহ্র নামে।

সাধারণ মুসলমানগণ, যাদের মধ্যে আল্লাহ্র ওলী, ওলামা, নেক্বান্দা সব অন্তর্ভূক্ত, সব সময় বুজুর্গানে কিরামের নামে ইছালে ছওয়াবের উদ্দেশ্যে খানা তৈরী করেন, পশু জবেহ করেন, সেই খাবারকে তাবরুক হিসেবে নিজেরা খায় ও অন্যান্যদেরকে খাওয়ায়। স্বয়ং অস্বীকারকারীদের মুরব্বী মওলভী রশীদ আহমদ

সাহেব গাঙ্গুহী স্বীয় ফত্ওয়ায়ে রশিদিয়ায় ফত্ওয়া দিয়েছেন যে যদি হিন্দু ছাত্র হুলি ও দিওয়ালী পূজার প্রসাদ স্বীয় মুসলমান শিক্ষককে দেয়, তাহলে সেটা মুসলমানের জন্য হালাল। যখন মূর্তিদের নামে প্রদত্ত প্রসাদ হারাম হয় না, তাহলে গাউছে পাক, ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) এর নামে প্রদত্ত খাবার, শরবত কীভাবে হারাম হতে পারে। যুক্তিও বলে যে এ তাফসীর ভ্রান্ত। কেননা পৃথিবীতে এমন কোন জিনিস নেই, যেটা কোন নামের সাথে সম্পৃক্ত নয়। আমার ঘর, তোমার কূপ অমুকের গরু, অমুকের মহিষ, অমুকের মসজিদ, এমনকি অনেক শহর ও গ্রামের নাম বিভিন্ন ব্যক্তির নামে হয়ে থাকে। যেমন জিব্রাল্টার প্রণালী, নাহারে জুবাইদা ইত্যাদি। যদি এসব হারাম হয়ে যায়, তাহলে জীবন যাপন অসম্ভব হয়ে পড়বে। সার কথা, এটা তাফসীর নয়, বরং কুরআন শরীফের অপব্যাখ্যা।

আলেমানা তাফসীরঃ ওলামায়ে কিরাম বলেন যে যদিওবা প্রচলিত অর্থে

اِهْلَالٌ (ইহলাল) প্রত্যেক আহবানকে বুঝায় কিন্তু শরীয়তে জবেহের সময় আওয়াজ দেয়ার নামই اِهْلَالٌ যেমন صَلٰوةٌ (সালাত) শাব্দিক অর্থে প্রত্যেক দুআকে বুঝায় কিন্তু শরীয়তে বিশেষ দুআ অর্থাৎ নামাযকে বুঝায়। যেমন– اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ (নামায কায়েম কর)। অনুরূপ مَا اُهِلَّ বলতে জবেহ করাকে বুঝানো হয়েছে। তখন আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়, সে পশু হারাম, যেটা গায়রুল্লাহের নামে জবেহ করা হয়। এ জন্য তাফসীর জালালাইন, মাদারিক, বয়জাবী, ইবনে আব্বাস, খাজেন, কবীর, মায়ালিমুত তানযীল, আবু সাউদ, তাফসীরে আহমদী ইত্যাদি তাফসীরে اِهْلَالٌ শব্দের, অর্থ করা হয়েছে–জবেহ। এ তাফসীর দ্বারা আয়াতটি একেবারে সুস্পষ্ট হয়ে গেল এবং এ আয়াত সম্পর্কে আর কোন দ্বিমত নেই যে, যে পশু গায়রুল্লাহর নামে জবেহ করা হয়, সেটা হারাম।

স্মরণ রাখা দরকার যে মুশরিক যদি খোদার নামেও জবেহ করে, তবুও সেই পশু হারাম। কেননা কেবল মুসলমান ও আহলে কিতাবের জবিহাই হালাল। অধিকন্তু যদি কোন জায়গায় বা কোন বাদ্শা বা অন্যান্যদের সম্মানে বা ইবাদতের নিয়তে পশু জবেহ করে, তাহলে সেটা হারাম। এর বর্ণনা সেই আয়াতে রয়েছে– وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ। এ জন্য ফকীহগণ বলেন যে বাদ্শার আগমণ উপলক্ষে ওর সম্মান ও ইবাদতের নিয়তে যে পশু জবেহ করা হয়, সেটা হারাম যদিওবা খোদার নামেই জবেহ করা হয়।

আশেকানা তাফসীরঃ ছুফিয়ানে কিরাম বলেন যে غَيْرَ শব্দের অর্থ দু'টি – ব্যতীত এবং দুশমন। আল্লাহ্‌র নবী ও ওলীগণ আল্লাহ্‌র গায়র (দুশমন) নয় বরং আপনজন। আল্লাহ্ তাআলা ফরমান أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ এরা আল্লাহ্‌র দল এবং আল্লাহ্‌র দলই কৃতকার্য। কাফির, মূর্তি, শয়তান আল্লাহ্‌র গায়র এবং আল্লাহ্‌র দুশমন। আল্লাহ্ তাআলা ফরমান أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ এরা শয়তানের দল এবং শয়তানের দল ক্ষতিগ্রস্ত।

যে জিনিসের সম্পর্ক আল্লাহ্‌র দলের সাথে হয়ে যায়, সেটা সম্মানিত ও বরকতময় হয়ে যায়। যেমন আবে জমজম, খাকে শিফা এবং আওলীয়া কিরামের আস্তানা সমূহ। যে জিনিসের সম্পর্ক শয়তানী দলের সাথে হয়ে যায়, সেটা অমঙ্গল হয়ে যায়। যেমন গংগার পানি, কউমে ছমুদের কূপের পানি ইত্যাদি। এ রকম নফ্‌সে আম্মারা শয়তানী দলের এবং দিল ও রূহ আল্লাহ্‌র দলের। আয়াতের ইঙ্গিত এ দিকেই করা হয়েছে যে, মুমিন ব্যক্তির জন্য সেই খাবার হারাম, যেটা গায়রুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দুশমন নফ্‌সে আম্মারার জন্য হয়ে থাকে। মুমিন বান্দা আল্লাহ্‌র জন্যই পানাহার করে এবং তাঁরই জন্য জীবিত থাকে ও মারা যায়। কুরআন করীম ইরশাদ ফরমান–

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

বলুন, আমার নামায, আমার ইবাদত, আমার জীবন–মরণ, জগত সমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই উদ্দেশ্যে।

কাহিনীঃ একবার বায়েজীদ বুস্তামীয় নফ্‌স ঠাণ্ডা পানি চেয়ে ছিল। তাই তিনি তিন বছর পানি পান করেননি। তিনি বলতেন, হে নফ্‌স, আল্লাহ্‌র জন্য পান করবো, তোমার জন্য পান করবো না। যখন বান্দার এ অবস্থা হয়ে যায় যে গায়রুল্লাহ অর্থাৎ নফ্‌স ও দুনিয়ার জন্য কিছু করে না বরং যা কিছু করে, আল্লাহর জন্যই করে, তখন এর ফলশ্রুতিতে ওনার অবস্থা এ রকম হয়ে যায়, ইনি যা চায়, আল্লাহ্ তা করে দেন। ইনি দীনের পিছনে দৌড়ায় এবং দুনিয়া ওনার পিছনে দৌড়ায়। ডঃ ইকবাল তাঁর নিম্নের শেরে এ কথাই ফুটিয়ে তুলেছেনঃ

خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے
خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے

অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জগতে নিজেকে এতটুকু উন্নত করুন যেন আল্লাহ্ স্বয়ং বান্দার কাছে জিজ্ঞাসা করে কিসে তুমি সন্তুষ্ট। কিন্তু এ মর্যাদা ইশ্‌কে মুস্তাফা ছাড়া অর্জিত হয়না।

ذرّۂ عشق نبی از حق طلب ÷ سوز صدیق وعلی از حق طلب

অর্থাৎ হে রসুল প্রেমিক! নবী প্রেমের এক বিন্দু হলেও আল্লাহ্‌র কাছে কামনা কর, হযরত ছিদ্দিক ও আলী রাদি আল্লাহ্ আনহুমা) এর প্রেমের জ্বালা আল্লাহ্‌র কাছে চেয়ে নাও।

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ (তবে যে অনন্যোপায়, কিন্তু স্বাদের লালসাকারী এবং সীমা লংঘনকারী নয়, ওর বেলায় কোন গুনাহ্ নেই। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু) এ বাক্যাংশে এটাই বলা উদ্দেশ্য যে উপরোক্ত জিনিসসমূহ সর্বাবস্থায় হারাম কিন্তু এমন এক সময় আসে তখন পবিত্র শরীয়ত স্বীয় এ কানুন বান্দার জন্য শিথিল করে। সেই সময়টা হচ্ছে অনন্যোপায় অর্থাৎ জীবন হুমকীর সম্মুখীন হওয়া। অনন্যোপায়ের দু'রকম অবস্থা রয়েছে–এক, ক্ষুধা তৃষ্ণার আধিক্য এবং খানা পানি মওজুদ না থাকা। এমতাবস্থায় জীবন যদি হুমকীর সম্মুখীন হয় এবং মৃত্যুর আশংকা জোরদার হয়, তখন মৃত শুকূর, নাপাক পানি ইত্যাদি দ্বারা প্রাণ বাঁচাতে পারে। এ গুলো গ্রহণ না করে যদি মারা যায়, তাহলে গুনাহগার হবে।

দুই, কঠিন রোগের সময় বিজ্ঞ ডাক্তার 'যিনি মুমিন ও পরহিজগারও বটে, যদি বলে যে এ রোগের চিকিৎসা এ হারাম বস্তু ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা হবেনা, তখন এ অবস্থায় প্রয়োজনীয় পরিমাণ হারাম গ্রহণ করা জায়েয, তবে ওয়াজিব নয়। অর্থাৎ গ্রহণ করলে গুনাহগার হবে না আর যদি গ্রহণ না করে প্রাণ দিয়ে দেয়, তখনও গুণাহগার হবেনা। কেননা খাদ্য দ্বারা প্রাণ রক্ষার ধারণাটা নিশ্চিত কিন্তু ওষুধ দ্বারা প্রাণ রক্ষার ধারণাটা নিশ্চিত নয়।

কাহিনীঃ একবার কবীলায়ে আরিনার কিছু লোক হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর খেদমতে মদীনা শরীফে উপস্থিত হন এবং ঈমান আনয়ন করে ওখানে থাকতে লাগলেন। মদীনা শরীফের আবহাওয়া ওদের অনুকূল হলো না। সবাই অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং সবার পেট ফেঁফে গেল। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওদেরকে মদীনা শরীফের বাইরে, যেখানে ছদকার উঠ রাখা হতো, ওখানে পাঠিয়ে দিলেন এবং ফরমালেন, তোমরা ওখানে গিয়ে উটের দুধও পান কর এবং প্রশ্রাবও। সে মতে ওনারা সেটার উপর আমল করলেন এবং সুস্থ হয়ে

গেলেন। এ হাদীছ اِضْطِرَارْ (অনন্যোপায়) এর তাফসীর। প্রশ্রাব নাপাকও এবং হারামও। কিন্তু ওনাদের শিফা সেটাতে ছিল। তাই ওনাদের জন্য সেটার ব্যবহার জায়েয হয়ে গেল।

তবে অপারগ অবস্থায় হারাম হালাল হয়ে যাবার দু'টি শর্ত রয়েছে–এক প্রয়োজনের অতিরিক্ত কক্ষনো খাবে না। যদি তিন গ্রাস দ্বারা প্রাণ রক্ষা হয়, তাহলে তিন গ্রাসের অতিরিক্ত খাবে না। একে غَيْرَ عَادٍ (সীমালংঘনকারী নয়) দ্বারা বর্ণনা করেছেন অর্থাৎ প্রয়োজনের সীমা অতিক্রম না করা। দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে স্বাদের জন্যও না খাওয়া। তিক্ত ঔষুধের মত পেটে কিছু ফেলে যেন প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করে। একে غَيْرَ بَاغٍ (স্বাদের লালসার নয়) দ্বারা বর্ণনা করেছেন। যদি প্রয়োজনের পরিমাণ থেকে সামান্যও কম হয়, তাহলে ভক্ষণকারী গুনাহগার হবে। অবশ্য অনুমানের ক্ষেত্রে ভুল হতে পারে। আবার কোন সময় অনিচ্ছাকৃতভাবে স্বাদ অনুভব হয়ে যায়, এ জন্য বলা হয়েছে– اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ অর্থাৎ এ রকম অসতর্ক ভুলত্রুটি মাফ করে দেয়া হবে। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা ক্ষমা প্রদানকারী মেহেরবান।

ছুফিয়ানে কিরাম বলেন যে, এ আয়াত থেকে ইঙ্গিতে এটা বুঝা গেল যে প্রাণ রক্ষা করা খুবই প্রয়োজন। কেননা সমস্ত আহকাম ও আমলসমূহ প্রাণের সাথে সম্পৃক্ত। যখন কোন আহকামের সাথে প্রাণের মুকাবিলা হয়, তখন শরীয়ত আহকামকে শিথিল করে দেয়। পানি শরীরের জন্য ক্ষতিকর হলে তায়াম্মুম করে নিন। দাঁড়িয়ে নামায পড়তে না পারলে, বসে পড়ুন। ক্ষিধার তাড়নায় প্রাণ যাবার উপক্রম হলে, মৃত প্রাণী খেয়ে প্রাণ বাঁচাও–এ সব শিথিলতা একমাত্র প্রাণ রক্ষার জন্য। কিন্তু যদি প্রাণের মুকাবিলা ঈমানের সাথে হয়, তখন শত শত প্রাণ সেটার জন্য কুরবান করে দাও। এক হিন্দি কবি সুন্দর বলেছেন।

دھن دے تن کورا کھئے اورتن دے رکھئے لاج

تن من دھن سب راکھئے ایک دھرم کے کاج

অর্থাৎ ধন দিয়ে প্রাণ রক্ষা কর, প্রাণ দিয়ে সম্মান রক্ষা কর এবং ধন, প্রান, মন সব দিয়ে ধর্ম রক্ষা কর।

এর কারণ সুস্পষ্ট। নিকৃষ্ট উৎকৃষ্টের জন্য কুরবান হয়। প্রাণ থেকে ঈমান উৎকৃষ্ট। কেননা প্রাণ একদিন না হয় একদিন যাবেই কিন্তু ঈমান অমর। যেমন আগাছা ক্ষেত খামারের জন্য উৎসর্গিত হয়, বীজের জন্য মাটিকে উলট পালট করা হয়, পশু সমূহ মানুষের জন্য উৎসর্গিত হয়। গরু, মহিষ ইত্যাদি আজীবন

মানুষের খেদমত করে এবং দুনিয়া থেকে বিদায় হবার সময় স্বীয় মাংসও মানুষের জন্য দিয়ে যায়।

হে মানব জাতি! একটু চিন্তা করে দেখুন, আপনিও কি কারো জন্য উৎসর্গিত হওয়ার মত নয়? এর জবাব ছুর গুহায় ছিদ্দিকে আকবরের আচরণে পাওয়া যাবে। তিনি হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ঘুমের জন্য স্বীয় প্রাণকে উৎসর্গ করে দিলেন এবং তাঁর ইঙ্গিতে সবকিছু কুরবানী করে দিলেন। আল্লাহ্ তাআলা যেন আমাদেরকে এ রকম জিন্দেগী নসীব করেন।

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ وَنُوْرِ عَرْشِهٖ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ –

বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রাহীম

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ –

তরজুমাঃ বলে দিন, হে মাহবুব! যদি তোমরা আল্লাহকে মহব্বত কর, তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদেরকে মহব্বত করবেন এবং তোমাদের সমস্ত গুণাহ ক্ষমা করে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল মেহেরবান।

শানে নাযুলঃ আরবের আহলে-কিতাবগণ প্রথমেতো হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নাবুয়াতকেই অস্বীকার করতো কিন্তু যখন মজবুত দলীলসমূহ ও অগণিত মুজেযাসমূহ হুযূরের নাবুয়াতকে প্রমাণ করে দিল এবং ওদের অস্বীকার করার কোন অবকাশ রইলো না, তখন শেষ পর্যন্ত বলতে লাগলো আপনি নবী বটে, তবে আপনার নাবুয়াতের আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। কেননা, نَحْنُ اَبْنَاءُ اللّٰهِ وَاَحِبَّاؤُهٗ আমরা আল্লাহর সন্তান এবং তাঁর প্রিয় পাত্র। বনী ইসমাইল এ দু'বৈশিষ্ট্য থেকে বঞ্চিত। ওদেরই প্রয়োজন আপনার নাবুয়াতের। ওদের এ বক্তব্যের খণ্ডনে এ পবিত্র আয়াত নাযিল হয়।

তাফসীরঃ মূলতঃ সম্পূর্ণ কুরআন শরীফই তবলীগের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। এর প্রতিটি আয়াত লোকদের কাছে পৌঁছানো এবং এর সমস্ত আহকাম বান্দাদেরকে শুনানো হুযূরের উপর ফরয ছিল। আল্লাহ্ তাআলা ফরমান-

يٰۤاَيُّهَا النَّبِىُّ بَلِّغْ مَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ

(হে নবী! পৌঁছায়ে দাও যা নাযিল করা হয়েছে তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে) কিন্তু অনেক আয়াত قُلْ (বলে দিন) দ্বারা শুরু করা হয়। আলোচ্য আয়াতটা ও অনুরূপ। এ قُلْ বলার মধ্যে অনেক সার্বিক ও বিশেষ হেকমত রয়েছে। সার্বিক হেকমতের মধ্যে একটি হচ্ছে, যা মাওলানা হাসন রেযা সাহেব বেরলভী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) তাঁর নিম্নের শেরে বর্ণনা করেছেনঃ

قل کهه کے اپنی بات بهی منه سے ترے سنی

اتنی هے گفتگو تیری الله کو پسند !!

অর্থাৎ হে হাবীবে খোদা! আপনার কথাবার্তা আল্লাহ্‌র কাছে এত প্রিয় যে قُلْ (বলে দিন) বলে স্বীয় কথাও আপনার পবিত্র মুখ দিয়ে শুনতে চান। (তুলনা নয় কেবল বুঝার জন্য) যেমন, মা-বাপ আপন ছোট শিশুদের মুখ থেকে শিখানো

বুলি শুনতে চায়, ওদের অস্পষ্ট কথা, ওদের মুখ থেকে উচ্চারিত শব্দসমূহ শুনতে খুবই ভাল লাগে। আল্লাহ্ তাআলা নিজেই বলতে পারেন কিন্তু আপন হাবীব দ্বারা বলায়ে শুনেন। কেননা মাহবুবের মুখ এবং ওনার মুখ দিয়ে উচ্চারিত শব্দসমূহ আল্লাহর কাছে খুবই প্রিয়। দেখুন, এক জায়গায় ইরশাদ ফরমান قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ (বলুন, আল্লাহ্ এক) সমস্ত নবী, ওলী ও মুমিনগণ বলেছেন আল্লাহ্ এক। আপনি নিজের মুখে বলুন এবং আমি শুনি আল্লাহ্ এক। قُلْ (বলুন) বলে এটা বুঝাতে চেয়েছেন যে, এ কথা বলার অধিকার একমাত্র আপনারই। এ কথা বলার জন্য আপনার মুখ মুবারককে মনোনিত করা হয়েছে। অন্য কারো মুখে এটা শোভা পাবে না। যেমন- قُلْ اِنَّمَاۤ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ (হে মাহবুব বলে দিন, আমি তোমাদের মত মানুষ) নবীগণ বিনীতভাবে নিজেদেরকে জালিম ও গুমরাহও বলেছেন। কিন্তু অন্যরা এ শব্দ ওনাদের শানে ব্যবহার করতে পারে না। তাই এ قُلْ (বলুন) শব্দ কোন জায়গায় অন্যদেরকে বাঁধা দেয়ার জন্য ব্যবহৃত হয় এবং কোন জায়গায় অন্যদের দ্বারা বলানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ হে প্রিয় হাবীব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ কথাটি আপনিই বলুন। আপনি বলার দ্বারা যেন অন্যান্য সকলে বলে। যেমন- قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ (বলে দিন, আল্লাহ্ এক) অর্থাৎ প্রথমে আপনি বলুন যে আল্লাহ্ এক। অতঃপর আপনার বলার দ্বারা যেন সবাই বলে যে আল্লাহ্ এক। তখনই ওসব লোক মুমিন হবে।

مانا هے فرمایا تیرا   سیکها هے سِکهلا یا تیرا

سمجها هے سمجهایا تیرا   هے عرش برین پایه تیرا

تم سیّد الکونین هو   تم والئے حرمین هو

تم مومنو کے چین هو   تم قُرّة العینین هو

অর্থাৎ হে মাহবুব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনার বলার দ্বারা মান্য করেছি। আপনি যা শিখায়েছেন, তা শিখেছি, যা বুঝায়েছেন তা বুঝেছি। আরশের উপরই আপনার পদার্পন। আপনি হচ্ছেন উভয় জাহানের সরদার এবং হেরমাইন শরীফাইনের ধারক। আপনি হচ্ছেন মুমিনদের শান্তনা এবং চোখের মনি। কোন সময় قُلْ (বলুন) বলার অভিপ্রায় এটা হয়ে থাকে যে, হে প্রিয়! বাণী আমার, মুখ আপনার-এ দু'এর সংমিশ্রণে এতে তাছীর সৃষ্টি হবে অর্থাৎ গোলা-বারুদ আল্লাহ্‌র এবং রাইফেল আপনার মুখ মুবারক। যেমন قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ

(বলুন, আমি উষার শ্রষ্টার আশ্রয় কামনা করি) অর্থাৎ হে মাহবুব, যাদু অপসারিত করার জন্য স্বীয় মূখে এ দুআ পাঠ করুন এবং আপনার অনুমতিতে অন্যারা কোন সময় পাঠ করলে এ তাছীর নিশ্চিত।

কাহিনীঃ হযরত খাজা ফরিদ উদ্দীন গন্‌জ শকর (রহমতুল্লাহে তাআলা আলাইহি) এর কাছে এক ফকীর কিছু চাইলেন। তিনি একটি মুরগীর ডিমের উপর উচ্চস্বরে সূরা ইখলাস পড়ে ফুঁক দিলেন। এতে ডিমটা স্বর্ণের হয়ে গেল। সেটা তিনি সেই ফকীরকে দিয়ে দিলেন। ফকীর খুশী হয়ে স্বীয় ঘরে গিয়ে স্ত্রীকে বললো, আমাকে তো শেখ সাহেব সম্পদশালী করে দিলেন, অনেক স্বর্ণ দান করলেন এবং স্বর্ণ তৈরী করার ফর্মুলাটাও শুনায়ে দিলেন। বাস্তব অবিজ্ঞতার জন্য সে একটি ডিম নিল এবং একশ বার সূরা ইখলাস পড়ে ফুক দিল, কিছু হলো না। অতঃপর পুরা কুরআন শরীফ পড়ে ফুঁক দিল কিন্তু ডিম ডিমই রয়ে গেল। স্বর্ণ তো দূরের কথা, পিতলও হলোনা। শেখ সাহেবের দরবারে হাজির হয়ে আরয করলো, হুযুর, আপনি যা পড়ে ছিলেন, আমি এর থেকে আরও অধিক পড়ে ফুঁক দিলাম। কিন্তু আমার ফুঁকে কিছুই হলো না। শেখ ফরিদউদ্দীন (রহমতুল্লাহে আলাইহি) হেসে বললেন, বাণী আল্লাহ্‌র এবং মূখ ফরিদের হওয়া চায়। মোট কথা;

قُلْ বলার মধ্যে অনেক হেকমত নিহিত রয়েছে।

اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ (যদি তোমরা সত্যিকার আল্লাহকে ভালবাস) আল্লাহ্‌ তাআলা রসূলের অনুসরনের বিষয়কে মহব্বত দ্বারা শুরু করেন অর্থাৎ যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি সত্যকার মহব্বত রাখ, তাহলে আমার অনুসরণ কর। কারো আনুগত্য বা অনুসরণ তিনটি কারণে করা হয়–ভয়, লালসা, এবং মহব্বতের কারণে।

চাকর মুনিবের প্রতিটি কথা মান্য করে, বেতনের লালসায়, প্রজাগণ বাদ্‌শাহের আনুগত্য প্রকাশ করে জেল হাজতের ভয়ে, সৎ পুত্র স্বীয় বৃদ্ধ মা–বাপের আনুগত্য প্রকাশ করে মহব্বতের কারণে, মা–বাপ ছোট শিশুদের জিদ পূর্ণ করে ভয় বা লালসার কারণে নয় বরং পিতৃ মহব্বতের কারণে। এ তিন প্রকারের আনুগত্যের মধ্যে মহব্বতের আনুগত্যটা খুবই শক্তিশালী। ইসলামে এটার কথাই বলেছেন। লালসার আনুগত্য উদ্দেশ্য সাধন হওয়া পর্যন্ত এবং ভয়ের আনুগণ্য ভয় অপসারিত হওয়া পর্যন্ত কিন্তু মহব্বতের আনুগত্য স্থায়ী। লিপ্সা ও ভয়ের আনুগত্য মুনাফিকরাও করতো, ওরা সাহাবীতো দূরের কথা, মুমিনও হতে পারেনি। এ জন্য এ আয়াতে এ রকম বলেনি যে, তোমরা যদি আল্লাহ্‌কে ভয় কর বা আল্লাহ্‌

থেকে কিছু লাভের লিপ্সা কর, তাহলে আমার অনুসরন কর বরং বলেছেন যে যদি আল্লাহ্‌র প্রতি মহব্বত থাকে, তাহলে আমার অনুসরণ কর। মোটকথা, মুমিন হওয়ায় জন্য হুযূরের কোন্‌ ধরনের অনুসরণ করা চায়, এ আয়াতে তা প্রকাশ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, মহব্বত তিন প্রকারের হয়ে থাকে–নফ্‌সানী, যেমন সন্তান–সন্ততির প্রতি মহব্বত, জিসমানী যেমন মা–বাপের প্রতি মহব্বত এবং ঈমানী, যেমন আল্লাহ্‌ ও রসূলের প্রতি মহব্বত। প্রথম দু'প্রকারের মহব্বত মৃত্যুবরণের সাথে সাথে শেষ হয়ে যায় কিন্তু শেষ প্রকারের মহব্বত অনন্তকাল পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। উপরোক্ত আয়াতে ঈমানী মহব্বতকে বুঝানো হয়েছে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি কেবল এ জন্য মহব্বত করে যে, তিনি আমাদের রিজিকদাতা ও পালন কর্তা, সে মুমিন নয়, ওর এ মহব্বত হচ্ছে ইহসানী। এ রকম মহব্বত কাফিরেরা ও করে। আল্লাহ্‌র প্রতি এ জন্যই মহব্বত করা চায় যে তিনি আমাদের হেদায়েতের জন্য নবী প্রেরণ করেছেন, কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, আমাদেরকে দোযখ থেকে রক্ষা পাবার উপায় বলে দিয়েছেন। এটাই ঈমানী মহব্বত এবং এটাই উপরোক্ত আয়াতে বুঝানো হয়েছে।

আয়াতের ভাবার্থ হলো–হে লোকগণ! যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি সেই মহব্বত রাখ, যেটার দ্বারা তোমরা মুমিন হয়ে যাও, তাহলে فَاتَّبِعُوْنِىْ আমার অনুসরণ কর। اِطَاعَتْ(অনুসরণ) ও اِتِّبَاع (আনুগত্য) শব্দদ্বয়ের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। স্বীয় আ'কার আনুগত্যকে اِطَاعَتْ বলা হয়।

এটা আল্লাহ্‌রও হতে পারে, তাঁর রসূলেরও হতে পারে, বাদ্‌শাহ, ওস্তাদ, পীর ও মা–বাপেরও হতে পারে। এ জন্য কুরআন করীমে তিন ধরনের اِطَاعَتْ (আনুগত্য) এর কথা উল্লেখিত হয়েছে। যেমন اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র হুকুম মান্য কর এবং রসুলের এবং নিজেদের মধ্যে যারা শাসক, তাদের হুকুম মান্য কর। কিন্তু অনুসরণ একমাত্র হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হতে পারে। খোদা, বাদ্‌শাহ, ওস্তাদ, পীর, মা–বাপের অনুসরণ হতে পারেনা। এ জন্য এ আয়াতে فَاتَّبِعُوْنِىْ (আমার অনুসরণ কর) বলা হয়েছে। আল্লাহ্‌ তাআলা নিজের কথা উল্লেখ করেননি এবং অন্য কারো কথাও। উল্লেখ্য যে, অনুসরণ বলতে নিজেকে অন্যের উপর সোপর্দ করে দেয়া বুঝায়। অর্থাৎ পিছনে গমণকারীদের কাজ হচ্ছে পথ প্রদর্শকের পদাঙ্ক অনুসরণ করা এবং পথ প্রদর্শকের কাজ হচ্ছে অনুসারীদেরকে

তাঁর অনুগামী করা। রাস্তার কাঁটাকুটা ও অন্যান্য সমস্ত অবস্থাদি জানার দায়িত্ব পথ–প্রদর্শকের। রেলের বগি ইঞ্জিনের পিছনে পিছনে চলে। লাইনের ভালমন্দ, সিগনেল ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রাখা ইঞ্জিন চালকের দায়িত্ব। এ একটি শব্দের মধ্যে আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় হাবীবের কী অপূর্ব শান বর্ণনা করলেন যে, হে দুনিয়াবাসীগণ! তোমাদের কাজ রাস্তা যাচাই করা নয়, তোমাদের কাজ হচ্ছে তাঁর পিছনে চলে আসা। যদি তোমরা তোমাদের জ্ঞান বুদ্ধির উপর নির্ভর কর, তাহলে তোমরা হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুসারী হলেনা।

দ্বিতীয়তঃ এ আয়াতে এটাও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তোমরা যত উচ্চস্তরে পৌঁছে যাওনা কেন বা আরেফে কামেলও যদি হয়ে যাও, ভাই হয়ে ওনার বরাবর হয়ো না বা বাপ হয়ে ওনার অগ্রগামী হয়ো না। বরং গোলাম হয়ে সদা ওনার পিছনে থাকুন। বগি সেকেণ্ড ক্লাসের হোক বা ফাষ্ট ক্লাসের, ইঞ্জিনের পিছনেই থাকবে, অন্যথায় গন্তব্য স্থানে পৌঁছতে পারবে না।

তৃতীয়তঃ এটা বলা হয়েছে যে কোন পীর–দরবেশ, গাউছ–কুতুব, বাদশাহ অন্যদের দ্বারা স্বীয় অনুসরণ করাতে পারেনা, কেননা ওনাদের সমস্ত আমল রহমাণী নয়, কতেক নফ্সানীও আছে, যে গুলোর অনুসরণ করা যেতে পারে না। কিন্তু আমাদের প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সমস্ত কাজ রহমানী। ওখান পর্যন্ত নফ্স ও শয়তান পৌঁছতে পারেনা। তিনি বলতে পারেন যে চোখ বন্ধ করে আমার পিছনে চলে এসো।

কাহিনীঃ আমীরুল মুমেনীন হযরত ওমর (রাদি আল্লাহু আনহু) খেলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে ভাষণ দিয়েছিলেন, হে জনগণ! আমি তোমাদের আমীর মনোনিত হলাম। প্রতিটি বৈধ নির্দেশের বেলায় তোমাদের উপর আমার অনুসরণ আবশ্যক। কিন্তু আমার মধ্যে যদি কোন ভুলভ্রান্তি দেখ, তাহলে সে ব্যাপারে আমাকে অবহিত করে সংশোধন করে দিও। এ ঘোষণার প্রেক্ষিতে হযরত সলমান ফার্সী (রাদি আল্লাহ আনহু) একবার এক সমাবেশে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আমীরুল মুমেনীন, এবার গণীমতের কাপড় দ্বারা কোন গাজীর পূর্ণ কোর্তা হয়নি। আপনি এ কাপড়ের পূর্ণ কোর্তা কিভাবে তৈরী করলেন? তিনি বললেন, এর উত্তর আমার ছেলে আবদুল্লাহর কাছে জিজ্ঞাসা করুন। সে মতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বললেন, আমি আমার অংশটা আমার আব্বাজানকে দিয়ে দিয়েছি। দু'জনের অংশ দ্বারা এ কোর্তা তৈরী করা হয়েছে। যখন হযরত ওমরের মত ব্যক্তিত্ব স্বীয় অনুসরণের নির্দেশ দিতে পারেন না, সে ক্ষেত্রে অন্যদের কথা কি আর বলা যায়।

অবশ্য নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ওসমস্ত বিশেষ কাজ যেমন যাকাত ওয়াজিব না হওয়া, একসঙ্গে নয়জন স্ত্রী বিবাহ বন্ধনে রাখা, উটের উপর আরোহন করে তওয়াফ করা, মিম্বরে দাঁড়িয়ে নামায পড়া ইত্যাদির ব্যাপারে অনসরণ করা যাবে না। কেননা, এ গুলো অনুসরণ উপযোগী কাজ নয়।

يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ (আল্লাহ্ তোমাদেরকে স্বীয় মাহবুব করে নিবেন) আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে এটা অপূর্ব চিত্তাকর্ষক ও মনমুগ্ধকর ওয়াদা। শর্তের বেলায় বলা হয়েছিল اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ (যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস) তখন বান্দা ছিল কর্তা, আল্লাহ্ ছিল কর্ম আর এখানে আল্লাহ্ হচ্ছে কর্তা এবং বান্দা হচ্ছে কর্ম। অর্থাৎ তোমাদের দাবী হচ্ছে, আমরা আল্লাহ্কে কামনাকারী এবং আল্লাহ্ আমাদের মাহবুব কিন্তু যদি তোমরা হুযূর আকরম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সত্যকার অনুসারী হয়ে যাও, তাহলে ঘটনা এর উল্টো হয়ে যাবে যে আল্লাহ্ তাআলা তখন তোমাদের কামনাকারী হবেন ও তোমরা তাঁর মাহবুব। এ বাক্য দ্বারা মুসলমানদের দু'টি বড় উপকার সাধিত হলো।

একেতঃ যখন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুসারী হুযূরের গোলাম আল্লাহর মাহবুব হয়ে যায়, তাহলে বলুন যে স্বয়ং নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ্র কী রকম মাহবুব হবেন। এ আয়াতে ঘোষণা করছে যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ্র মাহবুবে আকবর। যে তাঁর অনুসায়ী হবে, আল্লাহ্ তারই হয়ে যাবে।

ان کے درکا جو ہوا خلق خدا اس کی ہوئی

ان کے درسے جو پھرا - اللہ بھی اُس سے پھر گیا

অর্থাৎ যিনি তাঁর অনুসারী হলেন, আল্লাহ্র সমস্ত মখলুক ওনার অনুসারী হলো। যে তাঁর দরজা থেকে ফিরে গেল, আল্লাহ্ও ওর থেকে ফিরে গেলেন।

কাহিনীঃ একবার আমি এক জায়গায় তকরীর করতে গিয়েছিলাম। আমার আগে এক স্কুলের হেড মাষ্টার সাহেব তকরীর করছিলেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এটার উপরই জোর দিলেন যে মুসলমানগণ যেন কুরআন শরীফের তরজুমা শিখেন। যার তরজুমা জানা নেই, ওর নামায শুদ্ধ নয়। কেননা, নামায এক প্রকারের দরখাস্ত। যদি দরখাস্তকারীর এটা জানা না যাকে যে, দরখাস্তে কি লিখা আছে, তাহলে দরখাস্ত করে কি লাভ। সুতরাং সেই মুসলমানই যেন নামায পড়ে, যার কুরআন শরীফের তরজুমা জানা থাকে। অবশিষ্ট লোকেরা

হয়তো তরজুমা শিখবে অথবা নামায ত্যাগ করবে। ওনার পর আমার তকরীর ছিল।

আমি আরয করলাম, তরজুমা জানার এ শর্ত দ্বারা সাধারণ মুসলমান বেনামাযী হয়ে যাবে। সকল মুসলমান তরজুমা শিখতে পারেনা। শতকরা দশজন হয়তো কষ্ট করে শিখতে পারে। তাও অনেক চেষ্টার পর। আপনার এ শর্ত দ্বারা শতকরা নব্বই জনকে বেনামাযী করে ফেলবেন। তরজুমা জানাটা নামাযের জন্য শর্তও নয় এবং রোকনও নয়। যদি নামায কেবল একটি দরখাস্তের নামই হয়, তাহলে আমরা নিজ নিজ ভাষায় নামায পড়ে নিতে পারি। কেননা আল্লাহ্ তাআলা তো সকল ভাষা বুঝেন। যে ভাষায় আমরা আবেদন নিবেদন করি না কেন, তিনি বুঝবেন। বন্ধুগণ, নামায কেবল দরখাস্ত নয় বরং এটা তার মাহবুব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুকরণ। নামাযের মধ্যে তিনি যে রকম অঙ্গভঙ্গী করেছেন এবং যে ভাষা তিনি ব্যবহার করেছেন, তোমরাও অনুরূপ কর। তরজুমা বুঝ বা না বুঝ সে মূলের উসীলায় তোমরাও ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। দেখুন, ময়না ও বুলবুল আমাদের কাছে এ জন্যই প্রিয় যে ওরা আমাদের বুলি বলতে পারে যদিওবা কিছু বুঝে না। অনুরূপ তোমরাও জনাব মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বুলি বল, আল্লাহ্‌র প্রিয় পাত্র হয়ে যাবে।

দ্বিতীয়তঃ হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সত্যকার অনুসারী উম্মত ইন্‌শাআল্লাহ্ দুনিয়াতে কোন সময় নাজেহাল হবেনা এবং কারো পরাভূত হয়ে থাকবে না। কেননা ওরা আল্লাহ্‌র প্রিয় পাত্র। কেউ স্বীয় মাহবুবদেরকে নাজেহাল করে না। আল্লাহ্ তাআলা ফরমান–

وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

(এবং তোমরা বিজয়ী, যদি তোমরা মুমিন হও)

محال است چوں دوست دارد ترا کہ در دست دشمن گذارد ترا

অর্থাৎ যে আপনার মাহবুব হয়েছে, ওর উপর কোন দুশমনের হাত পড়া অসম্ভব।

وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (এবং আল্লাহ্ তোমাদের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন এবং আল্লাহ্ ক্ষমাকারী মেহেরবান) এটা আল্লাহ্ তাআলার দ্বিতীয় ওয়াদা, যেটা প্রথম ওয়াদার সাথে সংযুক্ত। অর্থাৎ যদি তোমরা আমার মাহবুবের সত্যকার অনুসারী হয়ে যাও, তাহলে তোমাদের সমস্ত গুনাহ

ক্ষমা করে দিব। এ সময় তোমাদের জন্য আমার ক্ষমাকারী শান প্রকাশ পাবে। তোমাদের গুণাহসমূহ থেকে আমার ক্ষমা প্রদান অনেক বেশি।

گنہ رضاکا حساب کیا جو اگر چہ لاکھوں سے ہیں سواء
مگر اے عفو تیرے عفو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے

অর্থাৎ হে খোদা, আমাদের গুনাহ যত হোক না কেন এর একটা হিসেব আছে কিন্তু হে ক্ষমাশীল দয়াবান আল্লাহ্, আপনার ক্ষমার কোন হিসেব নেই।

আল্লাহ্ তাআলা আমরা সবাইকে তাঁর প্রিয় হাবীব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সত্যকার অনুসায়ী হওয়ার তওফিক দান করুক। এতেই দ্বীন দুনিয়া উভয় জাহানোর কল্যান নিহিত রয়েছে। আজ মুসলমানগণ উন্নতির জন্য চারিদিকে ধর্ণা দিচ্ছে। কিন্তু এ দিকে মনোনিবেশ করছে না, যেটার মধ্যে উন্নতির মূল উৎস লুকায়িত আছে। ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے

ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں

অর্থাৎ আমাদের মধ্যে যাঁরা তাঁর গোলাম ছিলেন, তাঁরা সৃষ্টি জগতের পুরাধা ছিলেন। ওনার থেকে ফিরে যারা যে দিকে গেছে, অকৃতকার্য হয়েছে।

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ وَنُوْرِ عَرْشِهٖ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ–

বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রাহিম

وَاِذَا سَئَالَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ ط اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ وَالْيُؤْمِنُوْا بِىْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ -

তরজুমাঃ হে মাহবুব! যখন আপনার কাছে আমার প্রিয় বান্দাগণ আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তখন বলে দিন যে, আমি নিকটেই আছি। যখনই আমাকে আহবান করে, আমি আহবানকারীদের আহবানের জবাব দিয়ে থাকি। ওদেরও উচিৎ যে আমার কথা শুনা এবং আমার উপর ঈমান আনা, যেন হিদায়েত প্রাপ্ত হয়।

শানে নযুলঃ এ পবিত্র আয়াতের শানে নযুল সম্পর্কে অনেক রকমের রেওয়ায়েত আছে। যার মধ্যে একটি হচ্ছে, কয়েক জন সাহাবা খোদা প্রেমে অস্থির হয়ে বারগাহে রেসালতে আরয করলেন, আমাদের রব কোথায়? উনি কি রকম আহবান এবং কোন্ ধরনের ফরিয়াদ শুনেন; নিম্নস্বরের, নাকি উচ্চ স্বরের। তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়।

তাফসীরঃ وَاِذَا سَئَالَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ (যখন আপনার কাছে আমার বান্দাগণ আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে) যদিওবা এ আয়াতটির নাযিল বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে হয়েছে, কিন্তু এর ইবারত সার্বজনীন অর্থাৎ যখন যে কোন সময় যে কোন যুগে যে কোন জায়গায় মুসলমান আপনার কাছে আমার পাত্তা জিজ্ঞাসা করে। سَئَالَكَ শব্দটি سَوَال থেকে গঠন করা হয়েছে, যার অর্থ প্রার্থনা করা। যেমন আল্লাহ্ তাআলা ফরমান اَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ (প্রার্থনাকারীকে ভর্ৎসনা করিওনা) এবং জিজ্ঞাসা করা। যেমন আল্লাহ্ তাআলা ফরমান يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ (লোকেরা আপনার কাছে হায়েজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে)। এ আয়াতে উভয় অর্থ হতে পারে। অর্থাৎ যখন আমার বান্দা আপনার কাছে আমার জাত ও সিপাত ইত্যাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে বা যখন আপনার থেকে আমার পাত্তা তালাশ করে। এ একটি শব্দ দ্বারা বুঝা গেল যে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ তাআলার ঠিকানা এবং ঠিকানা অবহিতকারী।

অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলার প্রতিটি সৃষ্টির মূলে রয়েছে মুহাম্মদ এবং তওহীদের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে মুহাম্মদ।

দেখুন, সাহাবায়ে কিরাম আল্লাহ্‌র ঠিকানা জিজ্ঞাসা করতে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে গেলেন এবং হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও এটা বলেননি যে আমি কি জানি, তোমরা যেখানে আছ আমিও সেখানে আছি বরং তিনি মওলার সঠিক ঠিকানা বলে দিলেন। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তো সমগ্র অদৃশ্য জগতের ঠিকানা অবহিতকারী। যেমন এক মহিলার ছেলে মারা গিয়েছিল। নবীজীর দরবারে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, হে রসূলল্লাহ্, আমার ছেলে কোথায় আছে? যদি জান্নাতে থাকে, তাহলেতো ভাল আর যদি দোযখে থাকে, তাহলে আমি খুবই কান্নাকাটি করবো। এর উত্তরে হুযূর এটা বলেননি, জান্নাত দোযখের খবর আমি কি জানি। আমিতো মদীনায় অবস্থান করছি, সেই আবাস তো এখান থেকে কোটি কোটি মাইল দূরে এবং এটাও বলেননি যে ঠিক আছে, জিব্রাইলের কাছে জিজ্ঞাসা করে বলবো। বরং সাথে সাথে বললেন, জান্নাত আটটি, যার মধ্যে সবচে' শানদার হচ্ছে ফেরদৌস। তোমার ছেলে ফেরদৌসে আছে। আর এক মহিলার ছেলে শহীদ হয়ে গিয়েছিল। সে হুযূরের সমীপে জিজ্ঞাসা করলো, আল্লাহ তাআলা আমার ছেলের সাথে কি আচরণ করলেন। তিনি এর জবাবে এটা বলেননি যে, তোমার ছেলে অন্য জগতে। আমি এখান থেকে ওর অবস্থা কি করে জানতে পারি বরং সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন যে আল্লাহ তাআলা সব সময় পর্দার অন্তরাল থেকে কথা বলেন কিন্তু তোমার ছেলের সাথে পর্দাহীনভাবে কথা বলেছেন এবং তাকে বলেছেন, আমার থেকে কিছু চাও। তোমার ছেলে আরয করলো, আপনার দেয়ার দ্বারা আমি সব কিছু পেয়েছি। শুধু পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে যাবার একটি আরজু করছি যেন আপনার নামে পুনরায় মস্তক বিচ্ছিন্ন করতে পারি।

মুতা যুদ্ধে হযরত জাফর শহীদ হয়েছিলেন। মদীনা মনোয়ারায় অবস্থানরত অবস্থায় হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওনার শাহাদতের খবর দিয়ে দিলেন এবং ফরমালেন আল্লাহ্ তাআলা হযরত জাফরকে দু'টি ডানা দান করেছেন, যার দ্বারা সে জান্নাতে উড়তেছে এবং এদিক সেদিক ঘুরাফেরা করতেছে। সে দিন থেকে ওনার লকব হযরত জাফর তৈয়ার (উড্ডয়নকারী) হলো। এ সব ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উভয় জগত হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দৃষ্টির আওতাধীন। عَنِّىْ এ শব্দটিটি বহু রকম অর্থবোধক হতে পারে। তবে এ আয়াতে এর দ্বারা নিকট ও দূর হওয়া বুঝানো

আয়াত দ্বারা তা–ই বুঝা যায়। অর্থাৎ হে মাহবুব যখন লোকেরা আমার সম্পর্কে আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করে যে, আমি ওদের থেকে দূরে, নাকি কাছে।

فَاِنِّیْ قَرِیْبٌ ওলামায়ে কিরাম বলেন এখানে قُلْ শব্দ লুপ্ত আছে। অর্থাৎ ওদেরকে বলে দিন, আমি তোমাদের নিকটে আছি। কিন্তু ছুফিয়ানে কিরামের মতে قُلْ শব্দ উহ্য মানার প্রয়োজন নেই। ওনাদের মতে আয়াতের অর্থ হচ্ছে যে, যদি আমার বান্দা আপনার কাছে আসে এবং আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে এবং আমাকে আপনার মাধ্যমে তালাশ করে, তাহলে আমি ওদের কাছেই আছি আর যদি আপনার থেকে দূরে থাকে, তাহলে আমাকে মসজিদ সমূহে তালাশ করুক বা কাবা শরীফে তালাশ করুক আমি ওদের থেকে দূরে থাকি।

عِبَادِیْ (আমার ইবাদতকারী) বলে ওই দিকে ইশারা করা হয়েছে অর্থাৎ আমার প্রত্যেক রকমের ইবাদতকারী এবং প্রত্যেক প্রকারের নেক বান্দা আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করে আমার ঠিকানা অবহিত হতে পারে। হবেইনা বা কেন। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হচ্ছেন আল্লাহ্‌র দরজা। মালিকের সংগে মিলতে হলে সেই দরজা দিয়েই যেতে হয়। ছাদ বা দেয়াল যদিওরা মালিকের, কিন্তু সেটা মালিকের সাথে সাক্ষাতের জায়গা নয়।

بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر

جو وہاں سے ہو یہیں آکے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں

অর্থাৎ খোদার কসম, আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাতের এটা ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। ওখানে যেতে হলে এখান দিয়ে যেতে হবে। এখানে না আসলে ওখানে যেতে পারবেনা।

قَرِیْبٌ শব্দটি قُرْبٌ থেকে গঠন করা হয়েছে, যার অর্থ কাছে, দূরের বিপরীত। 'কাছে' কয়েক প্রকারের হতে পারে। যথা স্থানগত যেমন বলা হয় যে, ফেনী চট্টগ্রামের কাছে, সময়গত কাছে যেমন বৃহস্পতি শুক্রবারের কাছে, সম্পর্কগত কাছে যেমন বলা হয় যে আজকাল পাকিস্তান থেকে কাবুল দূরে সরে গেছে অর্থাৎ পাকিস্তানের সাথে কাবুলের সম্পর্ক ভাল নয়। মর্যাদাগত কাছে যেমন উজীর বাদশার কাছাকাছি অর্থাৎ মর্যাদার দিক দিয়ে ওর কাছাকাছি এবং মেহেরবাণী সহানুভূতিগত কাছে। এ আয়াতে মেহেরবাণীগত নিকটতা অর্থ বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র রহমত ও মেহেরবাণী বান্দাগণের নিকটতর। কেননা আল্লাহ্ তাআলা স্থান ও কালগত নিকট থেকে পবিত্র। তিনি না কোন স্থানে, না কোন যুগে, স্থান ও কাল সৃষ্টির আগেও তিনি ছিলেন। যখন এ সব কিছু ফানা হয়ে যাবে, তখনও তিনি থাকবেন।

এ আয়াতের তফসীর হচ্ছে সেই আয়াত اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِیْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِیْنَ (আল্লাহ্ তাআলার রহমত নেককারদের সন্নিকট) এ আয়াত প্রমাণ করে দিলেন যে, যে সব আয়াতে আল্লাহ তাআলার নিকটতার কথা বর্ণিত আছে, এর দ্বারা রহমতের দিক দিয়ে নিকটতার কথা বুঝানো হয়েছে, স্থান বা কালের হিসেবে নয়। লক্ষ্যণীয় যে, আল্লাহ্‌র ইলম ও কুদরতের দিক দিয়ে প্রতিটি বান্দার সন্নিকটে আছেন। এ সম্পর্কে বর্ণিত আছে وَهُوَ مَعَكُمْ اَیْنَمَا كُنْتُمْ (তোমারা যে স্থানেই হও, তিনি তোমাদের সাথে আছে) আরও বর্ণিত আছে نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیْدِ (আমি বান্দার শাহরগ থেকেও নিকটতর) কিন্তু তোমরা দেখ না। এ সব আয়াতে ইলম ও কুদরতের দিক দিয়ে নিকটতা বুঝানো হয়েছে। এবং এ আয়াতে فَاِنِّیْ قَرِیْبٌ শব্দ দ্বারা রহমতের দিক দিয়ে নিকটতা বুঝানো হয়েছে। সুতরাং ও সব আয়াত সমূহ স্বীয় জায়গায় ঠিকই আছে এবং এ আয়াতও স্বীয় জায়গায় ঠিকই আছে।

স্মরণ রাখা দরকার যে আল্লাহ্ তাআলা সব সময় নেক বান্দাদের নিকটেই থাকেন। কিন্তু কয়েকটি সময় বিশেষভাবে একান্ত নিকটতর হয়ে যান–এক, তাহাজ্জুদের সময় যখন বান্দা স্বীয় গুনাহ ও আল্লাহ্ রহমতকে স্মরণ করে কান্না কাটি করে এবং বলে যে সেটা কোন্ গুনাহ, যেটা আমি করিনি এবং সেটা কোন্ মেহেরবাণী, যেটা তুমি করনি। আমি যেটার উপযুক্ত, সেটা আমি করেছি এবং যেটা তোমার শানের উপযুক্ত, সেটা তুমি কর। আমি গুনাহ করে ফেলেছি, তুমি ক্ষমা করে দাও। কাঁটাদার বৃক্ষ থেকে কাঁটাই বের হয় এবং ফলদার বৃক্ষ ফলই উৎপন্ন করে। এ আওয়াজ আরশকে নাড়া দেয়। দুই, তেলাওয়াতে কুরআনের সময়, তিন, নফল নামায সমূহে, চার, সিজদায়।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে নফল সমূহের দ্বারা বান্দা আল্লাহ্‌র এত নিকটতর হয়ে যায় যে বান্দার অংগ প্রত্যাংগে খোদায়ী শক্তিসমূহ কাজ করে। পাঁচ, আল্লাহ্‌র মকবুল বান্দার আস্তানায় হাজিরী দেয়ার সময়। মাওলানা রুমী বলেন,

هرکه خواهد همنشینی باخدا او نشیند در حضور اولیا

অর্থাৎ যিনি চান আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য, তিনি আউলীয়ার দরবারে উঠা বসা করেন।

এগুলো হচ্ছে ওসব অবস্থাদি, যে গুলোতে আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় বান্দার অনেক নিকট হয়ে যায়। স্মরণ রাখা দরকার যে একটি হচ্ছে বান্দা আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী হওয়া, অন্যটি হচ্ছে আল্লাহ্ বান্দার নিকটবর্তী হওয়া। সে মেহেরবান

খোদা আমাদের নিকটবর্তী কিন্তু আমরা তাঁর থেকে দূরে। শেখ সাদী (রহতুল্লাহে আলাইহি) ফরমানঃ

یار نزدیک ترا ز من بمن است

وین عجب ہیں که من از وے دورم

অর্থাৎ আল্লাহ্ আমার আত্মা থেকেও কাছে কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে আমি তাহার থেকে অনেক দূরে।

সেই বান্দার প্রতি মুবারকবাদ, যিনি আল্লাহর নিকটবর্তী এবং সেই সময়গুলো হচ্ছে শুভ, যে গুলোতে বান্দা আল্লাহর নিকটবর্তী থাকে। এ নিকটবর্তীর দু'টি ধরন আছে–এক, বান্দা অনুভব করে যে আল্লাহ্ আমার সাথেই আছেন এবং আমাকে দেখতেছেন। এ অনুভূতির পরিণাম, বান্দা গুনাহের প্রতি আকৃষ্ট হয় না এবং দুনিয়ার কোন অবস্থা বান্দাকে আল্লাহ্ থেকে উদাসীন করে না। এটা অনেক বড় স্তর।

দুই, বান্দার এ রকম অনুভব হয় যে আমি আল্লাহকে দেখতেছি। তার জমাল আমার চোখের সামনে। এর পরিনাম এটা হয়ে থাকে যে বান্দার চোখ অশ্রুসজল থাকে এবং অস্থির থাকে আর ইবাদত সমূহে স্বাদ পায়। এ নৈকট্য আগের নৈকট্য থেকে আফজল।

কাহিনীঃ এক ব্যক্তি স্বীয় জিন্দেগীর আশি বছর তকওয়া, পরহিজগারী ও ইবাদত বন্দেগীতে অতিবাহিত করে। জিন্দেগীর শেষ সময়ে শয়তান ওকে পদভ্রষ্ট করে। মানুষের আকৃতিতে ওর কাছে এসে বলতে লাগলো, তুমি সব সময় কাকে ডাক? সে বললো, আমার রবকে। ইবলিস বললো, এ সময়ের মধ্যে আল্লাহ্ কি তোমাকে ডেকেছে বা তোমার ডাকে সাড়া দিয়েছে? সে বললো, না। শয়তান বললো, তুমি বড় পাগল, তুমি এমন খোদাকে কেন ডাকতেছ, যে তোমার ডাকে সাড়া দেয় না। কারো কাছে দু'চারটি চিঠি লিখার পর যদি উত্তর পাওয়া না যায়, তাহলে চিঠি দেয়া বন্ধ করে দেয়া চায়। ইবাদতকারী লোকটি শয়তানের খপপরে পড়ে গেল, সমস্ত জিকির আজকার ত্যাগ করলো, এমনকি একদিন ইশার নামায ও পড়লো না। আল্লাহ তাআলা স্বীয় ফিরিশতাগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, অমুক ব্যক্তির নেকীসমূহ আসা কেন বন্ধ হয়ে গেল? ফিরিশতাগণ আরয করলেন, শয়তান ওকে বিপথগামী করে ফেলেছে। আল্লাহর হুকুম হলো, ওকে আসতে দাও। রাত্রে স্বপ্নে আল্লাহর সাক্ষাত লাভ হলো। জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি আমার স্মরণ কেন ত্যাগ করছ? সে আরয করলো, হে মওলা! তোমাকে ডাকতে ডাকতে

জিন্দেগী শেষ করে দিলাম কিন্তু তোমার পক্ষ থেকে একবারও সাড়া পেলাম না। আল্লাহ্ তাআলা ফরমালেন;

گفت الله گفتنت لبیك ماست

این گداز وسوز ودر داز پیك ما ست

অর্থাৎ ওহে বোকা আমাকে তোমার স্মরণ করাটাই হচ্ছে আমার জবাব এবং তোমার অন্তরে জ্বালা ও দরদ সৃষ্টি হওয়াটা হচ্ছে আমার বাহক, যে তোমাকে আমার বারগাহে উপস্থিত করে। মোটকথা এ স্তরে فَاِنِّیْ قَرِیْبٌ (আমি তোমাদের নিকটবর্তী) এর এ রকম প্রতিফলন হয়।

ছুফিয়ানে কিরাম বলেন যে এ আয়াতে ইঙ্গিতে বলা হয়েছে যে আমাকে তালাশ করতে চাইলে নিজের মধ্যে তালাশ কর। কেননা আমি তোমাদের নিকটেই থাকি। আল্লাহকে নিজের মধ্যে তালাশ না করে এদিক সেদিক তালাশ করলে কামিয়াব হওয়া যায় না।

কাহিনীঃ কোন এক সরাইখানায় এক জহরী অবস্থান করছিল। ওর কাছে ছিল একটি খুবই মূল্যবান মুক্তা একদিন সে সরাইখানার সবাইকে তাঁর পকেট থেকে একটি কৌটা বের করে দেখালো, সেটার মধ্যে সেই রজনী আলোকিতকারী মুক্তা ছিল। সে বললো, এ মুক্তা অন্ধকারকে আলোকিত করে দেয়। এর সমমূল্য টাকা বাদশাহের খাজাঞ্চিতেও নেই। সেটার দর্শকদের মধ্যে একজন চোরও ছিল। সে সেই কৌটা চুরি করার জন্য মনস্থির করে নিল। সে জহরীর সাথে বন্ধুত্বের ভাব করলো এবং ওকে জিজ্ঞাসা করলো আপনি কোথায় যাবেন? জহরী স্বীয় গন্তব্য স্থলের নাম বললো। জহরী ওকে জিজ্ঞাসা করলো, তুমি কোথায় যাবে? চোর স্বীয় গন্তব্য স্থলের নামও সেটা বললো। জহরী বললো ভালই হলো, আমরা একসাথে সফর করতে পারবো। একসাথে অবস্থান করবো, এক সাথে পানাহার করবো। চোরতো এটাই চাচ্ছিল, সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল। সে এটাও জেনে নিল যে জহরীর ওয়াজ কোটের পকেটে সেই কৌটা রাখা হয়। জহরীও সন্দেহ করলো যে হয়তো লোকটি চোর হতে পারে, এ কৌটার লিপ্সায় আমার সফরসঙ্গী হয়েছে। উভয়ে রওয়ানা দিলেন।

পরবর্তী শহরে পৌছে সরাইখানায় একটি কক্ষ উভয়ে ভাড়া নিল। রাত্রে উভয়ে কাপড় খুলে শুয়ে পড়লো। জহরী চোরের অজান্তে সেই কৌটাটা স্বীয় পকেট থেকে বের করে চোরের ওয়াজকোটের পকেটে রেখে দিল। মধ্য রাতে চোর বিছানা থেকে উঠে জহরীর সমস্ত কাপড় তালাশ করলো কিন্তু কৌটা পেল না। মনে করলো কৌটাটা জহরীর পকেট থেকে পড়ে গেছে। খুব ভোরে জহরী

কৌটাটা চোরের পকেট থেকে নিয়ে স্বীয় পকেটে রেখে দিল। চোর সকালে কথা প্রসঙ্গে জহুরীর কাছে সেই কৌটার কথা জিজ্ঞাসা করলো। জহুরী স্বীয় পকেট থেকে কৌটাটি বের করে দেখালো। চোর আশ্চর্য হয়ে গেল। মনে করলো, ওর তল্লাসী ঠিকমত হয়নি। ওরা পুনরায় যাত্রা দিল এবং অন্য আর এক শহরে পৌঁছে সরাইখানায় অবস্থান নিল। জহুরী আজও সেই একই কৌশল অবলম্বন করলো। চোর বেটা জহুরীর আসকান, ওয়াজকোট কোর্তা ও অন্যান্য আসবাব পত্র তন্ন তন্ন করে তালাশ করলো কিন্তু কৌটা ফেল না। সে দৃঢ়ভাবে মনে করলো, আজ সেই কৌটা নিশ্চয় হারিয়ে গেছে। দিনের বেলা চোর সেই কৌটার কথা জিজ্ঞাসা করলে, জহুরী পকেট থেকে সেই কৌটা বের করে দেখালো। এবার চোর ভীষণ আশ্চর্য হয়ে গেল। মোট কথা এভাবে উভয়ে এক এক মনজিল অতিক্রম করছিল এবং এ লুকুচুরি খেলা চলছিল। শেষ পর্যন্ত একদিন চোর দৃঢ় সংকল্প করে নিল যে আজ রাতে জহুরীকে পূংখানোপুংখরূপে তালাশ করবো, এমন কি তল্লাসীর সময় জেগে গেলে, ওর থেকে ছিনিয়ে নেব।

সিদ্ধান্ত মুতাবেক আজ রাতে চোর প্রথমে কাপড় ছোপড় ভাল করে তালাশ করলো। এরপর ওর বাক্স সমূহ খুলে দেখলো। যখন কোথাও কৌটা পেল না, তখন জহুরীর মুখ হা করিয়ে দেখলো, কোমর তালাশ করে দেখলো। জহুরীও যথারীতি ঘুমের ভান করে শুয়ে রইল এবং মনে মনে বললো যেভাবে ইচ্ছে তালাশ করুক। চোর শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে নিশ্চিতভাবে মনে করলো। আজ নিশ্চয়ই সেটা হারিয়ে গেছে। সকালে জহুরীর পকেটে সেই কৌটা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। স্বীয় মস্তক জহুরীর পায়ে রেখে বললো, আমি চুরির মধ্যে খুবই পাকা হস্ত কিন্তু হেফাজতের দিকদিয়ে তুমি আমার উস্তাদ। হে উস্তাদ, আমি আমার সাধ্যমত পরিপূর্ণ ভাবে তল্লাসী চালিয়েছি। কিন্তু কৌটাটা খুঁজে পাইনি। একমাত্র সেটা চুরির নিয়তে তোমার সফরসঙ্গী হয়েছিলাম। বল, কৌটাটা তুমি রাত্রে কোথায় রাখতে? জহুরী বললো, তুমি কোথায় কোথায় তালাশ করেছ? চোর বললো, তোমার পরিধেয় কাপড়, তোমার বক্সসমূহ, তোমার আসবাব পত্র, তোমার বিছানা, তোমার বালিশের নীচে। জহুরী বললো, তুমি সব জায়গা তালাশ করেছ কিন্তু স্বীয় পকেটে হাত দিয়ে দেখনি। কৌটা তোমার পকেটে ছিল। যদি নিজের পকেটে তালাশ করতে, তাহলে মুক্তা পেয়ে যেতে।

একই ব্যাপার এখানেও। আল্লাহ্‌কে নিজের মধ্যে তালাশ করুন। স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা ফরমান-وَفِىْ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ (তোমাদের মধ্যেই আছে, তোমরা কি অনুধাবণ কর না) এ আয়াতটি যেন فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ এর তাফসীর।

قبر میں دیکھا جواس پر دہ نشیں کو تو کھلا
میرےھی دل میں چھپاتھا مجھےمعلوم نہ تھا

অর্থাৎ কবরে যাকে দেখলাম, সে যে আমার মধ্যে লুকায়িত ছিল, তা আমি জানতাম না!

اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ (আমি আহবানকারীর আহবানে সাড়া দিয়ে থাকি) এ আয়াতাংশের দু'রকম তফসীর আছে–এক, اُجِيْبُ অর্থ জবাব দিয়ে থাকি। دَعْوَت অর্থ আহবান করা, ডাকা। সম্পূর্ণ আয়াতাংশের তরজুমা হলো, যখন কোন আহবানকারী আমাকে আহবান করে বা ডাকে, সঙ্গে সঙ্গে ওর আহবানে সাড়া দিয়ে থাকি। একাকী ডাকলে এর জবাব একাকী দিয়ে থাকি এবং সমাবেশে ডাকলে, এর জবাবও ফিরিশতাগণের সমাবেশে দিয়ে থাকি। বান্দা বলে, হে আল্লাহ্, হে আমার পালন কর্তা! আমি জবাব দি, হে আমার পালিত বান্দা। বান্দা বলে, আমি গুনাহ করে ফেলেছি। আমি বলি, ক্ষমা করে দিয়েছি। বান্দা বলে, মসীবতে পতিত হলাম। আমি বলি, ভয় কর না, আমি তোমার সাথে আছি। এর ব্যাখ্যা সেই হাদীছে কুদসী যে আল্লাহ তাআলা ফরমান যখন আমাকে মনে মনে স্মরণ করে, আমিও ওকে মনে মনে স্মরণ করি, যখন বান্দা আমাকে সমাবেশে স্মরণ করে, তখন আমি বান্দাকে এর থেকে উত্তম সমাবেশে স্মরণ করি। কিন্তু লক্ষ্যণীয় যে, এ অবস্থায় الداع (আহবানকারী) এর ال আরবী ব্যাকরণ মতে আহাদী হবে এবং আহবানকারী বলতে ওকেই বুঝাবে, যিনি মুমিন হবে, এবং আন্তরিকতার সাথে আহবানকারী হবে এবং হুযূর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দোহাই দিয়ে আহবান করবে। সুতরাং এ আয়াত সেই আয়াতের বিপরীত নয় যে وَمَا دُعَاءُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ অর্থাৎ কাফিরদের আহবান অর্থহীন। কেননা, এখানে কাফিরদের আহবান বুঝানো হয়েছে আর আলোচ্য আয়াতে মুমিনগণের আহবান বুঝানো হয়েছে। এ আয়াত দ্বারা দু'টি ফায়দা অর্জিত হলো–এক, নামায–রোযার মত আল্লাহ্‌কে ডাকাও ইবাদত। এ জন্য সুন্নাত হচ্ছে, প্রত্যেক দুআর আগে যেন আল্লাহ্‌কে ডাকা হয়, অতঃপর আরযি পেশ করা হয়। যেমন নবীগণ দুআর আগে رَبَّنَا বা اَللّٰهُمَّ বলে আল্লাহ্‌কে আহবান করতেন। দুই, অন্যান্য সমস্ত ইবাদতের ছওয়াব বা ফায়দা পর জগতে পাওয়া যাবে কিন্তু আল্লাহকে আহবান করার ফায়দা এখানেও পাওয়া যায়। এ আহবানের জবাবে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আহবান করেন। এটা কী যে সৌভাগ্যের বিষয় যে আমাদের মত মামুলী লোকের আহবান দ্বারা আল্লাহ্‌র বারগাহে আমাদের আলোচনা হয়।

কাহিনীঃ একবার হুযুর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হযরত উবৰী বিন কা'ব (রাদি আল্লাহ আনহু) কে বললেন, হে উব্বী, আমাকে কুরআন পাঠ করে শুনাও। হযরত উব্বী (রাদি আল্লাহু আনহু) আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র হাবীব, আমার কি যোগ্যতা যে হুযুরকে কুরআন শুনাই। আপনিতো স্বয়ং কুরআন। আপনাকেতো হযরত জিব্রাইল আলাইহিস সালাম কুরআন শুনায়। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফরমালেন, আমাকে আল্লাহ্ হুকুম দিয়েছেন যে, তোমার কাছ থেকে কুরআন শুনার জন্য। হযরত উব্বী (রাদি আল্লাহ আনহু) বললেন, আল্লাহ্ কি আমার নাম নিয়েছেন। ফরমালেন, হ্যাঁ, হযরত উব্বী (রাদি আল্লাহ্ আনহু) এর অজদ এসে গেল এবং চোখ দিয়ে অশ্রু জারী হয়ে গেল। এ ফরমানের প্রেক্ষিতে কতেক অজ্ঞ ব্যক্তি এ আপত্তিটা করে যে, যখন আমরা আল্লাহ্ তাআলার জবাব শুনিইনা, তাহলে তাঁর জবাব দেয়ার দ্বারা কি ফায়দা? এর দু'টি উত্তর রয়েছে একটি আলেমানা অপরটি আশেকানা।

আলেমানা উত্তর হচ্ছে, বিনা মাধ্যমে আল্লাহ্‌র কালাম শুনা জরুরী নয়। নবীর বলা এবং ওলামায়ে কিরাম কর্তৃক মখলুক পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়া আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র কালাম শুনে নেয়ার মত। বাদশাহ প্রতি নাগরিকের সাথে কথা বলেন না বরং তাঁর পক্ষ থেকে গেজেট প্রকাশিত হয়। কর্মচারীগণ তাঁর বানী পৌঁছিয়ে দেয়। আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় কিতাবে এর ঘোষণা দিলেন এবং নবীগণের মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছায়ে দিলেন। এটাই যথেষ্ট।

আশেকানা উত্তর হচ্ছে, আওয়াজ শুধু কান দ্বারা শুনা হয় না এবং প্রত্যেক জিনিস শুধু চোখ দ্বারা দেখা হয় না, বরং অন্য মাধ্যম দ্বারাও শুনা ও দেয়া হয়। আমরা স্বপ্নে অনেক আওয়াজ শুনি এবং অনেক জিনিস দেখি। অথচ ওই সময় চোখ কান অচল থাকে। বুঝা গেল যে এ দুনিয়াতেও মনের চোখ ও কান কাজ করে। এ জগত ওই জগতের নমুনা। বাস্তবিকই আল্লাহ তাআলা আমাদের আহবানের জবাব দিয়ে থাকেন এবং সে জবাব আমরা শুনেও থাকি। তবে অন্তরের কান দ্বারা। তখন অন্তরে একটি বিশেষ ভাবাবেগের সৃষ্টি হয় এবং সেই ভাবাবেগই সেই আওয়াজ শুনে।

উপরোক্ত আয়াতাংশের দ্বিতীয় তফসীর হচ্ছে, প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা কবুল করি, যখন সে আমার কাছে প্রার্থনা করে। এতে বুঝা গেল যে দুআ প্রার্থনা করাও উত্তম ইবাদত। দুআ সম্পর্কে তিনটি বিষয় লক্ষ্যনীয়–দুআর ফযায়েল, দুআর মাছায়েল এবং দুআর উপর সওয়াল জবাব।

দুআর ফযায়েলঃ দুআর ফযীলত অগণিত, যার মধ্যে থেকে এখানে কয়েকটি আলোচনা করা হচ্ছে (১) দুআ প্রার্থনা করা নবীগণের সুন্নাত। হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পর্যন্ত সমস্ত নবীগণ অনেক দুআ প্রার্থনা করেছেন। যে সব পয়গাম্বর কতেক সময় যে দুআ প্রার্থনা করেননি, এতে বিশেষ হেকমত ছিল। তাঁরা উপলব্ধি করেছিল যে এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আমাদের পরীক্ষা। তাই এ রকম যাতে না হয় যে আমরা দুআ প্রার্থনা করে অধৈর্যদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাই এবং আমাদের নাম্বার কম হয়ে যায়।

কাহিনীঃ হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম যখন কারাগার থেকে বের হয়ে অগ্নিকুণ্ডের দিকে যাচ্ছিলেন, তখন পথে জিব্রাইল আলাইহিস সালামের সাক্ষাত হয়। জিব্রাইল আলাইহিস সালাম আরয করলেন, হে খলীলুল্লাহ, আপনার কি অবস্থা? ফরমালেন, আলহামদুলিল্লাহ, খুবই ভাল। আরয করলেন, আপনার কোন সাহায্যের প্রয়োজন আছে? ফরমালেন, তোমার কাছ থেকে কোন কিছুর প্রয়োজন নেই। আরয করলেন, আল্লাহ্‌র কাছ থেকে কোন সাহায্যর প্রয়োজন আছে? ফরমালেন كَفَانِىْ عِلْمُهٗ بِحَالِىْ عَنْ سُؤَالِىْ

অর্থাৎ আমার অবস্থা সম্পর্কে ওনার জানা আছে।

অনুরূপ ইসমাইল আলাইহিস সালামের জবেহের যখন হুকুম হলো, তখন সেটা প্রতিহত করার জন্য দুআ করা হয়নি। বরং সাথে সাথে রশি ছুরি নিয়ে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। আমাদের প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হযরত হোসাইন (রাদি আল্লাহ আনহু) এর শাহাদতের আগাম খবর দিলেন, কিন্তু সেটা প্রতিহত করার জন্য দুআ করেননি, এমন কি হযরত আলী (রাদি আল্লাহ আনহু) ও হযরত ফাতেমা যোহরা (রাদি আল্লাহ আনহা)ও দুআ প্রার্থনা করেননি। বরং হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ দুআই করেছিলেন اَللّٰهُمَّ اٰتِ حُسَيْنِىْ صَبْرًا جَمِيْلًا وَّ اَجْرًا অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমার হোসাইনকে সবর ও প্রতিদান প্রদান করুন। ছেলেদেরকে পরীক্ষা থেকে বাঁধাদান করা হয় না বরং পরীক্ষা পাশের জন্য দুআ প্রার্থনা করা হয়।

মোট কথা পরীক্ষা এক জিনিস এবং দাসত্ব প্রকাশ অন্য জিনিস। পরীক্ষার সময় দুআ না করা ভাল আর দাসত্বের সময় দুআ প্রার্থনা করা উত্তম। কিন্তু আমরা যেহেতু কোন্‌টা পরীক্ষা এবং কোন্‌টা পরীক্ষা নয়, সেটা পার্থক্য করতে পারি না,

সে জন্য আমাদের সব সময় দুআ প্রার্থনা করা উচিৎ। হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম কর্তৃক ইউসুফ আলাইহিস সালামের সাথে সাক্ষাতের প্রার্থনা না করা, ইউসুফ আলাইহিস সালাম জেল থেকে মুক্ত হওয়া, বাপের সাথে সাক্ষাৎ, দেশে পৌঁছা ইত্যাদির দুআ না করার কারন এটাই ছিল। ওনারা ছিলেন অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন, কোন্‌টা পরীক্ষা এবং কোন্‌টা পরীক্ষা নয়, তা পার্থক্য করতে পারতেন।

(২) দুআ প্রার্থনা করার মধ্যে দাসত্ব প্রকাশ পায়। বান্দার শানই হচ্ছে যে ওর হাত স্বীয় মওলার দরজায় প্রসারিত থাকা। ফিরিশতাগণ, যারা মাছুম হয়ে থাকেন, যাদের পানাহার, রোগ শোক ইত্যাদি কোন কিছু নেই, তাঁরাও দুআ প্রার্থনা করেন। শুধু নিজেদের জন্য নয়, বরং মুমিন বান্দাদের জন্যও দুআ করেন।

اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهٗ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ
وَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

অর্থাৎ আরশ বহণকারী ও এর আশে পাশের ফিরিশতাগণ আল্লাহ্‌র প্রশংসা পূর্বক তসবীহ পাঠ করেন, তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং মুমিনগণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

(৩) অনেক দুআ প্রার্থনা করার দ্বারা মনে বিনয়ীভাব ও নম্রতা সৃষ্টি হয় এবং এর দ্বারা আল্লাহ্‌র রহমতের সাগরে জোয়ার আসে। মাওলানা রুমী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) ফরমান,

عجز کار انبیاء واولیاء است!
عاجزی محبوب درگاه خدا است
زور رابگزار وزاری رابگیر
رحم سوے زار می آید اے فقیر

অর্থাৎ নম্রতা আম্বিয়া ও আওলীয়া কিরামের কাজ। নম্রতা আল্লাহর প্রিয় জনদের স্বভাব। কঠোরতা বর্জন কর, নম্রতা অবলম্বন কর। নম্রতা উন্নতির সোপান অন্য আর এক জায়গায় বলেন–

هرکجا دردے دواں جارسد + هر کجا آهے نو آنجار سد !!

অর্থাৎ অন্তরে দরদ সৃষ্টি কর, যাতে ঔষধ নসীব হয় এবং শরীরকে বিছায়ে দাও, যাতে রহমতের পানি ওখানে জমা হয়।

(৪) দুআ প্রার্থনা দ্বারা গুনাহ সমূহের প্রতি ঘৃণা এবং আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। কেননা, যখন সব সময় আল্লাহ থেকে প্রার্থনা করা হয়, তখন ওকে রাজি রাখার প্রচেষ্টাও করতে হয়।

(৫) আল্লাহ বেনিয়াজ আর আমরা হলাম মুখাপেক্ষী, ওনার আমাদের প্রয়োজন নেই। কিন্তু দুআ এমন জিনিষ, যদ্দারা আল্লাহ্ আমাদের কদর করেন এবং আমাদের প্রতি রহমত করেন। যেমন আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং ফরমান

قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّيْ لَوْلَا دُعَاۤؤُكُمْ অর্থাৎ হে মাহবুব! বলে দিন, যদি তোমরা দুআ প্রার্থনা না কর, তাহলে আমার রব তোমাদের সহায়তা কি করবে। মোট কথা, যে বান্দা চায় যে সদা আল্লাহ্‌র করুনার দৃষ্টির মধ্যে থাকতে, সে যেন সদা দুআ প্রার্থনা করতে থাকে।

দুআর মাছায়েলঃ অন্যান্য ইবাদতের মত দুআর জন্যও বিশেষ কিছু সময় আছে, যে সময় দুআ অধিক কবুল হয়। কিছু জায়গা এমন আছে, যেখানে দুআ বিফল হয় না। দুআর জন্য কিছু শর্ত ও আদাব রয়েছে। এ গুলো পালন করলে দুআ নিশ্চয়ই কবুল হয়। আল্লাহ্ তাআলা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেনঃ

اُدْعُوْنِيْۤ اَسْتَجِبْ لَكُمْ

অর্থাৎ তোমরা আমার কাছে দুআ প্রার্থনা কর, আমি কবুল করবো। যদি আমাদের কোন দুআ কবুল না হয়, তাহলে মনে করবেন, আমাদের কোন ত্রুটি রয়েছে। আল্লাহ্‌র প্রতি শ্রুতি মিথ্যা হতে পারে না।

میری رات کی دعائیں جو نہیں قبول هو تیں
میں سمجھ گیا یقیناً ابھی مجھ میں کچھ کمی ھے

অর্থাৎ আমার রাত্রির দুআ যেগুলো কবুল হয় না, তা আমার দুর্বলতার কারণেই হয়ে থাকে, এটা আমি ভাল মতে বুঝতে পেরেছি।

দুআ' এর সময়ঃ কয়েকটি বিশেষ সময়ে দুআ বেশী কবুল হয়। জুমার দু'খোতবার মাঝখানে, খোতবা ও নামাযের মাঝখানে, সূর্যাস্তের সময়, রমযান মাসে সাহরী ও ইফ্‌তারের সময়, শবেকদরের সমস্ত রাত, প্রত্যেক শেষরাত অর্থাৎ তাহাজ্জুদের সময়, কুরআন খতমের সময় এবং জমজমের পানি পান করার পর।

দুআ এর স্থান সমূহঃ কয়েকটি জায়গায় দুআ অধিক কবুল হয়–মা-বাপের কবরের কাছে, কাবা শরীফে রোকনে ইয়ামানী ও হাজর আসওয়াদের মাঝখানে, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর রওযা শরীফে এবং বুজুর্গানে কিরামের মাযারের আশেপাশে।

দেখুন, আল্লাহ তাআলা বনি ইসরাইলকে বলে ছিলেন اُدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُوْلُوْا حِطَّةٌ দামেস্কের দরজায় সিজদা করে যাও এবং ওখানে গিয়ে দুআ প্রার্থনা কর, ক্ষমা করে দিব। ওখানে কেন পাঠিয়ে ছিলেন? এ জন্য যে ওখানে নবীগণের মাযার ছিল। ইমাম শাফেঈ (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বলতেন যে, ইমাম আবু হানিফার মাযার দুআ কবুল হওয়ার স্থান, জীবিত ওলী ও আলেমগণের পবিত্র মাহফিলেও দুআ অধিক কবুল হয়। দেখুন, আল্লাহ তাআলা ফরমান

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا সে জায়গায়, যেখানে মরিয়ম আলাইহিস সালাম জান্নাতের ফল খাচ্ছিলেন, তথায় যাকরীয়া আলাইহিস সালাম স্বীয় রবের কাছে প্রার্থনা করলেন

قَالَ رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ

আরয করলেন, হে আমার মওলা! আমাকে নেক সন্তান দান করুন। এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, জীবিত ওলীর পাশে আল্লাহ্‌র কাছে দুআ করা নবীগণের সুন্নাত। এর থেকেও আরও সুস্পষ্ট আয়াত হচ্ছে وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَاءُوْكَ (অর্থাৎ তারা যদি নিজের প্রতি জুমুল করে আপনার কাছে আসে) বিবেকও বলে যে বুজুর্গান কিয়ামের আস্তানায় দুআ অধিক কবুল হওয়া চায়।

لجپال پریت کو توڑت ناهیں جو بانهہ پکڑیں وہ پھوڑت ناهیں

گھر آئے کو خالی موڑت ناهیں

অর্থাৎ রহমতে ইলাহী আগমনকারীকে দেখে না বরং কার কাছে এসেছে, সেটাই দেখে।

কোন্ ধরনের লোকের দুআ অধিক কবুল হয়ঃ কয়েক ব্যক্তির দুআ অধিক কবুল হয় (১) সন্তানের মা–বাপের দুআ। এক ব্যক্তি হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দরবারে হাজির হয়ে আরয করলো, হে আল্লাহর হাবীব, আমার জন্য দুআ করুন, ফরমালেন, তোমার মা–বাপ জীবিত আছে? আরয করলো–হ্যাঁ। ফরমালেন, যাও, ওদের দ্বারা দুআ করাও (২) নবীর দুআ। স্মরণ রাখা দরকার যে দুআ করা ও দুআ লওয়া এক জিনিস নয়। দুআ লওয়াটা হচ্ছে যে কারো এমনভাবে খেদমত করা, যার ফলে ওর মন সন্তুষ্ট হয় এবং মন থেকে অনায়াসে দুআ বের হয়। এ ধরনের দুআ তীরের মত কাজ করে। আপনারা নিশ্চয় অবগত আছেন যে, হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের ছেলেগণ যখন হযরত ইউসুফ

আলাইহিস সালামের কামীজ স্বীয় বৃদ্ধ পিতার খেদ্‌মতে পেশ করলেন, এবং এতে যখন তিনি সন্তুষ্ট হলেন, তখন ছেলেরা আরয করলেন

قَالُوْا يَا اَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِيْنَ

আব্বাজান, আমাদের **জন্য ক্ষমার দুআ** করুন। আমরা বড় গুনাহগার। তখন ইয়াকুব আলাইহিস সালাম জবাব দিলেন– اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيْ প্রিয় বেটারা, এখন নয়, তোমাদের জন্য পরে দুআ করবো। অর্থাৎ তোমরা আমার দ্বারা দুআ করাইও না বরং আমার দুআ লও। তোমরা আমাকে আমার হারানো ছেলে ইউসুফের কাছ পৌছায়ে দাও। যখন আমি ওকে বুকে জড়িয়ে ধরবো, তখন অনায়াসে আমার অন্তর তোমাদেরকে দুআ করবে। লক্ষ্য করুন, মুনাফিকেরা হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দ্বারা দুআ করায়েছে এবং হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও ওদের জন্য দুআ করেছেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র জবাব আসলো–

اَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ الخ

অর্থাৎ হে মাহবুব। আপনি বেঈমানদের জন্য যদি সত্তরবারও দুআ কর, ওদেরকে ক্ষমা করা হবে না। এর কারণ স্বয়ং আল্লাহ তাআলা ফরমান– ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ

হে হাবীব, আমি ওদেরকে কীভাবে ক্ষমা করি, এরা আমার অস্বীকারকারী, আপনার শানের অস্বীকারকারী, সদা আপনাকে মনঃকষ্ট দেয় এবং মুসলমানদেরকে ধোকা দেয়ার উদ্দেশ্যে দুআ করাতে আসে। আপনিও ওদের দমন করার জন্য মৌখিক দুআ করেন। আমি আপনার মনের অবস্থা জানি। আমি ওদেরকে কক্ষনো ক্ষমা করবো না। এটা ছিল দুআ করানোদের অবস্থা। এবার দুআ আদায়কারীদের অবস্থার কথা শুনুন।

হযরত তালহা (রাহি আল্লাহু আনহু) এক সফরে দেখলেন যে, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উষ্টীর উপর আরোহন করে সফর করছিলেন। কিন্তু ঘুমের আধিক্য ছিল, বারবার ঝুঁকে পড়ছিলেন, হযরত তালহা মনে করলেন যে হয়তো হুযূর কষ্ট পেতে পারেন, তাই সঙ্গে রওয়ানা দিলেন। যখন হুযূর বেশী ঝুঁকে পড়তেন, হযরত তালহা হাত দিয়ে দিতেন। সারারাত এ খেদমত করতে রইলেন। শেষ রাতে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জেগে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন, কে? আরয করলেন, আমি আপনার খাদেম তালহা। ফরমালেন, কি

ব্যাপার? হযরত তালহা ব্যাপারটা আরয করলেন। ফরমালেন, তোমার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেল। একেই বলে দুআ লওয়া। হযরত রাবিয়া (রাদি আল্লাহু আনহু) কে বললেন, আমার থেকে কিছু চেয়ে নাও। আরয করলেন, জান্নাতে আপনার সান্নিধ্য কামনা করি। মোট কথা দুআ করানো ও দুআ লওয়ার মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। আমরা গুনাহগারদের কোন বুজুর্গ দ্বারা যদি দুআ করানোর সুযোগ হয়, সেটাও আমাদের জন্য সৌভাগ্যের ব্যাপার। কিন্তু দুআ লওয়ার চেষ্টা করা চায়।

হে মুসলমানগণ! আপনারা যদি এখনও প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দুআ নিতে চান, তাহলে তাঁর সমস্ত সুন্নাতের উপর আমল করুন। বিশেষ করে তিনটি বিষয়ের উপর খুব জোর দিবেন। এ তিন বিষয় হলো (ক) পরস্পর ঝগড়া বিবাদকারী মুসলমানদেরকে মিলানো (খ) হুযূরের আহকাম উম্মতের কাছে পৌছানা। (গ) তাহাজ্জুদ নামাযের নিয়মিত আদায়কারী হওয়া। এ তিনটি বিষয়ের ব্যাপারে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফলমায়েছেন نَضَّرَ اللهُ (আল্লাহ তাআলা যেন ওদেরকে শস্য শ্যামল রাখে) (৩) ন্যায় পরায়ন বাদশাহের দুআ (৪) মজলুমের দুআ। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে মজলুমের দুআকে খোদায়ী সম্মতি লব্বাইক বলে।

بترس ازآه مظلوماں که هنگام دعا کردن
اجابت از درحق بهر استقبال می آید

অর্থাৎ মখলুমদের আহাজারী থেকে বিরত থাক। কেননা, তাদের দুআকে আল্লাহর দরবারে স্বাগত জানানো হয়।

(৫) বেকরারের দুআ। আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ ফরমান- اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ । যদি নিজে বেকরার না হও। তাহলে কোন বেকরারের দুআ লও। (৬) হাজীর দুআ যখন সে ঘর থেকে বের হয়, আসা পর্যন্ত। (৭) নিজের পীর মুর্শেদের দুআ, (৮) স্বীয় দ্বীনি ওস্তাদের দুআ, (৯) ইতেকাফকারীর দুআ, (১০) বিনীতভাবে দুআকারীর দুআ।

দুআ প্রার্থনার দুআঃ দুআর আদাব হচ্ছে যে স্বীয় হাতদ্বয় সামান্য দুরত্বে আসমানের দিকে প্রসারিত করা। সাধারণ দুআসমূহে বুক বা কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠাবে। ইস্তেস্কার নামাযে যখন বৃষ্টির জন্য দুআ প্রার্থনা করা হয়, তখন মাথার উপরে উঠাবে যেন বগলের নীচের শ্বেত বর্ণ প্রকাশ পায়। মনোযোগ সহকারে দুআ করবে, কবুল হওয়ার আশা রাখবে। আশাহীন ব্যক্তিদের দুআ কবুল হয় না। অতঃপর আল্লাহর প্রশংসা করবে, এরপর নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম) এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করবে। তারপর স্বীয় গুণাহের কথা স্বীকার করবে। এরপর আরযি পেশ করবে। আরযি পেশ করার সময় খেয়াল রাখবে যেন শুধু দুনিয়াবী বিষয় প্রার্থনা করা না হয়। বরং দীন-দুনিয়া উভয় জাহানের জন্য যেন দুআ প্রার্থনা করা হয়। এ রকম দুআ আল্লাহ্র কাছে খুবই পছন্দনীয়। দুআ এভাবে করাটাই সমীচীন, যেমন-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ الطَّيِّبِيْنَ وَاَصْحَابِهٖ الطَّاهِرِيْنَ - رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ٥ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ -

এরপর অন্যান্য দুআ প্রার্থনা করবে। উত্তম হচ্ছে দুআ শুধু নিজের জন্য না করা বরং সমস্ত মুসলমানের জন্যও দুআ করা চায়।

فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ (ওদের উচিৎ, আমার কথা শুনা) এ শব্দ থেকে আশেকদের মধ্যে...... অজদ এসে যায়। কী চিত্তাকর্ষক প্রিয় শব্দ। আল্লাহ্ তাআলা মালেকুল মুলক হয়েও আমরা বান্দাদেরকে বলতেছেন যে আমি তোমাদের দুআ কবুল করছি তোমরাও আমার কথা কবুল কর। আমার থেকে শুধু প্রার্থনা কবুল করার চেষ্টা করিওনা, কবুল করার মত কাজও কর। আর এক জায়গায় ফরমান- فَاذْكُرُوْنِىْ اَذْكُرْكُمْ (তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে স্মরণ করবো। এ দুটি কথায় হৃদয়বানদের হৃদয় গলে যায়। এ বাক্য প্রসঙ্গে ওলামায়ে কিরামতো এটা বলেন যে, দুআ কবুল হওয়ার শর্ত হচ্ছে তাকওয়া এবং আল্লাহ্র আনুগত্য ও। যে এটা কামনা করে যে আমার দুআ কবুল হোক, সে যেন আল্লাহ্র বাণীও কবুল বা মান্য করে এবং তাঁর আনুগত্য করে।

কাহিনীঃ কোন এক বুজুর্গের কাছে এক ব্যক্তি দুআসমূহ কবুল না হওয়ার অভিযোগ করলো যে, আল্লাহ তাআলাতো দুআ কবুল করার ওয়াদা দিয়ে ছিলেন কিন্তু কবুল করেন না। সে এ আয়াতটি পাঠ করে শুনালেন اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ আমি আহবানকারীদের আহবানের জবাব দিয়ে থাকি, যখন আহবান করে। শেখ জবাব দিলেন, তুমি ওনার কথা শুননা। তাই তিনি তোমার কথা শুনে না।

فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ দ্বারা তাই প্রকাশ পায়। যদি নিজেরটা আদায় করতে চাও, তাহলে ওনার কথা মান্য কর। হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের পবিত্র জিন্দেগী এ আয়াতের বাস্তব তাফসীর। আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে খুবই কঠিন নির্দেশ দিয়ে ছিলেন–নিজেকে নামরুদের আগুনে নিক্ষেপ কর, নিজের সন্তান ও স্ত্রীকে দানা পানি বিহীন জঙ্গলে ফেলে আস, নিজের প্রিয় ছেলেকে জবেহ কর ইত্যাদি। আল্লাহ্র খলীল ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম এর কারণও জিজ্ঞাসা করেননি, সব কাজ বিনা দ্বিধায় আদায় করলেন। এবার তাঁর পালা আসলো। তিনি আরয করলেন, হে মওলা! যে জঙ্গলে আমার ছেলে পিলে থাকে, সেটা আবাদ করে দাও। সেটাকে শান্তির শহরে পণিরত কর। যেখানে কোন কিছু উৎপন্ন হয়না, সেখানকার বাসিন্দা যেন উপবাসে মারা না যায়। সব রকমের মজাদার ফল যেন তথায় পায়। হে মওলা! এ শহরে শেষ জমানায় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেন আমার বংশে জন্মগ্রহণ করেন, দুনিয়াতে যেন আমার সুনাম বজায় থাকে। আল্লাহ তাআলা তাঁর সমস্ত আবেদন মেনে নিলেন। অস্বীকার তো দূরের কথা, দুআর কারণও জিজ্ঞাসা করেননি। এটাই হচ্ছে এ আয়াতের তাফসীর।

ছুফিয়ানে কিরাম বলেন যে, আমাদের পার্থিব জিন্দেগী মাত্র কয়েক দিনের। আমাদের উচিৎ যে, আমরা যেন এখানে আল্লাহ্র সব কথা মান্য করি। যদি আমরা এ মতে আমল করি, তাহলে পরকালে যার কোন ইতি নেই, আল্লাহ্ আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করবেন। আল্লাহ্ তাআলা ফরমান لَهُمْ مَا يَشَآءُوْنَ فِيْهَا وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ (ওদের জন্য, ওরা যা এখানে চায় এবং আমার কাছে অধিক দেয়ার রয়েছে) এটা হচ্ছে তাঁর বন্দানওয়াজী যে এখানেও তিনি আমাদের প্রার্থনা কিছু মেনে নেন। কিন্তু হক কথা হলো, তাঁর উপর দাবী করার মত আমাদের কিছু নেই। তার নির্দেশ মান্য করাতো আমাদের জন্য ফরয। কেননা, আমরা হলাম বান্দা আর তিনি হলেন আমাদের প্রভু, আমাদের প্রার্থনার মধ্যে কিছু মেনে নেয়াটা হচ্ছে তাঁর করুনা।

وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ (আমার উপর যেন ঈমান আনে) সুবহানাল্লাহ! কী সুন্দর ভাবে আমাদেরকে শিখানো হচ্ছে যে, আমার উপর বিশ্বাস রেখ যে, আমি তোমাদের রব, তোমরা হলে বান্দা। আমি তোমাদের দুআ কবুল না করলে, তোমরা আমার ব্যাপারে আপত্তি করনা। বরং এটা মনে কর যে, তোমরা স্বীয় অজ্ঞতার কারণে আমার থেকে সেটা কামনা করতেছ, যেটা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর। আমি স্বীয় সহানুভূতির কারণে তা তোমাদেরকে দিইনা। শেখ শাদী

বলেন যে বাপের কাছে তো মধু অনেক আছে। নাদান ছেলে মধু খাওয়ার জন্য জিদ করছে, কিন্তু বাপ জানে যে ছেলের মেজাজ কড়া, ওর জন্য মধু ক্ষতিকর হবে।

ছুফিয়ানে কিরাম বলেন যে দুআ তিন রকম ভাবে কবুল হয়–এক, বান্দা যা চায়, তা দিয়ে দেন, দুই, যা চায়, তা দেন না, তবে দুআর বরকতে অন্য নিয়ামত দান করেন বা কোন বিপদ থেকে রক্ষা করেন। তিন, বান্দার এ দুআ পরকালের জন্য সঞ্চিত থাকে; এর বরকতে ওর পদমর্যাদা বৃদ্ধি পায়। উল্লেখ্য যে, এখানে আমাদের সাথে শয়তানও থাকে এবং নফ্সে আম্মারাও। এ জন্য আমরা মাঝে মধ্যে আল্লাহ্ তাআলা থেকে খারাপ জিনিসও প্রার্থনা করে থাকি। কিন্তু মৃত্যুর পর নফ্স ও শয়তান আমাদের থেকে পৃথক হয়ে যাবে, ওখানে কেবল রূহ ও কলবই থাকবে। আমরা ওখানে ভাল জিনিসই প্রার্থনা করবো। এ জন্য আল্লাহ্ তাআলা ওখানে আমাদের প্রত্যেক দুআ কবুল করবেন। এখানে প্রত্যেক দুআ কবুল হয়না। وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ (আমার উপর যেন ঈমান আনা হয়) আমার উপর আস্থা রাখ বা এর ভাবার্থ হলো, আমার নির্দেশ মান্য কর এবং আমার নরম গরম প্রত্যেক নির্দেশ মাথা পেতে মেনে নাও। এ সবের কারণ তোমাদের বুঝে আসুক বা না আসুক। তোমরা বিনা আপত্তিতে ডাক্তার প্রদত্ত ঔষধ ব্যবহার করে থাক। কেননা, ওনার উপর তোমাদের আস্থা রয়েছে যে, ডাক্তার সাহেব অভিজ্ঞ ও মেহেরবান। তাহলে আমার খোদায়ীত্বের প্রতি তোমাদের কি এতটুকু আস্থাও নেই? আমার নির্দেশের ব্যাপারে কোন আপত্তি করনা বরং وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ আমার উপর পূর্ণ আস্থা রাখ।

لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ (যাতে তারা হেদায়ত প্রাপ্ত হয়) হেদায়ত ও রুশদ উভয়টা প্রায় সম অর্থবোধক। তবে জাহেরী বাতেনী সব রকমের পথ প্রদর্শনকে হেদায়েত বলে এবং কেবল বাতেনী হেদায়েতকে রুশদ বলা হয়। সার কথা হলো, যে সব লোকের মধ্যে উপরোক্ত তিন বিষয় পুঞ্জিভুত হবে, তারা রূহানী, ঈমানী ও কলবী হেদায়েতের উপর হবে। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর হাবীবের সদ্কায় এ তিন বিষয়ের উপর আমল করার তৌফিক দান করুন, আমরা যেন তাঁর বারগাহে দুআ প্রার্থনা করতে থাকি, সদা তাঁর আনুগত্য করতে থাকি এবং তাঁর নির্দেশাবলী যেন কোন আপত্তি ছাড়া পালন করি।

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ وَنُوْرِ عَرْشِهٖ سَيِّدِنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ -